অমরেন্দ্র ঘোষ ঃ
জীবন ও সাহিত্য সাধনা

ডক্টর প্রতাপ রঞ্জন হাজরা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ

পাইওনীয়ার পাব্লিশার্স

২০৬, বিধান সরণী

রুম নং—১৭ □ কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক
মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য
পাইওনিয়ার পাবলিশার্স
২০৬, বিধান সরণী
রুম নং ১৭
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Amarendra Ghosh : Jiban O Sahitya Sadhana
by Dr. Pratap Ranjan Hazra

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ১৯৬০

মুদ্রাকর
এস. চ্যাটার্জী
দেব প্রিণ্টার্স
৭এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

ভূমিকা

অমরেন্দ্র ঘোষ 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' পর্বের লেখক। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করা কিংবা যথার্থ মূল্যায়নের এযাবৎ কোন চেষ্টাই হয় নি। ফলে সমালোচনা সাহিত্যে একদিকে যেমন তিনি উপেক্ষিত তেমনই বিস্মৃত। অথচ 'চরকাশেম', 'পদ্মদীঘির বেদেনী', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'দক্ষিণের বিল' প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে অমরেন্দ্র একদা বাংলা সাহিত্য পাঠকের হৃদয় জয় করেছিলেন তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে এবং লিখনশৈলীর আন্তরিকতায়। এই বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই অমরেন্দ্র ঘোষের জীবন ও সমগ্র সাহিত্য কর্মকেই আমার গবেষণার বিষয়-বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছিলাম। বর্তমান গ্রন্থে অমরেন্দ্র ঘোষের জীবন ও সমগ্র সাহিত্য কর্মের আলোচনা করে মূল্যায়ণের চেষ্টা করেছি। অমরেন্দ্র সম্পর্কে এটাই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম গবেষণা নিবন্ধরূপেই লিখিত হয়েছিল। আমার এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ তপোবিজয় ঘোষ এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত। এ কাজে তাঁরা শুধু প্রয়োজনীয় পরামর্শই দেননি, নানাভাবে সাহায্যও করেছেন। তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য অনুমোদনের পর যথাসাধ্য ত্রুটিমুক্ত করে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। কিন্তু প্রথম প্রকাশ দ্রুত নিঃশেষিত হবার পর বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণে আরো অনেক নতুন তথ্যাদিও যুক্ত করেছি।

এই গ্রন্থ রচনার কাজে যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে অমরেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষ, দুই পুত্র শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীঅশোক ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা দরকার। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলি যাচাইয়ের প্রশ্নে

এবং আরো অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যাদি সরবরাহ করে তাঁরা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার শিক্ষাগুরু এবং আমার কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নারায়ণ সাহা, গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন বেরা, সহকর্মী অধ্যাপক অসীমেশ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক দিলীপ কুমার মহাপাত্র, অধ্যাপক শক্তিপদ চৌধুরী, অধ্যাপক নীরোদ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবনাথ দাঁ, অধ্যাপিকা শিপ্রা ঘোষ, অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ নানাভাবে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এঁদের সকলকে জানাই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও 'গণশক্তি' এবং তার সম্পাদক শ্রীঅনিল বিশ্বাসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিশ্বাসই প্রথম 'গণশক্তি' পত্রিকায় অমরেন্দ্র সম্পর্কে আমার লেখা প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। এই অবসরে 'গণশক্তি' এবং তাঁর সম্পাদক মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাই।

এই গ্রন্থ প্রকাশের কাজে সবচেয়ে বেশি যিনি সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার স্ত্রী.শ্রীমতী শিখা হাজরা। আসলে সম্পূর্ণ অনুপ্রেরণা এবং তাগিদ একান্তভাবে তাঁরই। অনুজ শ্রীপ্রশান্ত রঞ্জন হাজরা গ্রন্থের প্রচ্ছদ করে দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধ্রুবরঞ্জন হাজরা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কপি করে আমার শ্রম লাঘব করে দিয়েছে এবং গ্রন্থ শেষে নির্দেশিকাটিও তারই প্রস্তুত। সকলের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেই কৃতজ্ঞতা জানানো থেকে বিরত থাকলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই পাইওনিয়ার পাবলিশার্সের তরুণ কর্ণধার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ নিঃশেষিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বতঃপ্রণোদিত দায় দায়িত্ব না নিলে, বর্তমান পরিবর্ধিত সংস্করণ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হোত না। মুখ্যতঃ তাঁর আন্তরিক তৎপরতা ও আনুকূল্যেই পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হোল। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই আমার।

প্রতাপ রঞ্জন হাজরা

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র : কথা সাহিত্য (যন্ত্রস্থ)
বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)

এই লেখকের
বাংলা কথাসাহিত্যের দুই পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

কথারম্ভ

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—বাংলা কথা সাহিত্যের এই তিন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কের কথা বাদ দিলে এঁদের উত্তরসূরী যে আধুনিক কথাশিল্পী সমাজ, তাঁরাও একেবারে নগণ্য নন। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকজন কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা অসামান্য। জনপ্রিয়তার গৌরবে তাঁদের প্রতিভা সমর্দ্ধিত হয়েও পাঠক সমাজের কাছ থেকে কেবল শ্রদ্ধা আর অভিনন্দনই সেই সমস্ত প্রতিভাবান শিল্পীর একমাত্র পাওনা নয়। আরও কিছু প্রাপ্য থেকে যায়, তা হল তাঁদের সৃষ্টির বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। অথচ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অন্যতম পথিকৃৎ অমরেন্দ্র ঘোষকে নিয়ে তেমন কোনো পূর্ণাংগ আলোচনাই হয় নি। এমন কি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় অমরন্দ্রে ঘোষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। মনে হয় বাংলা কথাসাহিত্যে অমরেন্দ্রই প্রথম সাহিত্যিক, যিনি সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসুলমানের মিলিত জীবন সার্থক ভাবে সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন। তাঁর আগে রচিত হলেও কেউ-ই পূর্ব বাংলার নদী, বিল, ঝিল, চর আর মাঝি মাল্লা জেলে, বেদে, চাষী নর-নারীকে নিয়ে এমন সার্থক গল্প লেখেন নি। সে আলোচনা আমরা সবিস্তারে যথাস্থানে করবো। তার আগে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের যে পটভূমিতে অমরেন্দ্র ঘোষ আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই পটভূমিটি আমাদের সামনে উন্মোচিত না হলে তাঁর অন্তর্লোকের পরিচয় পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে অমরেন্দ্র ঘোষ কল্লোল সন্ধিকালের লেখক।

বিশ শতকের বাংলাদেশের প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কাল। জীবনের সমুদ্র তখন তরঙ্গের আঘাতে ক্ষুব্ধ, ফেনিল—পুরানো প্রচলিত ঐতিহ্য আর বিশ্বাস, মনন আর মূল্য মান একটা প্রচন্ড ভাঙন আর রূপান্তরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে, সামাজিক ও অর্থনৈতেক জীবনে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য দেখা দিয়েছে। পশ্চিমের সভ্যতায় তখন নতুন প্রাণ-কল্লোল। বিপরীতমুখী চিন্তা আর তত্ত্বের সংঘাতে উদ্বেল। এই অবস্থার সঙ্গে এল মার্কসের বৈপ্লবিক সাম্য নীতি এবং ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব। পুরানো পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের স্বপ্ন আর স্থির নিশ্চিত আদর্শের সৌধতে ফাটলের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। একদিকে মানুষের ভাবজীবনে এই বিক্ষোভের ছবি আর একদিকে অর্থাৎ বহির্জীবনে শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্র যুগের ক্রমপ্রসারের চিত্র।

আর তারই ফলে সভ্যতার ভারকেন্দ্র সহজ গ্রাম-জীবন থেকে ক্রমশ সরে এসেছে নাগরিক জীবনে, যন্ত্রবদ্ধ কৃত্রিম নাগরিক পরিবেশে।

এদেশের আকাশেও এসে লেগেছে পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার এই ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা। দেশের মানুষও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষ ক্রমশ জীবনের পূর্বতন প্রচলিত মূল্য সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হয়ে পড়েছে, পুরানো ধর্ম-বিশ্বাস সংস্কার আর নীতিবোধ সব কিছুকেই যুক্তির মর্মভেদী আলোয় নতুন করে যাচাই শুরু হয়েছে। দারিদ্রের মধ্যে আর ত্যাগের মহিমা চোখে পড়ে না, প্রেমের নামেই কোনো অলৌকিক চেতনায় বিহ্বল হয়ে ওঠে না। সব কিছুকেই সাদা চোখে দেখবার, যাচাই করে নেবার এক নেশায় মানুষ তখন মেতে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালের এই সংশয় জিজ্ঞাসা, অস্থিরতা, বুদ্ধিজীবি মানুষের আদর্শের দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ, হতাশা আরও তীব্রতর হয়েছে মহাযুদ্ধের ধূলিধূসর পরিপ্রেক্ষিতে। আর বাংলাদেশের সঙ্গে মিশেছে রাজনৈতিক সংগ্রাম চেতনা। মানুষের মন সমাজ ও যুগ চিন্তার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, বিক্ষুব্ধ হয়েছে বহু বিচিত্র ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় যখন ক্লান্ত অবসাদের ছায়া নেমেছে, চেতনায় জেগেছে যুগসন্ধির অস্থিরতা, যুদ্ধোত্তর জীবনের অজস্র সংশয় জিজ্ঞাসা যখন উন্মুখ হয়ে সাহিত্যের আকাশে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজে মরছে, তখন যে তরুণ লেখক গোষ্ঠী সেই সন্ধিকালের ভাব ও ভাবনাকে রূপ দিতে অগ্রণী হলেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোম-কালিকলম-প্রগতি' গোষ্ঠী নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভাব ছিল না। কিন্তু যুগ ও জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যে পড়ে তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। 'কল্লোল' পন্থীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যেমন স্বীকার করলেন আবার প্রয়োজনে তাকে অতিক্রমও করতে চাইলেন। তাঁরা নতুন যুগসৃষ্টির জন্য যে সংগ্রাম করে গেছেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু 'কল্লোল' যুগের সাধনা যে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেনি, তার কারণ 'কল্লোল' পন্থীদের অন্তর্লোক সন্ধান করণেই পরিস্ফুট হবে। কিন্তু তাঁদের শক্তি ছিল, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা সবই ছিল। ছিল না শুধু বিশ্বাসের অখন্ডতা। বিশ শতকের সভ্যতা যে সংশয়-জিজ্ঞাসার আঘাতে নিরন্তর পীড়িত হয়েছে, যে বিশ্বাসের দৈন্য হতাশা ও আত্মার অবক্ষয় এই যুগের চেতনাকে বিবলাঙ্গ করেছে—তা আমাদের তরুণ সাহিত্য সাধকদের আত্মাকেও অস্থিরতার বেদনায় ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন আদর্শবাদী, স্বপ্নবিহ্বল। কিন্তু যুগ-চেতনার প্রভাব এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী আধ্যাত্মিক চেতনার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা জীবনের স্বীকৃত আদর্শ মূল্যগুলিকে অবহেলা করে নতুন মূল্যমান প্রতিষ্ঠার কঠিন সাধনায় ব্রতী হলেন। বাইরের রুক্ষ কঠিন বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে আদর্শের সংগ্রাম আর বিশ্বাসের সংঘাত চলল তরুণ-শিল্প-

সাধকদের জীবনে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোথাও কোনো স্থির বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলেন না।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সাহিত্য বুদ্ধি ও হৃদয়ের মধ্যে কোনো ভারসাম্য রাখতে পারেনি। যখন তা বুদ্ধি ও মতবাদের সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করেছে, তখনই তার মধ্যে জীবন দৃষ্টির সমগ্র প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। আর হৃদয় বৃত্তির পথে চলতে গিয়েও একালের সাহিত্য সহজভাবে পা ফেলতে পারেনি। কিন্তু "মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর শোনা গেল। এর কারণও অনুমান করা কঠিন ছিল না। রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে, সে আন্দোলনও শুধু বাংলাদেশ নিয়ে নয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন নিল এক সর্বভারতীয় রূপ। হয়তো প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনই উপন্যাসের বিষয় হিসাবে সব সময়ে আসেনি কিন্তু চিত্তক্ষেত্রের বিস্তার এবং সমস্যা চিন্তার গুরুত্ব এর দ্বারা বদলে গিয়েছে সন্দেহ নেই। তারাশংকরের 'ধাত্রী দেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা' সমাজের এই চেতনাকে বহন করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিষয় অন্য রকম। মূলত তিনি বাঙালি পরিবার জীবনের ছবি এঁকেছেন, গ্রামের জীবনযাত্রাও দেখা দিয়েছে।···· শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি অবশ্য মধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই সংগৃহীত। তখনও পর্যন্ত তিনি সমাজের আরও নিম্নতলে অবতরণ করেন নি।"[১] অথচ শরৎচন্দ্রের অনুগামীরা কিন্তু থেমে থাকেননি। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম অমরেন্দ্র ঘোষ। তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্য-সাধনার মধ্যেই নিহিত আছে বলিষ্ঠ আশাবাদ, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন যাত্রা, সমস্যা-কণ্টকিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণ এবং সমস্ত মতবাদের উর্দ্ধে তাঁর নিজস্ব হিউম্যানিজম্। "He is more a humanist than a leftist." [২]

পাদটীকা

১. বাঙালীর সাহিত্য – ভবতোষ দত্ত। পৃষ্ঠা-২৬৪

২. Contemporary Indian Literature—Sahitya Academy,—1950.—Page—3)

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনী

বাল্য জীবন ও শিক্ষা

এক

"শিল্প সাধকের পক্ষে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাত্রা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই বোধহয় দুর্লভ। ইতিহাসের পাতায় গণনাহীন শিল্প ও সাহিত্যিকের অজস্র বেদনার করুণ কাহিণী ছড়িয়ে রয়েছে। একদিকে বাস্তব সংসারের নিত্য কার দাবী ও প্রয়োজন, অন্য দিকে শিল্প প্রেরণার ঐশ্বর্য মণ্ডিত স্বপ্নালোকের দুর্বার আহ্বান—এই টানা পোড়েনের মাঝখানে স্বাভাবিক মানুষের প্রথাসিদ্ধ মামুলী জীবন যাপন শিল্পীর ভাগ্যে ঘটে না বললেই হয়। দুমুঠো অন্নের অভাবে যে শিল্পীর বিড়ম্বিত জীবন হতাশা, অনাদর ও উপেক্ষার তাপে শুকিয়ে শেষ হয়ে গেছে, হয় তো আরই সৃষ্টি পৃথিবীকে দিয়ে গেছে এমন উপহার যার সঙ্গে কুবেরের সম্পদও বিনিময়যোগ্য নয়। এ ঘটনা শুধু এদেশে নয়, অন্যত্রও ঘটেছে। তাই অমরেন্দ্র ঘোষের দুঃখ ও দারিদ্র বঞ্চণার জীবন বেদনাময় হলেও গোবিন্দ দাশ, মাইকেল, নজরুলের-ট্র্যাজেডির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও আশ্চর্য্য ব্যাতিক্রম নয়।"১

এই বিড়ম্বনা ও নৈরাশ্যের মধ্যেই অমরেন্দ্র ঘোষ দেখেছেন আশার আলো। দৃঢ় করেছেন বিশ্বাসের ভিত। "কত শক হুন মোগল পাঠানের রক্তাক্ত তলোয়ারে এই ভারত ভূমির কৃষ্টি, সভ্যতা বার বার টুকরো টুকরো হয়েছে ইংরেজের তোপের মুখেও ধ্বংস হয়েছে বহু সংস্কৃতি। তবু মনে হয় পর্বত কন্দরে ঘাসে জলে মাঠে—অতীত হতে বর্তমানে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল গৈরিক বসনা গায়ত্রী, যার জপমালার প্রতিটি রুদ্রাক্ষে লেখা সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমরা আর কোন বাদে বিশ্বাসী নই—চাই হিউম্যানিটি। আমাদের সমস্ত তপস্যার কাম্য ফল হিউম্যানিজম।"২ এই হিউম্যানিজমের সাধনাই অমরেন্দ্রর জীবন-সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

অমরেন্দ্রর জন্ম বর্তমান বাঙলাদেশের বরিশাল জেলার মঠ বাড়িয়া থানায় ১৯০৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, (বাংলা ২২শে মাঘ, ১৩১৩) ৪টে ৫৮ সেকেন্ড।৩ পিতা জানকী কুমার ঘোষ। মাতা শিবসুন্দরী। আদি নিবাস ছিল নরোত্তমপুর। অমরেন্দ্রর পৈতৃক পদবী ছিল ঘোষ রায়। কিন্তু নরোত্তমপুর থেকে জানকী কুমার সপরিবারে রাজাপুর থানার অধীন শুক্তাগড়

গ্রামে চলে আসার পর বহুদিন স্থানভ্রষ্ট থাকায় ক্রমে ক্রমে ঘোষ লেখাটাই অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। রায় ছিল অন্তর্ভুক্ত এবং তা কেবল বিবাহ ইত্যাদিতেই ব্যবহৃত হত। অমরেন্দ্রর পুরো নাম ছিল অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু পরবর্তী কালে লেখক নিজেই বলেছেন, "ইদানীং অবশ্য শ্রী এবং নাথ ত্যাগ করে শ্রীহীন এবং অনাথ হয়েছি।"৪ সাহিত্যে তখন থেকেই তিনি অমরেন্দ্র ঘোষ নামে পরিচিত হলেন।

পিতা জানকী কুমার ঘোষের আটটি সন্তান। পাঁচ কন্যা ও তিন পুত্র। জানকী কুমারের আট সন্তানের মধ্যে অমরেন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয়। পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অমরেন্দ্রর আটভাই বোন হলেন—শ্রীমতী মৃণালিনী বসু রায় ইনি অমরেন্দ্রর দশ বছরের বড়ো। শ্রীমতী হেমনলিনী গুহঠাকুরতা, শ্রীমতী কমলিনী বসু নারায়ণ, শ্রী নারায়ণ ঘোষ, শ্রী জনার্দন ঘোষ, শ্রীমতী নিলীমা গুহরায় ও শ্রীমতী বেলারাণী বসু নারায়ন। পিতা জানকী কুমারের পরিচয় দিতে গিয়ে অমরেন্দ্র বলেছেন, "বাবা ছিলেন অন্য ধাতের মানুষ। নিজে বোধহয় ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। অর্থাভাবেই আর তিনি এগুতে পারেন নি। শুধু নিজের মেধা ও চেষ্টায় ইংরেজি বাঙলায় ডাইরি লিখতেন চমৎকার। সেই জন্যেই চাকরিতে উন্নতি। আর শরীরটাও ছিল সহায়ক। শ্রীর সঙ্গে শক্তি এবং গঠন পারিপাট্যের এমন সমন্বয় আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।"৫ জানকী কুমার চাকরী করতেন পুলিশে। ছিলেন একজন সাধারণ কনস্টেবল। কিন্তু পরবর্তী কালে হয়েছিলেন দারোগা। জানকী কুমার অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অমরেন্দ্রর লেখায় সে শক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। "বাবা আহ্নিক করছেন সকালবেলা। সমুখে একটা শক্ত কাঠের জলচৌকির ওপর লোহার সিন্দুকটা। মায়ের নাম খোদা শিবসুন্দরী ঘোষ। কি যেন একটা অসুবিধা হচ্ছে পাশের দরজা খুলতে।"

"প্রকাণ্ড এক জোড়া ফরমাসী কাঁঠাল কাঠের সৌখিন খড়ম পায়ে দিতেন বাবা। ঐ খড়ম পায়ে উবু হয়ে বসেই তিনি দুহাতে তুলে সিন্দুকটা সরিয়ে রাখলেন। শুনেছিলাম সাড়ে আট মন ওজন, সকলে ফিসফাস করে বলাবলি করলে দৈত্য। মা কিন্তু খুব বকলেন।"৬ শুধু এই দুঃসাহস নয়, নিজের চেষ্টা, নিষ্ঠা, সততা ও স্ত্রী শিবসুন্দরীর প্রেরণায় জানকী কুমার শুধু প্রতিষ্ঠাই অর্জন করেন নি, করেছিলেন গোটা পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য। বাবা দুঃসাহসে ভর করেই সাড়ে তিন টাকার নায়ে ওপার পাড়ি জমিয়েছিলেন। দুঃসাহসের নৌকা দুঃখের পারাবার না-ও পার হতে পারত। ঝড় ঝাপটায় ডুবে যেতে পারত মাঝ সমুদ্রে। কিন্তু ওপারের বন্দর ছুঁয়েছে। পণ্য করেছেন ইচ্ছামত। তারপর সোনা জহরৎ বোঝাই ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে দেশে ফিরেছেন। নাম যশ খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রচুর। যাঁর ঘরে এক বেলারও

অন্ন ছিল প্রশ্ন, আজ তা কে খায়, দান ধ্যান পুকুর এবং দেবতা প্রতিষ্ঠা—কোনটাই বাদ যায়নি। বিষয় সম্পত্তি হয়েছে যথেষ্ট। বাবার দুঃসাহসে দুঃখ হয়নি বরং হয়েছে অপার ঐশ্বর্য।''[৭]

জানকী কুমার নিজের অমিত শারীরিক শক্তির জোরে সব কিছু করলেও তাঁর বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ন ছিল না। স্ত্রী শিবসুন্দরীর এটাই ছিল প্রকৃত নালিশ। মায়ের এই নালিশের কথা অমরেন্দ্রও তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ''জ্ঞাতি গোষ্ঠী গুরু পুরুতকে অযথা বিশ্বাস করে তিনি যা কিছু বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন, তা হয়েছিল তাসের ঘর। ভিত নেই, বাঁশ নেই, শুধু ছাউনি। একটু দমকা হাওয়া—ব্যস, সব কাত। মোদা কথা স্বার্থান্বেষীর দল তামাক খেয়ে পালিয়েছিল বাবার হাতে। পরিণামে শেষ জীবনে আবার দুঃখ। কাটারি ভোগ চালের বদলে আউশ। তাও এক একদিন জুটতে চাইত না। তিনি বলতেন জীবনে যে কতবার বুদ্ধিমান ও বোকা হলাম।''[৮] বাবার পাশাপাশি শৈশবে দেখা মার কথা বলতে গিয়ে অমরেন্দ্র বলেছেন, ''বাবা জীবনপাত করে আয় রোজগার ব্রাহ্মণ-ভোজন দেবসেবা করেছিলেন—কিন্তু সবাই বলত মা হচ্ছেন ঘোষ বংশের সৌভাগ্য দায়িনী। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এ একটা ট্র্যাজেডি। কিন্তু আমি জানি মায়ের উদয়াচলে একটু কুহেলী থাকলেও তাঁর পরিক্রমার বৃত্ত ঘুরে ঘুরে অস্তাচল পর্যন্ত শুধু সুখ ও সৌভাগ্যের দ্যুতি। তেমন মারাত্মক কোন দুঃখের আঁচড়টি তাঁর গায়ে লাগে নি। তাঁর মৃত্যু তো দেবী বিসর্জন। তাঁর শ্মশান তো হয়েছিল অনুগত, গুণমুগ্ধ হিন্দু-মুসলমান আত্মীয়-অনাত্মীয়ের পীঠস্থান। সে এক সুমহান দৃশ্য না দেখলে বোঝান কঠিন।''[৯] অমরেন্দ্র তাঁদের বিস্তৃত পারিবারিক পরিচয় তাঁর 'দক্ষিণের বিল' উপন্যাসে দিয়েছেন।

দুই

পিতা জানকী কুমারের দুঃসাহস ও সংগ্রামী মনোভাব ঐ কিশোর বয়সেই অমরেন্দ্রর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। জানকীকুমার একবার সপরিবারে শিলং এর পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, অমরেন্দ্র তখন ছ সাত বছরের বালক। একদিন রঙিন মাছ দেখে এত বিস্মিত হলেন যে, জুতো মোজা খোলার আর তর সইল না। লাফিয়ে পড়লেন জলে। ঝিরঝিরে স্রোত। খানিকটা এগিয়ে এক হাঁটু গভীর। একটা পাথরে ঠেক খেয়ে ছোট ছোট ঘূর্ণি। সেই ঘূর্ণির পাকে পাকে রঙিন মাছ। হাত পা কনকন করে, তবু লক্ষ্য নেই। অনেক এগিয়ে খাদ আরও গভীর। এ সম্পর্কে অমরেন্দ্র নিজেই লিখেছেন, "মাছ নেই, রাগে দুঃখে শীতে অবসন্ন, পথও হারিয়েছে কিশোর, শীতের কুহেলী রাত্রির মত মনে পড়ে, একপাশে গহিন খাদে কাঁটা জংলা ঝোপ, অন্য পাশে উঁচু টিলায় চাপ

বাঁধা পাহাড়ী গাছ। সূর্যটা বাইরে না মেঘের আড়ালে তা আর স্পষ্ট মনে নেই, দু একটা বুনো শুয়োরও এখন বেরিয়ে আসতে পারে। মাথায় করে এক খাসিয়া কৃষক পোঁছে দিয়ে গেল বালককে বাংলোয়। মার আতঙ্ক, বাবার রাগ। কিন্তু পরদিন আবার চুপি চুপি অভিযান।''[১০] ভাই-বোনেদের মধ্যে গল্প শোনার এক দুর্জয় লোভ অমরেন্দ্রকে বার বার মায়ের কাছে এনে বসিয়ে দিত। মার মুখে গল্প শোনা প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র বলেছেন, "যতদূর আমার স্মরণ হয় ক্লাসিক সাহিত্যের আস্বাদ মার মুখেই প্রথম পেয়েছি।''[১১] শিলং পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে রঙিন মাছ ধরতে গিয়ে বালক অমরেন্দ্র যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে ঘটনার স্মৃতি জানকী কুমার ও শিবসুন্দরীর মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই কদিন পরে অমরেন্দ্র আবার এক কাণ্ড করে বসলেন। "গল্প আর গল্প। মা অধৈর্য, ছেলের আর কৌতূহলের শেষ নেই। —তারপর? তারপর? ঘোড়ার ডিম, আমার কাজ আছে, কাল আবার শুনিস। ছেলে কেঁদে কেটে হুলস্থুল। আমার যে কাঠ নিয়ে যেতে হবে রান্না ঘরে, চা হবে। আমি দিয়ে আসব, তুমি গল্প বল। বাপরে বাপ সে কি হয়? কেমন খাড়া পাথরের সিঁড়ি। কে শোনে কার কথা, এক পাঁজা কাঠ নিয়ে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল ছেলে। ভয়ে বিস্ময়ে মা হয়ত চেয়ে রইলেন পায়ের কাঁচ কিন্তু বলিষ্ঠ গুল দুটোর দিকে। বোধহয় মা সেদিন আশ্বস্ত হলেন—না, এ ছেলে পারবে সারাজীবন চড়াই ভাঙতে?''[১২]

গল্প শুনবার আকর্ষণে মার কাছে ছুটে এলেও আসলে অমরেন্দ্রর ভাই-বোনেদের পরিচর্যা করতেন বড়দি মৃণালিনী। এই মৃণালিনী অমরেন্দ্রর চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর আওতায়ই অমরেন্দ্র মানুষ হয়েছেন। এই বড়দিকে সকলেই মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। মা ছিলেন বহু সন্তানের জননী। ফলে তাঁর পক্ষে ছেলে-মেয়েদের পরিচর্যা করা সব সময় সম্ভব হত না।

বরিশালের মঠবাড়িয়া থানা থেকে জানকী কুমার যখন বগুড়া জেলার ধুনট থানাতে বদলি হয়ে আসেন তখন অমরেন্দ্র একেবারে শিশু। এই ধুনটেই অমরেন্দ্রর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এখানে কয়েক বছর অতিবাহিত হবার পরই অমরেন্দ্রকে নিয়ে তাঁর মা বাবা বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। পড়াশুনার পরিবর্তে অমরেন্দ্র কেবলই বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনও ঝোপ জঙ্গলে, কখনও গাছে, কখনও নদীর চরে, খাল-বিলের ধারে। কখনও পাখির ছানা, কখনও হাস-আবার কখনও ফাঁদ পেতে ধরে ভাম। এ সব কাজে বাধা পেলে চলে যায় চাষী পাড়ায়। সেখানে তার খেলার সাথী হয় মুসলমান, না হয় কোন নমঃশূদ্র কিংবা আরও কোন অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সমবয়সী বালক। এই বয়স থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সংগে কিশোর অমরেন্দ্রর যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল, তখন থেকেই তা তাঁর অভিজ্ঞতার খোপে খোপে সঞ্চিত হতে থাকল। ছেলের এই মনোভাব

দেখে শিবসুন্দরী মনে মনে প্রমাদ গুনলেন। অমরেন্দ্রকে নিয়ে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। কি হবে এ ছেলেকে নিয়ে। জানকী কুমারও কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে, ছেলের দিকে তাকাবার কিংবা তার কথা ভাববার মত অবকাশ তাঁর ছিল না। এই অবস্থার মধ্যেই একদিন এক আকস্মিক যোগাযোগে জানকী কুমার বেশ ধুমধাম করেই মৃণালিণী ও হেমনলিনীর বিবাহ দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর দুজনেই চলে গেলেন কলকাতায়। কিশোর অমরেন্দ্র দিদির বিয়োগ ব্যথায় বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। ফলে কিছুদিন তাঁর দৌরাত্ম্য কমাতে শিবসুন্দরী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

জানকীকুমার আবার ধুনট থেকে বদলি হয়ে এলেন আদমদীঘি থানায়। কিন্তু এখানে এসেও কিশোর অমরেন্দ্রকে ঘিরে শিবসুন্দরীর সে স্বস্তি বেশিদিন স্থায়ী হল না। এবার তাঁকে ঘিরে শিবসুন্দরীর নতুন দুঃশ্চিন্তা দেখা দিল। কিশোর অমরেন্দ্র এবার ঢপ কীর্তনের দলে মিশতে আরম্ভ করলেন। তাদের আখড়ায় যাতায়াত করা, দলের সঙ্গে এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে। এই অবস্থা দেখে শিবসুন্দরী মৃণালিনীর অভাব অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু এক দিনের আর এক ঘটনায় সত্যি সত্যিই মৃণালিনীর ডাক পড়ল। কিশোর অমরেন্দ্র আর তার কিশোর প্রণয়িনী—শিবসুন্দরীকে অস্থির করে তুললেন। মৃণালিনী এসে অমরেন্দ্রকে নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানেই চলবে তার লেখাপড়া। কিশোর অমরেন্দ্রকে ছাড়তে শিবসুন্দরীর মন ব্যথায় টনটনিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে তা নীরবে সহ্য করা ছাড়া তাঁর আর কিই বা করার ছিল।

১৯১৮ সালে কলকাতার কালিঘাটের কাছে সাহানগর রোডে মৃণালিণীর শ্বশুর বাড়িতে অমরেন্দ্রর থাকার ব্যবস্থা হল। কালিঘাট হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে যখন অমরেন্দ্রকে ভর্তি করা হল, তখন তাঁর বয়স মাত্র নবছর। কলকাতায় এসে অমরেন্দ্রর চাঞ্চল্য কমল, লেখাপড়ার প্রতিও আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত খুব সাধারণও না আবার অসাধারণও কিছু না হলেও মাঝারি ধরণের ফল দেখা গেল বিভিন্ন শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষায়। এই সময় অমরেন্দ্রর শরীরটা ছিল অত্যন্ত রোগা ও ছিপছিপে। দেশে তখন পুরোপুরি স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ও হুজুগ। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ব্যায়ামের আখড়া। অগ্নিযুগ ও অনুশীলন পার্টির প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট। সন্ত্রাসবাদও রেখাপাত করেছে বাঙালীর মনে। বার বার হামলা হচ্ছে ইংরেজ প্রভু এবং খয়ের খাওয়া নেটিভদের ওপর। মাঝে মাঝেই সারা বাংলার সঙ্গে বাকি ভারত চমকে উঠছে ভেতো বাঙালীর দুঃসাহসিক বোমা বন্দুক পিস্তলের শব্দে। কেউ বা কিশোর, কেউবা সবে ষোল বছরে পা দিয়েছে। সে যুগে বাঙালী শপথ নিয়েছিল, মৃত্যু কি মুক্তি।

তাই প্রবল প্রতিপক্ষ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই হারকিউলিস কিম্বা গামার মত শক্তি। লাঠি ঘোরান তলোয়ার চালান সবই শিখতে হবে। শক্তি নইলে জীবন ধারণ বৃথা। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পনের বছরের অমরেন্দ্রও কুস্তির আখড়ায় এসে ভর্তি হলেন। ফলে লেখাপড়া হয়ে দাঁড়াল সেকেন্ডারী।

ব্যায়ামের আখড়ায় ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ার প্রতি অমরেন্দ্রর আর তেমন কোন আকর্ষণ দেখা গেল না। এই সময়ের অবস্থা অমরেন্দ্র নিজেই সুন্দর বর্ণনা করেছেন, "ছিলাম দুর্বল, পেলাম শক্তির আস্বাদ। এ যেন হয়ে দাঁড়াল বহুকাল রোগে ভোগা রোগীর কাছে কুপথ্য। নিয়মিত মাইনে দেই, কিন্তু ইস্কুলে যাবার নাম নেই। বছরের শেষে কোনো রকমে হাতে পায়ে ধরে প্রমোশন। বার বার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যে, এবার থেকে ভাল ছেলে হয়ে চলব। কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। আজ দঙ্গল-লড়া দেখতে যাওয়া, কাল প্রদর্শনী, পরশু পাঁচ কোষ দূরে থেকে মড়া ঘাড়ে করে এনে এনে পোড়ানো—এমনি করে দশম শ্রেণীর সিঁড়িতে পা দিয়ে চমক ভাঙল। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখি অকূল সমুদ্র।"১৩ ব্যায়ামের আখড়ায় কুস্তি লড়ে' ডন বৈঠক দিয়ে, লাঠি ঘুরিয়ে তলোয়ার চালিয়ে রোগা ছিপছিপে অমরেন্দ্র প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বলিষ্ট হয়ে উঠলেন। কিছু মড়া পুড়িয়ে, এর ওর বাড়ি টাইফয়েড কলেরার নাইট ডিউটি দিয়ে পাড়ায় সমাজ কল্যানী খেতাবী লাভ করে ফেলেছেন। কিন্তু কোন বোমা বন্দুক নিয়ে কোথায়ও যাবার আহ্বান তখনও তিনি পাননি। তাই আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, "না হলাম ভাল ছেলে, না পারলাম মুহূর্তে প্রাণ বলি দিতে। আমরা যুগের হুজুগে ঘোলায় পাক খেতে লাগলাম।"১৪

কলকাতায় অমরেন্দ্র যখন অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন—সামনেই এগিয়ে আসছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। জানকী কুমারও কিছুদিন আগে মালদায় হবিবপুর থানায় বদলি হয়ে গেছেন। একদিন আকস্মিক ভাবেই এল বাবার অসুখের সংবাদ। জানকী কুমারেব বহুমূত্র বেড়েছে এবং তার ওপর হয়েছে কার্বাঙ্কল। অমরেন্দ্রর সামনে মারাত্মক পরিস্থিতি। মার পক্ষে একই সঙ্গে রোগী এবং সংসার সামলান কঠিন কাজ। তৎক্ষণাৎ অমরেন্দ্র মালদা চলে গেলেন। কলকাতায় বসে যেটুকু নার্সিং শিখেছিলেন তা সম্বল করেই তিনি বাবার শুশ্রূষার ভার নিলেন। অপ্রমেয় প্রানশক্তির বলে বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন। অমরেন্দ্রও হাঁফ ছেড়ে বেঁচে কলকাতায় ফিরে এলেন।

মালদা থেকে কলকাতায় ফিরে অমরেন্দ্র আবার তাঁর জীবন জিজ্ঞাসায় আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলেন, দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল মর্মন্তুদ যাতনায়, মাসের পর মাস। নিয়মিত রাজনৈতিক ঢেউ আসতে লাগল। সন্ত্রাসবাদ থেকে গান্ধীবাদ, হিংসা থেকে অহিংস-সংগ্রাম। নিজের

এই অবস্থার কথা বলতে গিয়ে অমরেন্দ্র বলেছেন, "আমি নিশ্চিন্ত মনে কোনো বাদে ডুবে যেতে পারলাম না, শুধু বিপুল বেদনায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতাম মিছিলের পর মিছিল করে বাঙালী এগিয়ে যাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথের ডাক শুনেছি, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা। যতীন দাস প্রান দিলেন, যথাসর্বস্ব দান করে বৈরাগী হলেন বিলাসী সি. আর. দাশ। একের পর এক এলেন যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শাসমল, সুভাষ বসু। মহৎ বাঙালীর মিছিল চলল সারা ভারতের পুরোধা হয়ে। আশুতোষ শিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে পথ আরো স্পষ্ট করলেন। আমি পথ পাচ্ছিনে। 'শিশু' কাব্য-গ্রন্থ আমায় দিলে দীক্ষার ললাটিকা। রবীন্দ্রনাথ পথ দেখালেন।"[১৫]

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ঠিক আগে ও পরে অমরেন্দ্রর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য গ্রন্থ তাঁর জীবনে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করেছিল। প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ পড়াশুনার প্রতি মনঃসংযোগ আনতে সাহায্য করেছিল, আর সুদূর প্রসারী যে ফল তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি পঞ্চম অধ্যায়ে। দ্বিতীয়টি হোল ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার আগেই স্বাস্থ্যহীন শিবসুন্দরীর কথা ভেবে জানকী কুমার ফরিদপুর জেলার উলপুর গ্রামের কেদারেশ্বর রায়চৌধুরী ও জীবনতোষিনী দেবীর কন্যা পংকজিনীর সঙ্গে অমরেন্দ্রর বিবাহ দিলেন। বিবাহের তারিখটি ছিল ১৩৩২ সালের ১২ই বৈশাখ, শনিবার। এই বিবাহে অমরেন্দ্রর আপত্তির কোন সুযোগই ছিল না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই জানকী কুমার অমরেন্দ্রর বিবাহ দিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি ছেলেকে ভাল করে চিনতেন। যদি পরীক্ষায় কিছু অঘটন ঘটে। কিন্তু অমরেন্দ্র প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে সকলকে আশ্বস্ত করে ছিলেন। সালটা ছিল ১৯২৫।

তিন

সাউথ সুবার্বন কলেজে আই. এস. সি ক্লাসে ভর্তি হলেও অমরেন্দ্রর অতলান্ত গহ্বরে তখন রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্য গ্রন্থের ক্রিয়া সুরু হয়েছে। দূরে থেকে বাবা টাকা পাঠাতেন, কলকাতায় ভগ্নিপতি অভিভাবক। মাঝে মাঝে ভগ্নিপতি জিজ্ঞেসা করেন, পড়াশুনা কেমন চলছে। যুবক অমরেন্দ্র ভগ্নিপতিকে আশ্বস্ত করার জন্য, মিথ্যা আশ্বাস দেন। আবার সেই ভগ্নিপতির নজর এড়িয়েই চলে রাত জেগে হ্যারিকেনের আলোয় আড়াল দিয়ে গল্প কবিতা লেখা।

এই কলেজেই অমরেন্দ্রর দুজন বন্ধু হয়েছিল। একজনের নাম মাষ্টার ব্যানার্জী অপরজন নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী। মাষ্টার ছিল সর্ববিদ্যাবিশারদ। কলেজ কামাই, কিন্তু পুরো পার্সেন্টেজ, পরীক্ষায় টোকাটুকি, প্রশ্ন আউট। বাপের পয়সা ছিল প্রচুর। ঐ বয়সেই প্রচুর দামী সিগারেট নিজেও খেত,

অন্যদেরও খাওয়াত। আর নৃপেন ছিল খাস শহরের ছেলে। জব্বর আড্ডাবাজ। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার। কিন্তু এদের সঙ্গও অমরেন্দ্রর ভাল লাগত না। কারণ 'শিশু' কাব্যগ্রন্থ তখন তাঁর মনের অতলান্ত প্রদেশে সাইক্লোনের পূর্বাভাস সৃষ্টি করেছে। ঠিক এই সময় তাঁর পরিচয় হল কলেজের আর এক সহপাঠী প্রাণতোষ দাশগুপ্ত ডাক নাম নীতু। সে ভাল কবিতা এবং গল্প লেখে। তার একটা মহৎ ঐতিহ্যও আছে। সে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। এই নীতুর হাত ধরেই অমরেন্দ্র পরিচিত হতে পেরেছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে। ''নীতুর সঙ্গে একদিন কলেজের পর অচিন্ত্য কুমারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। অচিন্ত্য বাড়ি নেই। টেবিলে 'পাকা' মার্কা মূল্যবান রাইটিং প্যাডে মুক্তাক্ষর—'বেদে'র পাণ্ডুলিপি। ভাল করে দেখলাম মুক্তার মত লেখা নয়—অপরিসীম বৈশিষ্ট এবং পরিশ্রমে যেন প্রতিটি হরফ সাজান। সাদা কাগজ ঝক ঝকে কতগুলো অক্ষর, মুক্তা নয়, কিন্তু মুক্তি পেয়েছে এক ভবিষ্যতে। আমি পঁয়ত্রিশ বছর আগে যা দেখেছি, এখন তা বাঙলা সাহিত্য দেখছে পরম বিস্ময়ে।''১৬ এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ভগ্নিপতির ব্যবস্থাপনায় অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত অমরেন্দ্রর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন। অমরেন্দ্র আই, এস, সি প্রথম বর্ষে আর অচিন্ত্য কুমার এম, এর সঙ্গে ল পড়েন।

শিক্ষাগুরু অচিন্ত্য কুমারের কাছে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'কল্লোল'-এর ঐতিহ্যও বোধহয় তখন ধীরে ধীরে অমরেন্দ্রর মধ্যে সংক্রামিত হতে শুরু করেছে। যে অমরেন্দ্র শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার ব্যাকরণ শিখতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই সুযোগই একদিন এল তবে রবীন্দ্রনাথের কাছে নয়। সুযোগ এল গৃহ শিক্ষক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাছে। এই অচিন্ত্যকুমারই একদিন বন্ধুর মত স্নেহে অমরেন্দ্রকে শিখিয়ে দিলেন, ছন্দের তালমাত্রা। শুধু কবিতার নয়, গদ্যেরও। প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্যকুমারই অমরেন্দ্রকে বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অকূল সমুদ্রে এবার যেন অমরেন্দ্র তল পেলেন। অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হল। পড়াশুনায় কিছুটা মনঃসংযোগ ফিরে এলো। অচিন্ত্যকুমারের কাছে ছন্দের তালমাত্রা শেখার কিছুদিন পরেই নীতুর মারফৎ কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে অমরেন্দ্রর পরিচয় হল। সে সময় অমরেন্দ্রর লেখা প্রথম কবিতা 'শ্মশানে বসন্ত' কবিশেখর দেখার পর সামান্য কিছু সংশোধন করে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রে পাঠিয়ে দিলেন। যে ভয় ও আশংকা নিয়ে অমরেন্দ্র এসেছিলেন, কবিশেখরের পিতৃস্নেহে সে ভয় ও আশঙ্কা দূর হয়ে নিয়ে এলেন সাহস এবং উৎসাহ। ঘটনাটি ১৩৩৪ সালের বৈশাখ মাসের। এর কিছুদিন পরেই অমরেন্দ্রর জীবনে এল সেই মুহূর্ত যে মুহূর্তের জন্য তিনি নিজেও হয়তো প্রস্তুত ছিলেন না। ১৩৩৪ এর আষাঢ় মাসে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হল অমরেন্দ্রর

'শ্মশানে বসন্ত' কবিতাটি। এই কবিতা প্রকাশের পর নিজের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র বলেছেন, "একজন নবাগতর পক্ষে এ যে কত বড় সম্বর্ধনা।"

'শ্মশানে বসন্ত' প্রকাশিত হবার দু মাস পরে অমরেন্দ্রর জীবনে এল আরও এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। ১৩৩৩ সালে 'বঙ্গবাণী ও 'কল্লোল' এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হল যথাক্রমে 'মরুভূমি' কবিতা এবং 'কলের নৌকা' গল্প। এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন. "কল্লোলে অনেক লেখকই ক্ষণদ্যুতি প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছেন। অমরেন্দ্র ঘোষ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কল্লোলের দিনে একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেখি সে গল্প লেখে, এবং যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ার মত, বস্তু আর ভংগী দুই-ই অগতানুগ। খুশি হয়ে তার কলের নৌকা ভাসিয়ে দিলাম কল্লোলে।"১৭ শ্মশানে বসন্ত' এবং 'কলের নৌকা' প্রকাশিত হবার পর বন্ধু মহল ও কলেজ মহলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। প্রতিষ্ঠা এল কলেজ মহলে। সকলেই হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল অমরেন্দ্রকে। আর সবচেয়ে যে বেশি খুশী হল সে নীতু। 'কলের নৌকা' প্রকাশিত হবার পর অভিভূত অমরেন্দ্র তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার প্রথম লেখা প্রথম গল্প কলের নৌকা' কল্লোলের প্রথম দিকে ছাপা হল. রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত না পৌঁছেও আমি যেন একটা সিঁড়ি পেলাম অচিন্ত্যের সহযোগিতায়।"১৮

'কলের নৌকা' প্রকাশিত হবার পরই অমরেন্দ্র অচিন্ত্য কুমারের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন। অচিন্ত্য কুমার তখন থেকেই অমরেন্দ্রর চোখে কল্লোলের ব্রহ্মমহিমা—আর কল্লোলের দুর্বার প্রভাব নিজের অজান্তেই অমরেন্দ্রকে কখন যে কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে এক সাহসী সৈনিকে পরিণত করেছিল, তখন তিনি জানতে না পারলেও পরিণত বয়সে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই বোধ হয় আই. এস. সি ক্লাসের ছাত্র অমরেন্দ্র কল্লোলের যুগের প্রভাব এড়াতে পারলেন না। অমরেন্দ্রর অধিবাস 'কল্লোল যুগে' হলেও পূর্ণ জাগৃতি প্রথম উপন্যাস 'চরকাশেমে'। এই সময় অচিন্ত্য কুমারের প্রভাব অমরেন্দ্রকে আরও একটি দিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা হল আই. এস. সির পড়া। এ সময় বড়দিও ভগ্নিপতি দুজনেই তাঁর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে আশঙ্কা হলেন। ভগ্নিপতি চাইতেন না অমরেন্দ্র সাহিত্য রচনা করুক আর জানকী কুমার শুনলে তো কথাই নেই। সম্ভবতঃ এ সব কথা মনেই রেখেই অমরেন্দ্র আবার গভীরভাবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলেন।

আই. এস. সি পরীক্ষা একেবারে সামনে। হঠাৎ একদিন নীতু এসে 'মানসী ওমর্মবানী'১৯ নামে একখানি মাসিক পত্র সামনে মেলে ধরল। তাতে অমরেন্দ্রর 'শ্মশানে বসন্ত' কবিতার একটি রসগ্রাহী আলোচনা বেরিয়েছে। সে আলোচনা পড়ে অমরেন্দ্র শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হলেন। কিন্তু বড়দি কিংবা ভগ্নিপতি কারুর কাছেই তা প্রকাশ করতে পারলেন না—এক অজানা আশংকায়। যদি

তাঁরা কিংবা বাবা জানতে পারেন তা হলে আর রক্ষা নেই। সুতরাং মনের অতলান্ত প্রদেশে আবার সেই চিন্তাটা জেগে উঠে কুরে কুরে খেতে লাগল অমরেন্দ্রকে। তাঁর মনের এই ভাবান্তর বোধ হয় ভগ্নিপতির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তিনি তখনই জানকী কুমারের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন। কিছুদিন পরেই জানকী কুমার লিখলেন, অমরেন্দ্রকে যেন দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অমরেন্দ্র এ সব ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। কিন্তু কল্লোল যুগের টানে এবং বাবার আদেশে দেশে ফেরার কথায় অমরেন্দ্র দোটানায় পড়ে আর আই. এস. সি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। কিন্তু বড়দি কিংবা ভগ্নিপতি কেউ-ই আর তাঁকে দেশে ফিরে যাবার কথা বলতে পারছেন না, সম্ভবতঃ স্নেহের বন্ধনের কথা ভেবে। কেন না দীর্ঘ দশ বছর কেটেছে তাঁদের সঙ্গে। দশ বছর ধরে বড়দি ও ভগ্নিপতি তাঁকে লালন-পালন করেছেন। ফলে অমরেন্দ্রকে দেশে পাঠিয়ে দিতে তাঁদের মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বাধ্য হয়েই তাঁরা ব্যাপারটা চেপে গেলেন।

আই. এস. সি পরীক্ষা দিতে না পারায় অমরেন্দ্রও কিছুটা লাগাম ছাড়া হয়ে পড়লেন। কলকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে সরগরম। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব 'অসহযোগ' (১৯২০-২৯) আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছে। বাঙালী তখন দেড়শ বছরের পরাধীন ভারতের শিকল-ভাঙার পণ নিয়েছে। শারীরিক নির্যাতন তুচ্ছ, ফাঁসিকাঠ খেলনা, সমস্ত তারুন্য যেন রক্ত-পাগল। কবি নজরুল তখন জাতির জীবনে অনুরণন তুলেছে শিকল বাজিয়ে জেলে বসে। মাঠে ঘাটে কৃষক জনপদে তখন উদাত্ত কণ্ঠে আগুন ছড়াচ্ছে মুকুন্দ দাস। কলকাতার যুবকদের তখন আদর্শ ক্ষুদিরাম, কানাইলাল। তাই অমরেন্দ্র আবার যাতায়াত সুরু করলেন ব্যায়ামের আখড়ায়। এখানে ব্যায়ামের আখড়ায় শুধু শরীর চর্চাই হোত না, যুবকদের মনে স্বাধীনতার সংকল্পও জাগিয়ে তোলা হত। আর এরই প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ একদিন দল বেঁধে কংগ্রেসের মিটিং শুনতে গিয়ে ইংরেজ সার্জেন্টের লাঠি খেয়ে বাড়ি ফিরে এলেন অমরেন্দ্র। সেদিনই সমস্ত ব্যাপারটা বড়দি ও ভগ্নিপতির কাছে জানাজানি হয়ে গেল। ১৩৩৬ সালে 'বৈশাখী' মাসিক পত্রের শারদীয় সংখ্যায় অমরেন্দ্রর 'চন্দনদার' গল্পটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে—সে কথা বড়দি ও ভগ্নিপতি কেমন করে যেন জেনে গেলেন। ভগ্নিপতি অমরেন্দ্রর সাহিত্য চর্চা খুব ভাল চোখে দেখলেন না। ইংরেজ সার্জেন্টের লাঠি খাওয়া এবং মাসিক সাহিত্য পত্রে গল্প লেখা—অমরেন্দ্রর কলকাতা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাল। ভগ্নিপতির আশ্রয় ছেড়ে দেশে ফিরে যাবার আয়োজন সম্পূর্ণ হল। পিছনে পড়ে রইল নীতু, শ্মশানে বসন্ত, কল্লোলের ব্রহ্ম মহিমা অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায়ের পিতৃ স্নেহ,

ব্যায়ামের আখড়া, ইংরেজ সার্জেন্টের লাঠি—'কল্লোল যুগ' থেকে বিদায় নিয়ে 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে অমরেন্দ্রকে পাড়ি জমাতে হল দেশের পথে।

চার

আই. এস. সি. পরীক্ষা না দিয়ে অমরেন্দ্র দেশে ফিরে আসার পর স্ত্রী পঙ্কজিনী খুশী হলেন। আঠারতে পা দিয়েই পঙ্কজিনী অমরেন্দ্রর জীবন সঙ্গিনী হয়েছেন। চোদ্দ বছর বয়সেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র পড়েছেন। স্বামী হিসেবে অমরেন্দ্রকে পেয়ে তিনি মহা খুশী। তাঁর সখীদের বরেরা চাকরী বাকরী করে। কিন্তু পঙ্কজিনীর গর্ব তাঁর স্বামী রাইটার—লেখক। কল্লোল যুগের সূচনায় অমরেন্দ্রর সাহিত্য চর্চার সঙ্গে পঙ্কজিনীর তখন পরিচয় হয়ে গেছে। তাই সেই বয়সে তিনি সব সময় অমরেন্দ্রকে উৎসাহিত করতেন। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র নিজেই বলেছেন, "সাহিত্যের শুরু থেকেই স্ত্রী আমার প্রথম সহৃদয়া সমঝদার।" ২০

পড়াশুনার আর কোনরকম ইচ্ছা অমরেন্দ্রর ছিল না। জানকী কুমার চাইছিলেন অমরেন্দ্র বিষয় সম্পত্তি বুঝে নিক, শিব সুন্দরীর ইচ্ছা জানকী কুমার এবার ঘরে ফিরে বিশ্রাম নিক। কিন্তু 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে 'কল্লোল যুগে, যার যাত্রা সুরু—সে কি এত সহজে বিষয় সম্পত্তির মায়াজালে নিজেকে জড়াতে পারে? তাই প্রতিদিন চলে তার অভিসার। জানকী কুমার তখনকার দারোগা। আর দারোগা মানেই ঘোল কোষের জঙ্গ। উঠতে বসতে হুকুম তালিম করত সে অঞ্চলের বড় ছোট সবাই। বাঘা পুরুষ। তাঁর হাঁকে বাঘে গরুতে জল খেত একঘাটে। জানকী কুমার কাজের চাপে নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন না, আয়েশ করতেন পরিবারের লোকেরা। ঠিক এই সুযোগের অপেক্ষাতেই অমরেন্দ্র পাকা শিকারীর মত ওৎ পেতে বসেছিলেন। গ্রীন বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। রৌদ্র ছায়ায় বাঁকের পর বাঁক কখনো উজানে কখনো ভাটিতে। জ্যোৎস্না মাখা আকাশের দৃশ্য, ফুল পল্লবের ছায়া মাখা সেই রূপ—সময় সময় তীব্র নয়ত মোলায়েম গন্ধ অমরেন্দ্রকে কল্পনার এক স্বর্গলোকে পৌঁছে দিত। আবার কখনো হাতীতে হাওয়দা লাগিয়ে সঙ্গে পর্যাপ্ত অনুচর বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন। নারুলী সিল্লি জংলি হাঁস বাঁক বেঁধে আনতে হয়েছে।

একদিকে অমরেন্দ্রর যখন এইভাবে জীবন কাটছে, অন্য দিকে তখন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে দেখা দিচ্ছে পরিবর্তনের সূচনা, দুর্যোগের ঘনঘটা। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় (১৯২০—২৯) যখন স্বাধীনতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন এল পূর্ণ স্বাধীনতা পর্বের (১৯৩০—৪১) আন্দোলনের ডাক। "এই

আন্দোলন দমনে ইংরেজ সরকার নানান কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করলেন। একদিকে কঠোর হাতে আন্দোলন অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণকে কিছু কনসেসন দেবার জন্য কিছু কিছু পূর্বতন আইনের সংশোধন। ফল স্বরূপ ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন করা হল ১৯৩০ সালে।"[২১] এই ঘটনার বিশেষ করে আর্থিক বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বংসে এল। সমাজের ভিত্তিতে দেখা দিল ফাটলের ক্রমবর্দ্ধমান রূপ। "বিশ শতকের সমাজ-ভাঙনও উল্লেখযোগ্য। বাংলার সমাজ প্রধানত বর্ণ-বিত্ত-রাষ্ট্র-নির্ভর। এর মধ্যে আবিশ্যি বর্ণ ও বিত্ত প্রধানতর। রাষ্ট্রিক সাধনায় ভারত দুলেছে দোটানায়—একদিকে বিদেশী শাসকের নির্যাতন, অন্যদিকে দেশী প্রজাসাধারণের মুক্তি সংগ্রাম কিন্তু ইতিহাস পুরুষ চলেছে তৃতীয় পথে, যা দুয়েরি সমন্বয়ের রূপ।"[২২]

এ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আরও একটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাহলে কোন্ প্রেক্ষাপটে অমরেন্দ্রকে পরিবারের হাল ধরতে হয়েছিল, তা অনেকটা পরিস্কার হবে। আগেই বলেছি, 'একদিকে বিদেশী শাসকের নির্যাতন, অন্যদিকে দেশী প্রজাসাধারণের মুক্তি সংগ্রাম'—এই সন্ধি লগ্নেই সাংসারিক দায়িত্বে অমরেন্দ্রর অভিষেক। "বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন ১৯৫০-এর পাশাপাশি এল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাকিং অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ১৯৩০, 'The Croat Depression 1930-31'—এর পরিপ্রেক্ষিতে 'বঙ্গীয় শ্রমিক রক্ষা আইন ১৯৩৪ অত্যন্ত শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিভ। আর্থিক মন্দার দিনে শ্রমিকের ব্যয়ানুযায়ী আয় হত আরো কম, তাই কখনো কখনো ব্যাক্তিগত কারনে সুদখোরের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া অপরিহার্য্য হয়ে উঠতো। ফলে পাওনাদার জোর জবরদস্তি করে পাওনা আদায় করত কিংবা বেতনের দিন পাওনাদার কারখানার ভিতর ও বাইরে আদায়ের অভিসন্ধি নিয়ে ঘোরাফেরা করত—এই আইনে তা নিষিদ্ধ করা হয় এবং আইন অমান্যে জেল হবে।"[২৩] একদিকে এই আইন অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থার চিত্রের ফারাকটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। একটি সংখ্যা তত্ত্বের সাহায্যে বক্তব্যটিকে আরও সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। "যে কৃষককে ভিত্তি করে ভূমি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও অদল-বদল, সেই কৃষকের সংস্থান নির্ণয় করা প্রয়োজন। অতিপ্রজতার পূর্বে রাষ্ট্রনৈতিক কোলাহল কিংবা আর্থিক অবিচার থাকা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকের যে পরিমাণ জমি ছিল, অতিপ্রজতার পর-ও কি তাই আছে? জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে যে কর্ষণাধীন জমির আয়তন ইত্যাদি জানবার উদ্দেশ্যে ফ্লাউড কমিশন (Floud Commission, 1939—) যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে জানা যায়, গড় পড়তা একটি পরিবারের উপযুক্ত খাদ্য বস্ত্রসহ জীবিকা নির্বাহ করতে অন্যূন ৫ একর বা তের বিঘা চাষের জমির প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলার চাষীর তা

আছে ? এ বিষয়ে ফ্লাউড কমিশন যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে নিম্ন-লিখিত তালিকায় এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে :—

। কৃষিজীবী পরিবারের শতাংশ

২ একরের কম	...	৪৬.০
২—৩ ”	...	১১.২
৩—৪ ”	...	৯.৪
৪—৫ ”	....	৮.০
৫—১০ ”	...	১৭.০
১০ একরের বেশী	...	৮.০

তালিকা থেকে জানা যায়, মাত্র শতকরা ২৫ভাগ এর কিছু বেশী কৃষিজীবীর ৫ একর বা ততোধিক জমি আছে। অর্থাৎ প্রায় শতকরা পঁচাত্তরটি পরিবারের জীবন ধারনের মত যথেষ্ট জমি নাই।” [৪]

অমরেন্দ্ররা ছিলেন ঐ শতকরা ২৫ জনের পরিবারভুক্ত। অর্থাৎ ৫ একর বা ততোধিক জমির মালিক। এ সময় অমরেন্দ্র ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরে, নিজের আদিবাস পূর্ব বাঙলায় এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। একেবারে অজ পল্লীগ্রাম। সপ্তাহে একদিন মাত্র ডাক বিলি হয়। তাও আবার অজুহাত পেলেই বন্ধ। কাছাকাছি পাঁচ সাত মাইলের ভিতর একটা তেমন ইস্কুল পর্যন্ত নেই। কলেজ, লাইব্রেরী তো আকাশ কুসুম, এই ভাবেই অমরেন্দ্র নদী বিল ঝিলের বেষ্টনীতে আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসিত হলেন। পুঁথির বদলে পাঠ করেন মানুষ। মাটির সংগে যারা অন্তরঙ্গ তাদের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে অর্জন করতে থাকেন জীবন।

॥ টীকা ॥

১। ‘শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ পরিচয় পুস্তিকা’। ১৯৫৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় ‘টালিগঞ্জে অমরেন্দ্র ঘোষ সম্বর্ধনা কমিটি’ কর্তৃক প্রকাশিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

২। ভবানবন্দী-পৃষ্ঠা, ১০

৩। অমরেন্দ্র ঘোষের প্রচলিত জন্ম সাল সঠিক নয়। ডঃ জীবেন্দ্র বিনোদ সিংহ রায় তাঁর ‘কল্লোলের কাল’ গ্রন্থে (পৃ.১১৫) অমরেন্দ্রর জন্ম সাল ১৯০৬ বলে উল্লেখ করেছেন। তা ঠিক নয়। ১৯০৭ই যথার্থ এবং তা লেখকের জন্মকোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত।

৪। জবানবন্দী, পৃষ্ঠা—১৫৩
৫। ঐ —২৬-২৭
৬। ঐ — ২৭
৭। ঐ —২৭-২৮
৮। ঐ — ২৮
৯। ঐ —৩০-৩১
১০। ঐ — ২২
১১। ঐ — ২৪
১২। ঐ — ২৩
১৩। ঐ — ১৪৮
১৪। ঐ — ১৪৯
১৫। ঐ — ১৫২
১৭। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা-২৩৯
১৮। জবানবন্দী, পৃষ্ঠা-১২৫
১৯। মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৪
২০। জবানবন্দী, পৃষ্ঠা-৩৮
২১। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—অনিল বিশ্বাস। পৃষ্ঠা-৭
(১৯০১-১৯৫১)
২২। ঐ ঐ পৃষ্ঠা-৮
২৩। বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা-১৩৫
২৪। ঐ পৃষ্ঠা-১২৫-১২৬

জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্য জীবনের নির্বাসন

এক

আধুনিক সভ্যতা ও সাহিত্য জীবন থেকে নির্বাসিত হয়ে অমরেন্দ্র জীবন সংগ্রামে প্রবেশ করলেন। সংসারে ঢুকেই তিনি বুঝতে পারলেন, কেন মানুষে বলে বিষয় বিষ। ভূমি ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাল জুয়াচুরি, দাঙ্গা-মামলা, হিংসা-দ্বেষ। সবচেয়ে মারাত্মক দিনের পর দিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলা—যে প্রতিশ্রুতি কোনদিন কেউ পালনের দায়িত্ব নেবে না। এক কথায় অমরেন্দ্র দেখলেন বিষয়ের সবটাই বিষ, শুধু কলসীর মুখে একটুখানি যা ক্ষীর। সুরু করতে না করতেই সব শেষ হয়ে এলো। শুভ দৃষ্টির মুখে যেন নিবে গেল প্রসন্ন দীপশিক্ষা। দৈবের ঝাপটা এলো অকস্মাৎ। জানকী কুমারের চাকরি গেল। অমরেন্দ্রর গড়া স্বাস্থ্য ভাঙল। দু তিনটে বছরের মধ্যে সব লণ্ড ভণ্ড। কেউ বলল প্লুরেসি, কেউ বা টি, বির সূত্রপাত। 'শ্মশানে বসন্ত'-এ ও 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে একদা যার সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল—জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে নির্বাসিত হল অমরেন্দ্রর সাহিত্য জীবন। এত-কালের বন্ধুবান্ধব এবং মহানগরী কলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অমরেন্দ্র।

ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য অমরেন্দ্রর চেঞ্জে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ল। তখন বাধ্য হয়েই অমরেন্দ্রকে কলকাতার সাহিত্যানুরাগী বন্ধু নন্দলাল রায়ের স্মরনাপন্ন হতে হয়। নন্দলালের বাবা মা বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা। এই নন্দলাল রায়ের চিঠি নিয়েই অমরেন্দ্র এলেন দেওঘরে। এখানে এসে অমরেন্দ্র বেশ আদর যত্নেই থাকার সুযোগ পেলেন। প্রথমে বৈঠকখানায় থাকতেন, খাবার সময় ভিতরে যেতেন। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই অমরেন্দ্র বৈঠকখানা ছেড়ে রান্না ঘরে ঢুকে জবর দখল করে বসলেন। ডাল্না ঘন্টর বদলে মাছের কালিয়া, মাংসের চপ। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা খুব সহজেই আপন করে নিল অমরেন্দ্রকে। এখানে বসেই নন্দলাল রায়ের বোন রাণী অমরেন্দ্রর বেশ কয়েকটি লেখা গল্পের পাণ্ডুলিপি কপি করে দিয়েছিলেন। যা বহুকাল অমরেন্দ্রর সংগ্রহে ছিল। জীবন সংগ্রামে প্রবেশ করে সাহিত্য-জীবন থেকে নির্বাসিত হলেও—দেওঘরে এসে অমরেন্দ্র সাহিত্য চর্চায় আবার মনোনিবেশ করার চেষ্টাও করেছিলেন। পনের দিনের জন্য দেওঘরে এসে অমরেন্দ্র পুরো তিনটে মাস এখানে কাটিয়ে অবশেষে দেশে ফিরে গেলেন।

দেওঘর থেকে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে ফিরে আসার সংগে সংগে আর এক নতুন

অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন অমরেন্দ্র। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন ১৯৩০ সালে সংশোধন হবার পর ১৯৩৮-এ আবার তার সংশোধন হল। সব মিলিয়ে সামন্ত যুগ তখন ভেঙে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত। কিন্তু জানকী কুমার অত্যন্ত জেদী ও কঠোর পুরুষ। ভাঙছেন তবু মচকাতে চাইছেন না। কেবলই বলেন, এখনো যা আছে তা রেখে-বেঁধে খেলে অমরেন্দ্রর এক পুরুষ রাজার হালে কেটে যাবে। এমন সব দলিল রয়েছে যার জন্য এ ভূসম্পত্তি কেউ পাট্টা-কবলা দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু ভোগ করতে পারবে ইচ্ছামত। কখনো মা ওয়ারিশ, কখনো ছেলেরা, আবার কখনো বা মেয়েরা। জানকী কুমার অমরেন্দ্রকে দলিল দেখালেন নানা রকম। অমরেন্দ্র এ দলিলরূপ জ্ঞান সমুদ্রের তটে তখন সবে মাত্র শিক্ষানবিশ। তিনি বিস্ময়ে হতবাক। এক এক দলিলের এক এক চরিত্র পরিচয়। অমরেন্দ্রর মনে হল, কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চোখের জল যে রয়েছে, হয়ত সামান্য এক টুকরো জমি নিয়ে। কত ক্ষুধার্ত মানুষ যে গেছে উৎখাত হয়ে অমরেন্দ্রর আরও মনে হল, কাউকে নিরন্ন করে রেহাই নেই। মিথ্যার শেষ হচ্ছে মিথ্যায়—বিনাশে

অমরেন্দ্রর পারিবারিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। কেত্তায় কেত্তায় মামলা—ফৌজদারী আদালত। তার সংগে যোগ হল বকেয়া খাজনার নালিশ। আঘাতে আঘাতে জানকী কুমার যেন ক্ষেপে গেলেন। ছিলেন ধর্মভীরু, হয়ে উঠলেন হিংস্র। তাঁর আয়ের সংগে এখন আর ব্যয়ের সংগতি নেই। অথচ বজায় রাখতে হচ্ছে সমস্ত মান মর্যাদা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড দোল দুর্গোৎসব। যাঁদের এতকাল প্রতিপালন করেছেন, তাঁদেরই বা কি করে বলবেন তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। শত্রুরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে চারদিকে। সারা বছরের খোরাকি নেই ঘরে। চাকরীটাও গেছে ষড়যন্ত্রে। জানকীকুমারও আবার উলটে আঘাত দিতে লাগলেন—এক পাই-র জমায় আর্জি দিয়ে হাইকোর্ট। মামলা ত নয়, মৃত্যুকে নিয়ে যেন মহরত। জানকী কুমারের পরিবার ভাঙছে সাম্রাজ্যের মত যৌথ পরিবার। তবু দাবা পাশার চীৎকার চলছে আটচালার প্রাঙ্গণে। তামাকের ধূনি জ্বলছে। হুঁকো ঘুরছে ব্রাহ্মণ কায়স্থ হিন্দু—মুসলমানের ক্রমিক অভিজাত্যের তকমা নিয়ে। অন্ন নেই, সাম্রাজ্য ভাঙছে—আরো অন্ন চাই, ফসল চাই নানাবিধ।

এই শপথ নিয়ে অমরেন্দ্রর আবার হাল লাঙল—খাসে ধান চাষের পত্তন। এই হালুটিই একদিন ছিল দূরে দক্ষিণের বিলে। অমরেন্দ্র নিজে বলেছেন, "ভাঙার ভিতরই গড়ার আস্বাদ পেলাম খাসে চাষ জুড়ে। অংকুরে বীজধানে প্রাণের স্পন্দন। আমি নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম নতুন সৃষ্টিতে। দায়িত্ববোধের একটা মাদকতা আছে। এতগুলো মুখে জোগাতে হবে দানা—এমন একটা পরিবারের দূর করতে হবে হতাশা। আমি ঝড় তুফান রৌদ্রের মধ্যে যেন নেশায় মশগুল হয়ে খাটতে লাগলাম। ভাঙা স্বাস্থ্য ও জোড়াতালি দিয়ে

চলল বেশ। দামী ডাক্তারী ওষুধ বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিলাম। এবার টুকটাক কবিরাজী নয়ত মুষ্টিযোগ। তারপর শ্রেফ খাই—সোডার ওপর নির্ভর। মাসে পাঁচ পো সোডা খেতাম আমি।"১

কিন্তু আরো ভাঙল গ্রাম-জীবন—আরো ভাঙল জীবিকার মাপকাঠি, মধ্য স্বত্বে তো ধরেছে বিশ্বগ্রাসী ফাটল। ষাটটা ঝুনো নারকেল একটাকা—চোদ্দ আনা এক মন ধান। তাও নিত্য খদ্দের নেই। অমরেন্দ্র কতদিন যে হাট থেকে নারকেল সুপারি ধান চাল বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগের মরশুম। মাপের ডালার ওপর চার পাঁচ সের ফালতু নিয়ে গেছে। কিন্তু মামলা মোকর্দমা যৌথ পারিবারিক দায়িত্ব যে ঘরে, সেখানে ব্যয় সংকোচের কোন উপায় নেই। তার ওপর ছিল পুলিশ এবং সিঁদেল চোরের ট্যাক্‌সো। এ সময় অমরেন্দ্র একদিন তাকালেন পঙ্কজিনীর দিকে। সংসার বেড়েছে হেনা, ছায়া, গীতা, বাসুদেব জন্ম নিয়েছে। পঙ্কজিনীর নিরাভরণ রূপ তাঁকে পীড়িত করল। কোথায় গেল দেড়শ ভরি সোনা? প্রথমটা অমরেন্দ্র খুব হাঁক-ডাক করেছিলেন। পরে চিন্তা করে বুঝলেন, মোটেই অন্যায় করেনি পঙ্কজিনী। প্রথম দিয়েছেন জানকীকুমারকে, তারপর দৈনন্দিন নিষ্ঠুর চাহিদাকে।

আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। অমরেন্দ্রর জীবন আবার কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ঠিক যেন ধ্বস নামার আগের অবস্থা। আরম্ভ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের বাজারে সকলেই ব্যস্ত কিছু পুঁজি করার, আখের গড়ার কাজে। কিন্তু অসুস্থ অমরেন্দ্র হাটে বন্দরে, বেনের দোকানে পাগল হয়ে খুঁজতে লাগলেন খাই সোডা। সংসারের জন্য, অতগুলো প্রাণীর জন্য তাঁর বাঁচাটা তখন বোধহয় অত্যন্ত জরুরী। তাই পাগলের মত ঘুরে অতি কষ্টে তিনি প্রায় আধমন সোডি-বাই-কার্ব জোগাড় করেছিলেন সেই অজপাড়াগ্রামে বসে। প্রচণ্ড পরিশ্রমে বছর দুই বাদে প্রচুর ধান পেলেন নিজে চাষ করে। কিন্তু টলমল করে উঠলেন গৃহলক্ষ্মী। পড়ন্ত বেলার সূচনাতেই শিবসুন্দরী মারা গেলেন। শিবসুন্দরীর মৃত্যুর সংগে সংগেই জানকীকুমার একেবারে ক্ষেপে গেলেন। জানকীকুমারের এ সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে অমরেন্দ্র লিখেছেন, "মামলা আর মামলা। কম করে হাজার ভরি সোনা ছিল মার গায়ে। বেশির ভাগই গেল উকিল মোক্তার পুলিশের পেটে, বাকিটা নিল চোর ডাকাতে। শত্রুরা ঘরে আগুন দিলে দুবার এ সব বর্ণনা করলে মহাভারত হয়ে দাঁড়ায় পর্বে পর্বে। তবে মহাভারতে উই পোকার এমন কীর্তি নেই। কী সাংঘাতিক যে ঐ ক্ষুদ্র তুচ্ছ পূর্ববাঙলার শত্রুগুলো।"২

জানকীকুমারের চাকুরী যাওয়া, শিবসুন্দরীর মৃত্যু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপাদাপি, তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পদধ্বনি—যৌথ পরিবারের দায়িত্ব

অমরেন্দ্রর কাঁধে তখম পাহাড়ের মত চেপে বসেছে। সাত পাঁয়ের মানুষ কানা-কানি সুরু করে দিয়েছে, ঘোষ বংশ ছন্ন ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সংসারের মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ডুবছে, জানকী কুমার তবু হাল ছাড়েন নি। অমরেন্দ্র হলেন তাঁর যোগ্য সহকারী। কর্তব্যের ডাকে প্রাণান্ত হলেও—মুখ বুজে এগিয়ে যেতে হত। একটা বিরাট পরিবার—যার নিত্য পাত—পিঁড়ি পড়ে অতিথি অভ্যাগত ছাড়াও বেলায় একশ—সোয়াশ জনার—তা এখন অনিবার্য ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। আর্থিক ভাঙনের সংগে সংগে আসে মানুষের চারিত্রিক ভাঙন। পরিবার ভাঙলে গ্রাম ভাঙে। গ্রামের পরই শহর। তারপর সমগ্র দেশ—জাতির ইতিবৃত্ত ধীরে ধীরে কলঙ্কিত হয়। এই ভাঙনের মধ্যেই অমরেন্দ্র 'দক্ষিণের বিল' এর উপাদান পেয়েছেন। কলঙ্কের ভিতর কল্যাণ। কিন্তু সে সঞ্চয় তো সাহিত্যের জন্য নয়। জীবন এবং জীবিকার তাড়নায় তা এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

শিব সুন্দরীর মৃত্যুর পর অমরেন্দ্র খুব ভেঙে পড়লেন। কেন না তিনি জানতেন, জানকী কুমার বিষয় সম্পত্তি করলেও আসল বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল মায়ের। এ সময় অমরেন্দ্র শক্ত হাতে হাল না ধরলে সামনেই সমূহ বিপর্যয়। তাই তাঁর পরিশ্রমে এতটুক কার্পণ্য নেই। এই অবস্থার মধ্যেই তাঁকে শ্রাদ্ধ-শান্তি, পূজা-পার্বণ বজায় রাখতে হচ্ছে। দুটি বোনকে স্মান ঘরে বিয়ে দিতে হল। তেমনি ছোটভাই নারায়ণ ও জনার্দনকে চাকরি ব্যবসা বিয়ে দিয়ে ভাঙা জাহাজ থেকে কূলে তুলে দিতে হল। অমরেন্দ্র ভেসে চলেন অন্ধকারে খোলা সংসার সমুদ্রে। এতদিনের যৌথ পরিবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। যে যার সুবিধা মত পাড়ি জমাল লাইফ বোটে, সম্ভব মত স্বার্থ নিংড়ে নিয়ে। এল তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এ সময় বাঙালী মধ্য বিত্ত জীবনে দেখা দিল অবনতি। এই মধ্য বিত্ত জীবনের আশংকা ও বিলাপ এক আধুনিক কবির একটি কবিতায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। ৩

দুই

তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর গত হয়েছে। এখনো একটু দূরে দূরে নদীর চরে দেখা যায় মানুষের কংকাল। বরিশাল জেলার উদ্বৃত্ত ফসলের খণ্ডগুলোকে বাদ দিয়ে এখনো শোনা যায় বিলাপ। মিথ্যাচার, ফাটকাবাজি ও কালো-কারবারীতে ছেয়ে গেছে, গ্রাম-গঞ্জ। নেতাদের অলীক প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষকে হতাশ করেছে। সৎ মহৎ যা কিছু শুভ তা যেন কে রাতারাতি

প্রত্যাহার করে নিয়েছে দুনিয়া থেকে। মানবের বৈজ্ঞানিক তপস্যা দখল করেছে দানব।

অমরেন্দ্র যখন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে পারিবারিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ভাঙনের সংগে লড়াই করতে ব্যস্ত, ঠিক সে সময় আকস্মিক ভাবে তাঁর তিনটি বোন অকালে চলে গেল। এই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হল ইন্দ্রপতন। জানকী কুমার পরলোক গমন করলেন। বাবার মৃত্যু, শোক সামলাতে না সামলাতেই সর্বনাশা কাল-বৈশাখীর ঝড়। কয়েক মুহূর্তের ধাক্কায় ভেঙে পড়ল তিনতলা টিনের বসত ঘর, সুমুখের টিনের প্রকান্ড নাট-মন্দির ও লম্বা চওড়া মন্ডপ। ভূমিসাৎ হয়ে গেল সব। গোটা পঁচিশ গরু বাছুর আশ্রয় নিয়েছিল নাটমন্দিরে ঝড়ের সূচনা দেখে। একটিও মরল না কিংবা আঘাত পেল না এতটুকু। অমরেন্দ্রও সপরিবারে বেঁচে গেলেন বসত ঘরের চাপার ফাঁকে ফাঁকে। তবু এই অবস্থায় অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে পারলেন না তিনি। আগুনে পোড়া ঝড়ে ভাঙা টিন এবং লোহা কাঠের খুঁটি কিনে ঘর তুলেছিলেন শক্ত পোক্ত।

মাঝে মাঝে বাস্তবের নিষ্ঠুরতায় অমরেন্দ্রর শ্বাসরোধ হয়ে আসত। মাথার ওপর তিনটে দেওয়ানি, পাঁচটি ছোট বড় ফৌজদারি। হাজার টাকার মালক্রোকী পরওয়ানা। যখন তখন টেনে নিয়ে যেতে পারে যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি। নিলাম তুলতে পারে ঘর-দোর জমি-জায়গা। হয়ত থানার দারোগা চালান দিতে পারে মিথ্যা খুনের দায়ে, এ সময় অমরেন্দ্রর দাবদগ্ধ মন চাইত এক খন্ড জলো মেঘ। তাই হয়তো ধেণুর্বৎসপ্রযুক্তা বাছুরটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতেন মার কাছ থেকে। অমরেন্দ্রর কবিমন কবিতার মাধুর্য পেতেন গোবৎসের শান্ত চাউনিতে। কাব্যের আস্বাদ পেতেন লাল পলাশের নেশায় গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ ফুলে-নদীর গাড় পর্যন্ত একাই হাঁটতেন।

আবার ঝড় এলো—ভোলায় যেবার শেষবারের মত বন্যা এল। ভেঙে উপড়ে নিয়ে গেল হাজার হাজার সুপারি নারকেল গাছ, মানুষের পাকা পোক্ত বসতি। লন্ডভন্ড হাট বন্দর। ঝেঁটিয়ে ধুয়ে নিয়ে গেল মানুষ জন্তুর প্রাণ। উড়িয়ে নিয়ে গেল আবার অমরেন্দ্রদের বসত ঘরের টিন। আবার ঘর বাঁধলেন অমরেন্দ্র। টুটা ফুটা মধ্য স্বত্ব কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগলেন। পরু-মোষ ঘরে চাষবাস ইতিমধ্যেই শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। অমরেন্দ্র ধার-কর্জ করে দক্ষিণের বিলে ফসলের আশায় পাড়ি দিলেন। ফসলও পেলেন প্রচুর। কিন্তু আবার ফৌজদারী এবং মালক্রোকী ধাক্কা। একা অমরেন্দ্রর পক্ষে কত আর সামাল দেওয়া যায়! তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় শুক্তাগড় গ্রামে বসে গোলা কেটে ধান দিয়েছিলেন অমরেন্দ্র। প্রত্যেকের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন, যখন শস্য উঠবে তারা ষোল আনা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, কাল বৈশাখীর ঝড়, বন্যা ও ফৌজদারী মামলায় ক্ষত বিক্ষত অমরেন্দ্র বোধহয় জীবন যুদ্ধে হার মানতে রাজী নন। স্ত্রী পঙ্কজিনী, কন্যা-হেনা, ছায়া গীতা ও পুত্র বাসুদেব যেন তাঁর অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। ভেঙে পড়ার মুখে স্ত্রী পঙ্কজিনী যখন অনুপ্রেরণা জোগান, অমরেন্দ্র তখন পুত্রকন্যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অফুরন্ত উৎসাহে ভরপুর হয়ে ওঠেন। কি যেন এক দৈবশক্তি তখন তাঁকে ভর করে। তা না হলে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ও তিনি সংগ্রাম করেন কি ভাবে? অমরেন্দ্রর নিজের ভাষায়, "ছুটে বেড়িয়েছি ঢপ কীর্তনের দলের সঙ্গে। সন্ধ্যার নদীতে শুনেছি খাঁটি ভাটিয়ালি গান। ফৌজদারী মামলায় তারিখ নিয়ে জারী-কবির পালা শুনতে যেতাম। কখনো বা বন্দার দলকে বায়না করে নিজের নাটমন্দিরে আসর বসাতাম। এক ফরাসে ছোটবড় সব মানুষ—এক আসনে সব ঠাঁই। আভিজাত্যের তকমা ছিঁড়ে এক হুঁকাই চালিয়ে দিতাম।"৪

আবার অমরেন্দ্রর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের দল আনা গোনা সুরু করল। বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার অন্তর্গত শুক্তাগড় গ্রাম একটি অজপল্ড গ্রাম। তবুও সাত হাত ঘুরে শহর বন্দর থেকে আসতে লাগল দুখানা খবরের কাগজ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া হত প্রতিটি অক্ষর। আলোচনা হত তারও বেশী। কি সদম্ভ চীৎকার খবরের কাগজের পাতাগুলোর। পাকিস্তান নাকি আকাশকুসুম কল্পনা। এ হয় না, হতে পারে না, অতএব মাভৈ, পূর্ববাঙলার হিন্দু অধিবাসী। মুসলিম প্রধান এ অঞ্চলের গ্রাম্য রাজনীতি দেখে অমরেন্দ্র অনেক আগেই বুঝেছিলেন—পার্টিশান রোকা যাবে না, পাকিস্তানও কায়েম হবে নির্ঘাত। খবরের কাগজের বিভ্রান্তিকর উক্তি শুভ নয়। মাটির মত সহজাত সরল মনগুলোতে কলুষিত করা হচ্ছে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে। এ সময়ের অবস্থার অমরেন্দ্র নিজেই সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। "বুঝলাম যত স্থায়ীই হক এবার ডেরা তুলতে হবে। যত কালের ভিটাই হক—যত চিহ্ন থাক পূর্বপুরুষের, এবার খুলতে হবে বাঁধন ছাদন। আমরা বলি হব বহু ঈপ্সিত এ স্বাধীনতার। সাত পুরুষের ভদ্রাসন। ছাড়তে চাইলেই ছাড়া যায় না। প্রশ্ন আসে জীবিকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় আশ্রিত আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধুগন। প্রশ্ন করে গাছপালা। প্রশ্ন তোলে নদী জল বায়ু। এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষ নেই।"৫

উনিশ শ ছেচল্লিশে কলকাতার সাম্প্রদায়িক বিষ তখন নোয়াখালি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশে যেমন ইথার, পূর্ববাঙলায় তেমনি জল। সেই জলপথ ধরে সংবাদ আসতে লাগল প্রতিদিন, আজ নারী ধর্ষণ হয়েছে। কাল আগুন দিয়েছে অমুক বন্দরে। শুক্তাগড়ের অবস্থাও খুব উদ্বেগজনক। রায়ট রায়ট আসছে। উৎখাত হচ্ছে এবং হয়ে যাবে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়। কতিপয় বুদ্ধিজীবি মোল্লা মৌলানা বিষম বিষ চাল চেলেছে রাজনৈতিক দাবার। আশে পাশের শান্ত নিরীহ মুসলমান ভাইরা এ ঘটনায় বিস্ময়ে

হতবাক। অমরেন্দ্র বাড়িতে বিষ সংগ্রহ করে রেখেছেন। আত্মরক্ষা করতে না পারলে সপরিবারে বিষপানে আত্মাহুতি দেবেন।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে অমরেন্দ্র যখন ভাবছেন, বসত বাড়িটি বিক্রী করে কলকাতা চলে যাবেন। কেন না এ ছাড়া আর টাকা পয়সা জোগাড় করার উপায় নেই। মধ্য স্বত্ব আগেই অনেকখানি নীলাম হয়ে গেছে। আর খাসের জমি তো ভোগ করা ছাড়া বিক্রী করার কোন পথ জানকী কুমার রেখে যান নি। এমনি সময়ে অমরেন্দ্রর এক খুড়তুতো ভাই এসে উপস্থিত। দেখতে অনেকটা কাপালিকের মত। মাথায় ঝাঁকড়া রক্ততিলক। চোখে রক্তাভ দৃষ্টি। দক্ষিণে মামার বাড়িতে থাকত। সংগে দুটি উলঙ্গ ছেলে এবং প্রায় বিবস্ত্রা স্ত্রী। দক্ষিণে নাকি আর মান মর্যাদা নিয়ে থাকা যাবে না। তাই অমরেন্দ্রর আশ্রয় প্রার্থী। অবশেষে অমরেন্দ্র বসত বাড়ির এক ভাগ ভাইকে ছেড়ে দিয়ে বাকী তিন ভাগ বিক্রীর বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। খদ্দের আসছে অনেক চেষ্টা যত্নে, কিন্তু ভাঙানী দিচ্ছে অমরেন্দ্রর কাপালিক ভাই। অমরেন্দ্র এবার বিপাকে পড়লেন। যাকে আশ্রয় দিলেন, সেই এখন তাঁকে পথে বসাতে চাইছে। এমন কি খুন করার হুমকি দিচ্ছে। অবশেষে নিজের ঘর ছেড়ে অমরেন্দ্রর পরিবারকেই এক জ্ঞাতির ঘরে আশ্রয় নিতে হল। জ্ঞাতির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে পঙ্কজিনীর সংগ্রহ দেখে অমরেন্দ্র অভিভূত হয়ে গেলেন। কীটপতঙ্গে ঝড়ে আগুনে মামলায় হয়েছে অমরেন্দ্রর অনেক মূল্যবান সামগ্রী—চোর ডাকাতে আত্মসাৎ করেছে বহু জিনিস, শুধু একটি জিনিস পনের বছর বয়স থেকে যক্ষের ধনের মত আগলে রেখেছিলেন পঙ্কজিনী তা হোল-কল্লোল যুগের ছাপা লেখা এবং দেওঘরে থাকা কালীন বন্ধু নন্দলাল রায়ের বোন রাণীর হাতের লেখা, কিছু গল্প কবিতার পান্ডুলিপি। নির্বাসিত সাহিত্য জীবনের ছবিটা অমরেন্দ্রর চোখের সামনে ভেসে উঠল। "পঙ্কজিনীর কাছে একখানা আয়না থাকতো। সহজেই তাতে ধরা পড়ত আমার মনের ছবি। তিনি বললেন, তুমি আবার লেখো, নইলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে এ ভাবে ভাবলে।"

"বলো কি? আমি আবার লিখব? বলতে গেলে অনেক সময় নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে সন্দেহ জাগে:

তাতে হয়েছে কী: চর্চা করলে আবার বানান শুদ্ধ হবে। লিখতে লিখতে এসে যাবে লেখা। একদিন তো তুমি ভালই লিখতে।"৬

পঙ্কজিণীর প্রেরণায় এই ঝঞ্ঝা বাত্যার মধ্যে ও অমরেন্দ্র মাঝে মাঝে লিখতেন। 'দক্ষিণের বিল' নিয়ে কিছু লিখেছিলেন। এই 'দক্ষিণের বিল' শুনতে শুনতে একদিন তার কাপালিক ভাইয়ের কী যে পরিবর্তন হল, সে আর প্রতিবন্ধক হয় না বাড়ির জন্য খদ্দের এলে। কিন্তু দাঙ্গার ডামাডোল যত বাড়তে থাকে ততই দাম কমে ঘরের অংশটার। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি বেচে অমরেন্দ্র পেলেন মাত্র চারশ টাকা। "পাড়া প্রতিবেশীরা

বললে, এ কি করলে ?...আমি বললাম, এখানে আর বাস করা যাবে না।... কেন ?... পাকিস্তান হচ্ছে।...একটি লোকও আমার কথা বিশ্বাস করলে না। ছোট বড় প্রায় সকলের অভিশাপ নিয়ে আমি সপরিবারে বাপদাদার ভদ্রাসন ছাড়লাম চিরকালের মত। আজ আমাদের গ্রামটা একেবারেই ছাড়া, কিন্তু সেদিন যাবতীয় অভিসম্পাতের ভাগী হয়েছিলাম একা।"৭

তখনো পার্টিশান হয়নি। উনিশ শ সাতচল্লিশের জুন মাসে অমরেন্দ্র সপরিবারে বরিশাল টাউনে মেজোভাই নারায়ণের বাড়ি এসে উঠলেন। সঙ্গে সম্বল বলতে বসত বাড়ি বিক্রীর চারশটি টাকা। বাধ্য হয়ে স্বামী স্ত্রীতে ভাইয়ের সংসারের দাসত্ব বরণ করলেন। তবুও সময় মত জোটে না ছেলে মেয়েদের সামান্য দুটি খাদ্য। স্বাধীনতা হীনতা যে কী জিনিষ তা এই প্রথম টের পেলেন অমরেন্দ্র। এই সময়টা তাঁর সাহিত্য জীবন নয়, দুর্বিষহ অপমান ও লাঞ্ছনার কাল।

অবশেষে সারাদিন রাত এক দোকান সামলানোর কর্মচারীর চাকরী নিলেন সকাল পাঁচটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত বেচাকেনা। কোনোদিন ছেলেমেয়ে স্ত্রীর সংগে দেখা হয়, কোনদিন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই দোকানও অমরেন্দ্রর হাতে প্রতিষ্ঠিত, অথচ শরিক হয়েও এখন গ্রহ দোষে তিনিই করুণার পাত্র। ভয় আছে সামান্য ত্রুটিতে জবাবদিহি করার। তাই মাথা নুইয়েই অমরেন্দ্রকে খাটতে হচ্ছে। সেই সংগে রাত জেগে আবার নতুন করে 'দক্ষিণের বিল' ঢেলে সাজিয়ে লিখে চলেছেন অমরেন্দ্র। তিনি বুঝতে পারলেন কাহিনীর সংগে ভাষার সংগতি হচ্ছে। এইভাবেই তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে 'দক্ষিণের বিল' লেখা শেষ করলেন। তারপর একদিন ব্রজমোহন কলেজের বাংলার অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরীকে গিয়ে বললেন— তাঁর 'দক্ষিণের বিল' এর কথা। অমরেন্দ্র শোনাতে চান তাঁকে।

অধ্যাপক চৌধুরীর কৌতূহল হল। তিনি আরো কয়েকজনকে সংগে নিয়ে এলেন দোকানে। সংগে আর যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে শামসুদ্দিন আবুল কালাম, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার কিরণময় রাহা। অমরেন্দ্রর নিজের ভাষায়,' প্যাকিং বাক্স, পুরাণ কাগজ, নস্যর ভাঙা ফাইল সরিয়ে এঁদের দোকানের একটা গুদাম খোপে বসতে দিলাম। আরশোলা এবং দু একটা ইঁদুর বিরক্ত হয়ে গেলো ছুটে।

......"এইখানেই কি আপনি থাকেন ? ...বললাম, হ্যাঁ।...একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে পান্ডুলিপি খুলে পড়তে বসলাম। প্রায় তিন ফর্মা পড়ে গেলাম একটানা। এঁরা কেউ ওঠার নাম করলেন না, সকলের কৌতুহল যেন বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। সামসুদ্দিন আবুল বললে, বাঙলা সাহিত্যে এ লেখার স্বীকৃতি অনিবার্য। ...শ্রীযুক্ত রাহা বললেন, আপনি তারাশঙ্করকে চেনেন ? আমি বললাম, না। ...সে কি ! তিনি এখন স্বনামধন্য।

মানিককে চেনেন ? ...আমি আবার বললাম, না। ...অধ্যাপক বললেন, অনেক বিদেশী নামজাদা লেখকদের তুলনায় আপনার লেখা বর্ণনায় অভিজ্ঞতায় জীবন্ত। ..... আরো কদিন এঁরা এলেন পরিচয় আরো একটু নিবিড় হল। সহানুভূতি আরো একটু দানা বাঁধল। ...নতুন করে এঁরা যেন দায়িত্ব নিতে চাইলেন আমার অদৃষ্ট গড়ার। ছিলাম লাঞ্ছনার শিকলে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িত—এমন অযাচিত সহানুভূতি আমাকে যেন উদ্বেল করে তুলল। তবু সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি যে আমার জীবনের বড় একটা বাঁক ঘুরছে। সৃষ্টি করছে নব দিগন্তের নিশানা।"৮

১৯৪৭ বাঙলা ও পাঞ্জাবে ঐতিহাসিক ভাঙন,—সামনে সাহিত্যের কোনো স্বপ্ন নেই, তবুও 'নবদিগন্তের নিশানা'র সন্ধানে অমরেন্দ্র সপরিবারে ভাসতে ভাসতে আবার উনিশ শ সাত চল্লিশের ৩০শে জুলাই কলকাতায় এলেন। কোথায় দাঁড়াবেন, কী করে খাবেন—তাও জানেন না। তবু এলেন, লক্ষ্য সাহিত্যে পুণরাবির্ভাবকে বাস্তবায়িত করা। এক আত্মীয়ের বাড়ির রান্নাঘরে পনের দিন কাটিয়ে পনেরই আগস্ট স্বাধীনতার দিন সকালে পনের টাকা ভাড়ায় টালিগঞ্জের ৩৮নং প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোডের ছোট একটি খোপের কোঠায় এসে উঠলেন।

।। পাদ টীকা ।।

১. জবানবন্দী পৃষ্ঠা-১৯৫

২. ঐ ১৯৭—১৯৮

৩. " তোমার পাখি এসে ডাকে
আমার বাগানে,
সূর্য ওঠে, হলুদ আলো সবুজ ধানে,—
কিন্তু দুদিন এলো, এ কী দুদিন এলো।
মেঘে মেঘে অন্ধকার, ঝড় বৃষ্টি, বিদ্যুৎ হুঙ্কার,
এ কী আকাল,
ভয়াল ভবিতব্য তায় ঘোর আকাশের
শান্ত গোধূলিতে
ভয়ংকর মন্দিরে দিগম্বরী কালী,
শবাসনে তান্ত্রিকেরা স্তব্ধ,
দিনের ভাগাড়ে নামে রাত্রের শকুন।
নষ্টনীড় পাখি কাঁদে আমাদের গ্রামে
রক্তমাথা হাড় দেখি সাজানো বাগানে।"

(সমর সেন। তিন পুরুষ)

৪. জবানবন্দী, পৃষ্ঠা-১৯৯
৫. ঐ ২০৪
৬. ঐ ২০৭
৭. ঐ ২১৯
৮. ঐ ২২০-২২১

দেশ বিভাগ ও সাহিত্যে পুণরাবির্ভাব

এক

অবশেষে ভারতবাসীর বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এল এবং এই স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার বলেছেন, "খ্রীঃ ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট ভারতবর্ষে যুগান্তরের সূচনা হইল। সেদিন ভাবতবর্ষ বিভক্ত হয়, বাঙলাদেশ ও পাঞ্জাব বিশেষ করিয়া দ্বি-খণ্ডিত হইয়া গেল। বাঙালীর সংস্কৃতি যে তাহাতে অনিবার্য সংকটের মধ্যে গিয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে না পারার কারণ ছিল না। সেদিন বাঙালী ভারতরাষ্ট্রে মাত্র একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় পরিণত।"১ ভারতবাসীর এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী বললেন, 'Journey's End,"২ শ্রীযুক্ত হালদার আবার অন্যত্র বলেছেন, "১৯৪৭ এর পরিবর্তনটা মূলত বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়—প্রথমত ও প্রধানত উহা ছিল রাজনৈতিক। অবশ্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত না, এবং তাহা থাকেও নাই। সম্পূর্ণ না হউক, সে রাজনৈতিক পরিবর্তন অংশত ভারতীয় জনগণের বিপুল ও সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক প্রয়াসেরই পরিণতি, এবং সম্পূর্ণ না হউক, সেই পরিবর্তনে ভারতীয় সামাজিক শক্তিরও আংশিক প্রতিষ্ঠা-লাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে ১৯৪৭-এর পনেরই আগষ্ট সামাজিক শক্তির যে সম্পূর্ণ জয় লাভ ঘটে নাই, তাহাও ঠিক। সমাগত বিপ্লবকে অসম্পূর্ণ রাখিবার প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পনেরই আগষ্টের ব্যবস্থা অতি দ্রুত প্রণয়ণ করিয়া ফেলে। সাম্রাজ্যবাদের চরম সর্বনাশের মুখে যতটা সম্ভব নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা ছিল তাহাদের তখন মূল লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক বিত্তবান নেতৃশ্রেনীর অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করা সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নীতি, এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থের দিক হইতে ১৯৪৭-এর ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রধান কূটনীতি।"৩ এই স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং প্রাপ্তির আর একটি নীট লাভ হয়েছিল তা হল,

"There is no question that the popular forces are advancing in India. The forces of the working class and of the peasantry are advancing, through struggle, to consciousness of strength, to a great creative work and to a happier future."8

দেশ বিভাগ সম্পূর্ণ হবার সংগে সংগেই অমরেন্দ্র ঘোষের কঠোর জীবন সংগ্রামের দ্বীতীয় অধ্যায়ের অভিষেক হল পনের টাকা ভাড়ায় টালিগঞ্জের ৩৮ নং প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোডে পায়রার খোপের মত ছোট্ট একটি কোঠায়। ছোট্ট খোপের মত কোঠা, তবে দক্ষিণ খোলা, সুমুখে কাঠা দশেক উঠান। অমরেন্দ্র লিখেছেন, "অনেকদিন বাদে স্বাধীনভাবে হাত পা ছড়িয়ে ঘরে এবং বারান্দায় শুয়ে পড়লাম সবাই। কি খেলাম মনে নেই, ঘুমিয়ে নিলাম খুব। বারান্দা সমেত হাত আষ্টেক লম্বা, হাত সাতেক চওড়া অ্যাসবেস্টার ছাউনির জন্য সেলামী দিয়েছি পঁচাত্তর টাকা। কল পায়খানা থাকলেও, রান্নাঘর নেই। কোনো অসুবিধাকে বড় করে না দেখে ওর মধ্যেই স্ত্রী তোলা উনান কিনে ভাত চড়িয়ে দিলেন বারান্দায়। আমাকে দোরগড়ায় হাত দেড়েক চওড়া জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি লেখো। ছেলেমেয়েদের বললেন, চুপ। এইভাবে নতুন সংসার সুরু হল। যা গেছে তার জন্য দুঃখ না করে যা পেয়েছি তাই নিয়ে আবার যাত্রা সুরু। এবার স্ত্রী ক্যাপটেন, আট বছরের ছেলে বাসুদেব সহকারী—আমি শুধু শ্রম দিয়ে যাবো।"৫

কলকাতার নতুন জীবনে দারিদ্রের সংগ্রামের সংগে যুক্ত হল সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে জীবনসংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল অস্তিত্ব রক্ষা। এবারের লক্ষ্য হল অস্তিত্ব রক্ষার সংগে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা। এখান থেকেই তাঁর সাহিত্যে পুণরাবির্ভাব কাল নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এবারের এই সংগ্রামে রসদ বলতে দেশত্যাগের সময় বসত বাড়ি বিক্রীর চারশ টাকা। ঐ টাকা কটি সম্বল করে স্ত্রী পঙ্কজিনী সংসারের চাকা ঘুরাতে গিয়ে দেখেন, "তাঁর হাতে অবশিষ্ট জমা আছে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা।"৬ অমরেন্দ্রর পরিবারে তখন পাঁচজন, রিফিউজিরও অতিথ অভ্যাগত আছে দু একজন। দিনের শেষে স্ত্রী পঙ্কজিনীর সংগে বসে অনেক আলোচনা ও পরামর্শ করলেন অমরেন্দ্র। সামনে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার ছাড়া যেন তার কিছুই চোখে পড়ে না। আর অমরেন্দ্র? তিনি সেই দিগন্ত বিস্তৃত গাঢ় নিঃসীম অন্ধকারের বুক চিরে দেখতে পান, দেশত্যাগের সময় তাঁর সাহিত্য জীবনে যে 'নব দিগন্তের নিশানা' দেখেছিলেন, সেই নিশানা তাঁর খুব কাছে এগিয়ে আসছে। তবু প্রাত্যহিক জীবনের সেই কঠিন কঠোর দারিদ্রকে অস্বীকার করতে পারেন না সদ্য দেশত্যাগী অমরেন্দ্র।

অমরেন্দ্রর নিজের লেখার মধ্যেই এ সময়ের সুন্দর অথচ বাস্তব সম্মত চিত্র ফুটে উঠেছে। "দীর্ঘদিনর কথা না ভেবে, আমরা অল্পদিনের কথা স্থির করে নিলাম। মাসের কথা না ভেবে, পক্ষের। এবার সাম্য বাদকে জীবনবাদে প্রয়োগ করলাম। যেন লড়াইয়ে নেমেছি। ব্যক্তি এখানে বড় নয়, বড় হচ্ছে সংসার। ছোট বড় সকলের শ্রম অর্থ প্রতিভা দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখা চাই। আমি লেখার গতি বাড়িয়ে দিলাম স্থিতধী হয়ে। আমরা

স্থির করে নিলাম যে আমাকে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি একটা কিছু হবে, অন্য কাউকে দিয়ে সে আশা নেই।…হাতের টাকা দিন দিন ফুরিয়ে আসছে, তবু একটা প্রশান্তির দুর্গপ্রাচীর গড়ে নিয়েছি। এমনি দুর্গপ্রাকারে নিজেকে সুরক্ষিত করে চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছি। সম্পৃক্ত অথচ বিমুক্ত এই আপাত বিরোধেরও সমবায় সাধন করতে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। এটা বাস্তবের তিক্ততাকে অস্বীকার করা নয়, বরং বলব তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় মাত্র।"৭

দেশ বিভাগের ঠিক অব্যবহিত পরেই এ বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রটা তুলে ধরতে পারলে, দেশ বিভাগোত্তর কালে অমরেন্দ্রর জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্যে পুণরাবির্ভাবের পটভূমি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা জন্মাতে সাহায্য করবে। এই পর্ব হল, "মধ্যবিত্ত কেলাস ভাঙার ইতিহাস। এ ভেঙে রেণুতে রেণুতে ছড়িয়ে গেছে। অথচ নতুন কোন কিছু গড়ে ওঠে নি। এই খানেই শোকান্তিকা এসেছে। মাঝে মাঝে প্রলেটারিয় স্তরের কথা উঠেছে বটে, তবে এ তেমন কোন পাকা আসন তৈরী করতে পারেনি। গণআন্দোলনের পথ কাটা হচ্ছে। কিন্তু এখনো নীহারিকায় ভাসমান। এরি কথার বুদ্বুদে সমাজ তন্ত্রের মানস ভিত তৈরী হচ্ছে। হয়তো পঞ্চাশোত্তর সাধনা এ পথে মোড় ফেরাবে। আজ সে আশায় দেশ স্পন্দমান?"৮ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল আবার—" (১) জমি-বিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার ছোট খাট চাকুরী বা ব্যবসাজীবী এবং (২) কিঞ্চিত জমা-জমি আছে এমনিতরো। বাঙালী মধ্যবিত্ত এমন কি ঊনবিংশ শতকেও জমিবিহীন ছিল না। জনসংখ্যা যতই বেড়ে চললো ততই জীবিকার একান্ত নির্ভরশীল জমি-জমার বণ্টন হয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে লাগলো।"৯ অমরেন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত। কিন্তু "মধ্যবিত্ত কথাটা ক্রমশ শ্রেণীচ্যুত (Declassed) হয়ে এমন একটা স্তরে এসে গেল যেখানে বাঙালী সমাজে রয়ে গেল বিশেষ করেই দুটা সমাজ: ধনী ও নির্ধন (Haves and Havenots)।"১০ দেশ বিভাগের পরে কলকাতায় অমরেন্দ্রর শ্রেণী দাঁড়াল 'নির্ধন' (Have nots)। এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হল—ইংরেজের দুশো বছরের রাজত্বে ভারতবর্ষে ছোটবড় বাইশটি দুর্ভিক্ষ হয়েছে। তার মধ্যে অমরেন্দ্র যে বাংলার মাটিতে জন্মেছেন, সেই বাংলাতেই হয়েছে সাতটি—১৭৭০, ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩—৭৪, ১৮৯২, ১৮৯৭ এবং সর্বশেষ ১৯৪৩।"১১ সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ ই-পূর্ববাংলার মাটিতে অমরেন্দ্রকে নিঃস্ব, দরিদ্র ও নির্ধন শ্রেণীতে পরিণত করেছিল। সুতরাং কলকাতার নিঃসহায়, নিসম্বল জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না।

কেমন করে অমরেন্দ্র সাহিত্যে নিজের পুণরাবির্ভাবকে পাঠকের সামনে

হাজির করলেন, তার নিজের জবানবন্দিতেই তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। "যুদ্ধোত্তর যুগে আমি এলাম। কি বলব, হয়ত ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, নয়ত কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তির টানে কেন আমিই আমার প্রশ্নের জবাব হয়ে এলাম ? সভ্যতা ভাঙে অসম বণ্টনে, মনের, অর্থের অথবা ভূমি ব্যবস্থার। তুমি আমার যে কোন উপন্যাস অথবা ছোটগল্প খোলো এর নজির পাবে। আমি সার্বিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করেছি। যে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ গৌণ ছিল সাহিত্যে, তাদের রক্ত মাংসে মনমে মুখ্য করতে ঘাম ঝরিয়েছি। আমি শিশির ভাদুড়ীর মত পরচুলা লাগিয়ে বাঙলা ভাষায় আলমগীরের পাঠ বলে হাততালি নেইনি। আমি জীবন্ত আলমগীরকেই আনতে চেষ্টা করেছি, নয়ত মারাঠার জয়তু শিবাজী।···আমার লেখায় আমার কালের মানুষই কুশীলব। বেদে-বেদেনীর কথা, হিন্দী, ফার্সি, উর্দু, নেপালী, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, শিখতে হয়েছে অনেক রকম। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ জীবনবোধও অধ্যয়ন করতে হয়েছে প্রচুর। আমি পরচুলা নই, আসল দাড়ি গোঁফ। আমি বর্তমানের ইতিবৃত্ত। কিন্তু আমাতে রয়েছে বিগত অনাগত। আমি বহু ঈপ্সিত জীবনের স্বাদ। কিন্তু কালের বড় সকালে এসে পৌঁচেছি এদেশে।''১২

আসলে ১৯২০-২৯ এর অসহযোগ, ১৯৩০-৪১ এর পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন, ১৯৩৯-১৯৪৫ এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলন, ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন দেশ বিভাগের প্রস্তুতি পর্বও সম্পূর্ণ করে তুলেছিল, ঠিক অমরেন্দ্রর জীবন সংগ্রামে প্রবেশ ও সাহিত্য জীবনের নির্বাসনকে ত্বরান্বিত করলেও প্রকৃত পক্ষে এই সময়ই তাঁর সাহিত্য জীবনে পুণরাবির্ভাবের পথকে ধীরে ধীরে প্রস্তুতির বৃত্তে এনে দাঁড় করাচ্ছিল। এবং সে প্রস্তুতির ইতিহাসও বড় করুণ ও বিচিত্র। দেশত্যাগের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কায়ক্লেশে দুই মেয়ের বিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে অবস্থা নিঃস্ব পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে সাহিত্য চর্চা শুধু কষ্টকর নয়, দুঃসাধ্য ও বটে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল কাগজ, কলম এবং কালি সংগ্রহ করা। ঐ বস্তুগুলি তখন সবই কালো বাজারীদের হাতে চলে গেছে। অমরেন্দ্র নিজেই লিখেছেন, "ভাল দু দিস্তা কাগজ এ বাজারে দুর্লভ। এই অজগণ্ড গ্রামে খুঁজলে হয়ত ব্ল্যাকে কেনা যাবে দু-দশ টিন কেরোসিন। ছিল একটা আপার প্রাইমারী ইস্কুল তাও বন্ধ হয়েছে সাম্প্রদায়িক টানা হেঁচড়ায়। অতএব কাগজ কলম নিষ্প্রয়োজন।''১৩ তবুও অমরেন্দ্র এক দুর্নিবার আকর্ষণে লেখক হবার অদম্য বাসনা নিয়ে শুক্তাগড় থেকে এক রাত্রির পথ নযুল্লাবাদ নৌকা ভাড়া করে ছুটলেন, একটি কলম সংগ্রহের আশায়। মাঝ পথে ঝালকাঠি নেবে কলকাতায় বড় শালীর কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। "দিদি দিলেন একটা আধভাঙা ব্ল্যাকবার্ড কলম,

শালী পাঠালেন ছোট ছোট খান কয়েক রাইটিং প্যাড। সব গুছিয়ে লিখতে বসলাম। কিন্তু কি লিখব? কবিতা, গল্প না প্রবন্ধ?"১৪

আবার মানসিক যন্ত্রণা অমরেন্দ্রকে কুরে কুরে খেতে লাগল। এমন সময় একদিন এক অপরিচিত ভদ্রলোক এলেন অমরেন্দ্রর বাড়িতে। অমরেন্দ্রর প্রতিবেশী বন্ধু রমেশ ভট্টাচার্যের ভগ্নিপতি, নাম বীরেন্দ্র আচার্য। ভদ্রলোক গ্রাজুয়েট, ইস্কুল মাস্টার। তিনিই সেদিন অমরেন্দ্রর হাত দেখে বললেন, "শেষ জীবনে আপনাকে সাহিত্য করেই খেতে হবে। আপনার হস্তরেখার এই বক্তব্য।"১৫ তবু অমরেন্দ্র যেন বিষয়বস্তু ঠিক করে উঠতে পারছেন না। চিন্তার সূত্রগুলো যেন বার বার খেই হারিয়ে ফেলছে। "কিছুতেই এগুতে পারছিনে লেখা, তবু কাগজ কলম একেবারে ছেড়ে উঠতে পারছিনে, বার বার সংকল্প গ্রহণ করছি। সংগ্রাম আমাকে করতেই হবে। আমরণ এই তো আমার তপস্যা। এমনি অপস্যা করতে দেখেছি রৌদ্র দগ্ধ মাঠে কৃষাণকে, এমনি তপস্যা করতে দেখেছি গৃহকোণে স্ত্রীকে। এমনি তপস্যা করে হাঁস পায়রা ডিম ফোটায়। দশ মাস দশদিন গর্ভ ধারণ তবে তো সন্তান।" ১৬

স্ত্রী পঙ্কজিনী বললেন, মেজো মেয়ের বিয়েতে একখানি বই উপহার পেয়েছে। আমি পড়েছি, তুমি পড়ে দেখো। লেখিকা পার্ল বাক, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। "স্ত্রীলোকের লেখা হলেও আগ্রহ নিয়ে শেষ করলাম 'গুড আর্থ'। বিশ্লেষণ করে দেখলাম লেখিকার গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ। খানিক গ্রামে থেকেই শহরে এসে হাঁস ছেড়ে বেঁচেছেন। তারপর গতানুগতিক শহুরে ব্যাভিচারের দৃশ্য। শেষ করেও যেন তেমন চিন্তার খোরাকি মেলে না। চীন দেশের এই কি প্রতিনিধিমূলক চিত্র?" ১৭ অমরেন্দ্রর মনে হল পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের উপকরণ নিয়ে তো এর চাইতেও ভাল বই লেখা যায়। এখান থেকেই 'দক্ষিণের বিল'-এর সূত্রপাত। কিন্তু তাঁর ভাব আসে তো ভাষা নেই। কাহিনী আছে তো কথা নেই। ইচ্ছা আছে, শক্তি নেই। "আসন্ন প্রসবা মায়ের মত ব্যথা বেদনায় পায়চারি করতে লাগলাম।" ১৮

অবশেষে সুরু করলেন 'দক্ষিণের বিল' উপন্যাস। কিন্তু অমরেন্দ্র কোথায় থামবেন তা তখনও তিনি জানেন না। বর্ষার ধারার স্রোতের মত ভাসতে লাগল কাহিনী, এ ঢল সামাল দেওয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন। ক্ষুদে মাছির মত শত শত অক্ষরে হয়ে যাচ্ছে পাতা বোঝাই। অমরেন্দ্র লিখতেন খুব ছোটো ছোটো অক্ষরে, ফলে দেড়শ লাইনের ঠাস বুনোট এক পাতায়। অনেকটা লিখে এবার থামলেন। কাকে পড়ে শোনাবেন? রসিক শ্রোতা কোথায়? স্ত্রী পঙ্কজিনীকে রোজই কিছু না কিছু পড়ে শোনান, কিন্তু তাঁর ওপরও অমরেন্দ্রর তখন পর্যন্ত তেমন আস্থা জন্মেনি। তখন বাধ্য হয়েই অমরেন্দ্র অন্য পন্থা নিলেন। "কৃষাণ জবেদালীকে ডাকি, ডাকি নেয়ে মাঝি

চিনামাঁদকে···আর আসেন খুড়িমা। চুপ করে এসে দূরে উঠানে বসে শোনে আমার কাপালিক ভাই। পাঠ শেষ হলে সকলে বলে মন্দ হয়নি। কিন্তু একদিন কাপালিক ভাই মন্তব্য করে, খুব ভাল হয়েছে দাদা। ছাপাতে দাও, টাকা পাবে। আমি একটা লংকা-গাছ পর্যন্ত লাগাতে পারলাম না, আর তুমি কিনা একখানা বই লিখে ফেললে।······আমার ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল। কিন্তু ওর হাতে যে কাটারি। আজ ভাবি এই অন্ত্রের লজ্জায়ই তো হয়ে যাচ্ছে কত সত্য উন্মেষের সমাধি।'' ১৯ নির্বাসনের পর সাহিত্যে পুনরাবির্ভাবের প্রস্তুতি এভাবেই তলে তলে গড়ে তুলছিল মহৎ সাহিত্যের আবির্ভাব।

দুই

দেশ বিভাগের আগে পূর্ব বাঙলার মাটিতে বসে যে 'দক্ষিণের বিল' এর সূচনা, কলকাতায় এসে তখনও তিনি তা শেষ করতে পারছেন না। পূর্ব বাঙলার নদী-বিল-ঝিল, চর-যার সংগে অমরেন্দ্রর দৈনন্দিন জীবনের নিবিড় ও প্রত্যক্ষ পরিচয়, তাকেই তিনি 'দক্ষিণের বিল'-এ রূপ দিতে চাইছেন। শুধু তাই নয়—'দক্ষিণের বিল'-এ অমরেন্দ্র যেমন প্রকৃতির সংগে মানুষের সংগ্রামকে দেখাতে চাইছেন, তেমনি এর সংগে আবার নিজের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ জড়িত করতে চান। এ ছাড়াও সেকাল ও একালের সামাজিক আদর্শে কত পার্থক্য ছিল তাকেও চিত্রিত করতে চাইছেন। এ নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে। 'দক্ষিণের বিল'কে এক সুবৃহৎ ক্যানভাসের বৃত্তে এনে দাঁড় করাতে চান অমরেন্দ্র। কিন্তু বাধ সাধেন প্রকাশক। ফলে আবার নতুন উদ্যমে লেখা সুরু হল 'দক্ষিণের বিল'। ''দক্ষিণের বিল' অনেক দূর ফেলে এসেছি, অনেক স্মৃতি বিস্মৃতির কাঁটা ঝোপে চাপা পড়েছে, সে ঝিকিমিকি ছবি। তখন কৃষক ছিলাম, এখন সাহিত্যের মজুর। রোগে দারিদ্র্যে পথ হারিয়েছি। সব চেয়ে বড় কথা—'এক চাকাতেই বাঁধা, পাকের ঘোরে আঁধা, আমার হারান সুর খোঁজার ছুটি দিচ্ছে কে? রাহা খরচও হাতে নেই।''২০

কলকাতায় এসে সীমাহীন দারিদ্র আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছাড়া অমরেন্দ্রর সামনে তখন আর কিছুই ছিল না। অবশেষে পূর্ব বাঙলা থেকে এসেই বন্ধু হ্যারির সংগে পরামর্শ করে একটা দোকান করার পরিকল্পনা হল। রাসবিহারী অ্যাভিনু ও রসা রোডের মোড়ে ঘরটা এক রকম দখল করলেন অমরেন্দ্র। কিন্তু অমরেন্দ্রর চাকরী রইল না বেশী দিন। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে ফার্নিচার ফিট করা হল, সাহেবী কেতায় দর্জির দোকান। কাঠের দোতলা, রেলিং-সিঁড়ি-

লাইট-ফ্যান। কিন্তু হ্যারীর আর টাকা নেই মূল ব্যবসা চালাবার। দিনরাত অমরেন্দ্রই দোকানে থাকতেন, কিন্তু শেষে একদিন বিছানা গুটিয়ে বাসায় ফিরে এলেন। অতএব দোকানে সুবিধা করতে না পেরে অমরেন্দ্র আবার বেকার হলেন। 'দক্ষিণের বিল'-ও তিনবারের মত লেখা শেষ করেছেন। এ সময় এসে উপস্থিত হলেন রমেশদা। রমেশদার আসল নাম রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রমেশদার মত একজন সাহিত্য রসিকের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই অমরেন্দ্র নতুন করে 'দক্ষিণের বিল' লেখেন। এ হেন রমেশদা এসেই তাঁর উপস্থিতি জানিয়ে দিলেন বাড়িওয়ালার সংগে বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে। কি যেন দাবি করেছে বাড়িওয়ালা অযৌক্তিক। এই ঘটনার দিন দুয়েক পরেই অমরেন্দ্রর সংগে আলাপ হল। পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যে আশ্বাস পেলেন, তাতেই অমরেন্দ্রর ভিতরের মুমূর্ষু শক্তি যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল আবার।

পরদিনই অমরেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন পুরান আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে। সংগে সংগে একটা পরিকল্পনা এসে গেল মাথায়। খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেলেন তাঁর সাহিত্য রচনার অনুরাগী নৃপেন্দ্র মুখার্জি, প্রাণতোষ দাশগুপ্ত এবং কিরণময় রাহাকে। শ্যালক রথীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকেও পেলেন। জামাতা অনিল বসু এবং সন্তোষ মিত্র আগেই এসে দেখা করে গিয়েছিলেন। তখনও জলের স্রোতের মত রিফিউজি আসছে কলকাতায়। একখানা খোপ ভাড়া পাওয়াও সমস্যা। অনিল বসুই ঠিক করে দিয়েছিলেন টালিগঞ্জের এই বাসাটা। এই সময়ের মধ্যেই অনিল বসু, সন্তোষ মিত্র এবং রথীন্দ্রনাথ সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু অমরেন্দ্রর মত একটা ভাঙা সংসারের গোড়া পত্তন থেকে মাসে মাসে চালিয়ে নেওয়া খুবই দুঃসাধ্য। অমরেন্দ্র তখন সকলের কাছেই জানতে চাইলেন, কী করবেন এখন? কিন্তু কেউ কিছু জবাব দিতে পারলেন না। নিরুপায় হলেও অমরেন্দ্রকে তো একটা কিছু করার পথ খুঁজে পেতেই হবে। কিছু কিছু সরকারী সাহায্য সুরু হয়েছে তখন, বেশ কয়েকদিন ঘুরে অমরেন্দ্র কিছুই হদিস করতে পারলেন না। ওখানে গেলে বলে সেখানে, সেখানে গেলে দুর্ব্যবহার। তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন ক্যাম্পে যাবেন না, গেলে আরও তছনছ হয়ে যাবে সব। বয়স যাই হোক, যা হোক একটা চাকরী তাকে জোটাতে হবেই। কিন্তু কী চাকরী পাবেন, কবে পাবেন, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর ততদিনের রসদই বা কোথায়?

বাধ্য হয়েই অমরেন্দ্র আত্মীয় বন্ধুদের কাছে একটা প্রস্তাব দিলেন—প্রত্যেক মাসে দশটি করে টাকা দেবে। এমনি ছ'মাস। প্রস্তাবটা শুনে নৃপেন্দ্র, প্রাণতোষ, কিরণময় সকলেই রাজী হলেন। ঘুরে ঘুরে একমাস আদায় করে অমরেন্দ্র দেখলেন, পূর্ণ প্রতিশ্রুতি হাতে এসেও শ' টাকা হচ্ছে না। অথচ মাসিক একশ না হলে তো সংসার চলে না। তবু চালাতে হয় সংসার। ধার

দেনা বাড়তে থাকে দিনে দিনে। এক এক সময় চরম বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের মধ্যেই অমরেন্দ্র একদিন খবর পেলেন পূর্ব বাঙলা থেকে শামসুদ্দিন আবুল কালাম কলকাতায় এসেছেন। গিয়ে দেখা করলেন তাঁর সংগে। সব শুনে শামসুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার 'দক্ষিণের বিল' কোথায়? চলুন প্রখ্যাত প্রকাশক দিলীপ গুপ্তের কাছে নিয়ে যাবো। কিন্তু অমরেন্দ্রর এমনই ভাগ্য সে সময় দিলীপ গুপ্ত আবার কলকাতার বাইরে। শামসুদ্দিন হাল ছাড়লেন না। আবার মাসিক বসুমতীতে নিয়ে যাবার আশ্বাস দিয়ে বললেন, মাসিকে ধারাবাহিক ছাপা হলে কিছু টাকা পাবেন। সেই দিনই শামসুদ্দিনের সংগে অমরেন্দ্র এলেন বসুমতী অফিসে। এখানেই প্রাণতোষ ঘটকের সংগে অমরেন্দ্রর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র লিখেছেন, "আজ জীবনের যে কত বড় একটা লগ্ন তা বুঝতে পারছিনে। এসেছি টাকার জন্যে কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটলেই ধন্য। অর্থের বাইরেও যে একটা পরমার্থ আছে এ-পথে, তা তখন আমার অনুভূতির বাইরে। এবার আমি তপস্যা করে আসিনি এখানে, এসেছি মুদীর মন নিয়ে।....... আভিজাত্যের কোনো প্রকাশ দেখলাম না শ্রী ঘটকের ভিতর। দুটি একটি অন্তরঙ্গ কথা। – লেখা আমাদের পছন্দ হলে ছাপব বই কী! মাসখানেক তো সময় দিতে হবে।"২১

দু'সপ্তাহ বাদেই অমরেন্দ্র আবার প্রাণতোষ ঘটকের কাছে হাজির হলেন। তিনিও জানালেন উপন্যাসটি বসুমতীতে ছাপা হবে। এর জন্য তিনি কত টাকা চান? অমরেন্দ্র কিছুই জানেন না এ সবের। তবুও দু'শ টাকার কথা বলে ফেললেন। প্রাণতোষ ঘটক মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দু'শ চাওয়ার কারণ। "দু'মাস সংসার চলবে। এর ভিতর আর একখানা বই লিখব। তবে খুদে লেখা লিখে চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গেছে, একজোড়া চশমা দরকার। প্রাণতোষ আড়াইশ টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এ মাসে দেড়শ, পরের মাসে একশ। এ টাকাকে আমি শুধু অগ্রিম বলে কখনো ধরে নিতে পারিনি—প্রাণতোষ করলেন যেন এক অন্ধকে দৃষ্টি দান। 'দক্ষিণের বিল' বসুমতীতে একটা সংখ্যা বেরুন মাত্র আমি প্রতিষ্ঠার সুগন্ধ পেলাম। আমি আজো প্রীতিমুগ্ধ সকৃতজ্ঞ। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা প্রাণতোষ ঘটক আমার জীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায়।"২২ মাসিক বসুমতীতে 'দক্ষিণের বিল' প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই সাহিত্যে অমরেন্দ্রর পুনরাবির্ভাব চিহ্নিত হল। এবং তাঁর এই পুনরাবির্ভাব প্রসঙ্গে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, "খুশি হয়ে তার 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে ছিলাম "কল্লোলে"। ভেবেছিলাম ঘাটে ঘাটে অনেক রত্ন-পণ্যভার সে আহরণ করবে। কোথায় কোন্‌দিকে যে ভেসে গেল নৌকো, কেউ বলতে পারল না। ডুবে তলিয়ে গেল কি না তাই বা কে বলবে? প্রায় দুই যুগ পরে তার পুনরাবির্ভাব হল। এখন আর সে 'কলের নৌকা' হয়ে নেই, এখন সে সমুদ্রাভিসারী সুবিশাল জাহাজ হয়ে

উঠেছে—নতুনতরো বন্দরে তার আনাগোনা। ভাবি জীবনে কত বড় যোগসাধন থাকলে এ উন্মোচন সম্ভবপর।"২৩ এ প্রসংগে অমরেন্দ্র নিজে আবার বলেছেন, "অচিন্ত্যকুমার প্রীতি ও স্নেহে অন্ধ হয়ে তাঁর 'কল্লোল যুগে' বলেছেন এ আমার যোগসাধন। আমি বলি, জনসাধারণের অতৃপ্তি। সেই অতৃপ্তি মিটাতেই আমার দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাসের পর বুঝি সাহিত্যে নবজন্ম। এবার আমি হাতে হাত মিলিয়ে জীবনকে অর্জন করে এসেছি।২৪" বাংলা সাহিত্যের যে পর্ব ছিল অমরেন্দ্রর নির্বাসন আসলে সেই পর্বেই তৈরী হচ্ছিল পুনরাবির্ভাবের সন্ধিলগ্ন। সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' যে নব জাগৃতি এনেছিল, তা আরো খর বেগে মুখর হল যুদ্ধোত্তর যুগে। জীবন-জিজ্ঞাসু শিল্পীরা এসে মিশে গেলেন এ ধারার সংগে। আর একটা বাঁক ঘুরল সাহিত্য। কবিতা, প্রবন্ধ, কথা-সাহিত্যে জন্মাল মহীরূহ! কিন্তু অমরেন্দ্র প্রবীন হয়েও এ বৃক্ষের নবীন ফল।

মাসিক বসুমতী থেকে প্রথম মাসের দেড়শ টাকা পাবার সংগে সংগেই অমরেন্দ্র চশমা কিনে আবার লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু মনে তাঁর অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমাল। কেন লিখবেন? কাদের জন্য লিখবেন? তাঁর বক্তব্যই বা কী হবে? অমরেন্দ্র মনে মনে ঠিক করে নিলেন, এতদিন বসে যা ভেবেছেন, উপলব্ধি করেছেন, অধ্যয়ন করেছেন মানব চরিত্র থেকে—তার থেকে ছাঁটাই বাছাই শুরু হল। 'দক্ষিণের বিল' খণ্ডে খণ্ডে লেখার জন্য তার মাল মশলা আলাদা করে রেখে নতুন বিষয়ে হাত দিলেন। মনের মধ্যে তোলপাড় সুরু হল সন্ন্যাস বড়, না সংসার বড়—এর জবাবে একটি উপন্যাসে হাত দিলেন। ভৈরব সংযম এবং ত্যাগের আদর্শ, ময়না ভোগের মাতৃত্বের। লিখতে লিখতে অমরেন্দ্রর হাতে ময়নাই বড় হয়ে উঠল। দু'মাসের মধ্যেই উপন্যাসটির রচনা সম্পূর্ণ হল। নাম দিলেন 'পদ্মদীঘির বেদেনী'।

মাসিক বসুমতীর আড়াই শ টাকায় দু মাস চলার পর আবার অভাব। তখন কলকাতায় চাল, চিনি, কয়লায় লাইন। নগদ টাকা চাই। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর মুখ শুকনো। অমরেন্দ্র আবার অকূল সমুদ্রে পড়লেন। এবারও পরিত্রাতা হিসেবে দেখা দিলেন সেই শামসুদ্দিন আবুল কালাম। এবার ছুটোছুটি সুরু হল 'পদ্মদীঘির বেদেনী'কে নিয়ে। শামসুদ্দিন যেন অমরেন্দ্রর মনের ঠিক প্রয়োজনের খোঁজ রাখতেন। মুখ্যত শামসুদ্দিনের চেষ্টাতেই অমরেন্দ্রর 'পদ্মদীঘির বেদেনী' 'অগ্রণী' মাসিক পত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা হোল। কিন্তু তিনি লেখা বন্ধ করলেন না। আবার একটা নতুন বক্তব্য ঠিক করে নিলেন। তা হল—এই স্বাধীনতায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কি পেল? ছোট উপন্যাস, এক মাস দশ দিনেই লেখা সারা হল—নাম রাখলেন 'মন্থন'। 'অগ্রণী' সম্পাদক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

অমরেন্দ্রকে জানালেন, বসুমতীর মত আমাদের ক্ষমতা নেই। মাসে মাসে পনর টাকা আমরা দিয়ে যাবো।

'পদ্মদীঘির বেদেনী'র পনর টাকা অমরেন্দ্রর হাতে আসতে না আসতে খরচ। বাধ্য হয়ে 'মন্থন' উপন্যাসের পান্ডুলিপি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবস্থা এমন চরমে গিয়ে দাঁড়াল যে, মাত্র দশ টাকার বিনিময়েও পান্ডুলিপি বিক্রী করতে প্রস্তুত, তাতে অন্ততঃ রেশনটা আনার ব্যবস্থা হবে। কলকাতার ভাষা ও অমরেন্দ্র তখন ভাল করে রপ্ত করতে পারেন নি, তেমন ভাল জামা-কাপড়ও নেই। আড়াই টাকা ক্যাম্বিসের-জুতোও ছিঁড়ে গেছে। সেই ছেঁড়া জামা ও জুতোয় তাপ্পির ওপর তাপ্পি পড়তে সুরু করেছে। অমরেন্দ্রর দারিদ্র যত চরমে পেঁাচচ্ছে, সংগ্রামও তত তীব্র হচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে ঠিকানা জোগাড় করে অমরেন্দ্র একদিন এলগিন রোডে দিলীপ গুপ্তের বাড়ির খোঁজে এলেন। এলগিন রোড তখন কলকাতার সাহেব-সুবা অধ্যুষিত অঞ্চল। অনেক কষ্টে বাড়ির ভোজপুরী দারোয়ানকে বুঝিয়ে অমরেন্দ্র একটা স্লিপ পাঠালেন—জনৈক সাহিত্যিক দর্শন প্রার্থী। কিছুক্ষণ পরেই বৈঠকখানার আলো জ্বলে উঠল। হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন বহু প্রত্যাশিত দিলীপ গুপ্ত। প্রকাশন জগতের এক সম্রাট। নমস্কার বিনিময় করে ভেতরে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। পূর্ব সুপারিশের কথা স্মরণ করিয়ে অমরেন্দ্র বললেন, "আমি সেই 'দক্ষিণের বিলে'র লেখক অমরেন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরী বরিশাল থেকে বোধহয় একখানা চিঠি লিখেছিলেন।"২৫ হাসি মুখে চির অতিথি বৎসল দিলীপ গুপ্ত জানিয়ে দিলেন—সে কথা তাঁর মনে আছে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিলীপ গুপ্ত জেনে নিলেন সব। অনুমোদন সাপেক্ষে 'মন্থন' এর পান্ডুলিপি তাঁর কাছে রইল দু সপ্তাহের জন্য। 'দক্ষিণের বিল' প্রকাশের ইচ্ছাও ব্যক্ত করলেন তিনি। কথা প্রসংগে জানালেন 'মন্থন' বাইশ শ ছাপা হবে। দাম হবে তিন টাকার মত। অমরেন্দ্র পাবেন নশ টাকা। এডিশন হলে আবার নশ। তবে 'দক্ষিণের বিলের' পান্ডুলিপি না দেখে কিছু বলতে চান না দিলীপ গুপ্ত। অমরেন্দ্র মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। ওঠার মুখে দিলীপ গুপ্ত একখানি বিলিতি বাইন্ডিং খাতা অমরেন্দ্রর হাতে তুলে দিলেন। বেশ মোটা খাতা। দুখানা উপন্যাস লেখা হয়ে যাবে। সেখান থেকেই দিলীপ গুপ্ত অমরেন্দ্রর জীবনে বন্ধু-প্রীতি নিয়ে অক্ষয় হয়ে রইলেন। বাড়ি ফিরে এসে অমরেন্দ্রর মনে হল, কোথায় তিনি 'মন্থন' এর পান্ডুলিপি রেখে এলেন? কোন রসিদ তো নিয়ে আসেন নি। অতবড় বাড়ি, আবার কেমন করে ভেতরে যাবেন? যদি ভেতরে যেতে না পারেন। সারাটা রাত অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটালেন অমরেন্দ্র। পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই অমরেন্দ্র দিলীপ গুপ্তের বাড়িতে গিয়ে হাজির। সব শুনে দিলীপ গুপ্ত অসম্ভব হাসলেন। তিনি জানালেন এক রাত্তিরে পান্ডুলিপি শেষ করেছেন।

বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে তিনি অমরেন্দ্রকে অভিনন্দন জানালেন। টাকার কথাও পাকাপাকি হল এখানে। অমরেন্দ্র লিখেছেন, "এখানে বসেই 'চরকাশেম' এর বহিরেখা নির্দিষ্ট হল। আমি বললাম, দিলীপ গুপ্ত শুনলেন একান্ত হয়ে। ভূমিহীন একদল হিন্দু-মুসলমান জেলে কৃষাণের অভিযান। রূপ কিন্তু ইতিহাস আশ্রয়ী। এ অন্ধকারের ইতিবৃত্ত নয়, জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। ওরা যুগ যুগ ধরে বাঁচতে চায়, কিন্তু অ্যাটমবমের মত অন্তরায় সৃষ্টি হয় দুর্ভিক্ষের। তবু ওরা প্রতিবাদ করে বাঁচে। ছিয়াত্তর, তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর নির্মূল করতে পারে না ওদের প্রাণ-কামনাকে। আমি যুগের হুজুগের একটা রেখাও টানিনে—দেখাই চিরন্তনকে। শ্রীগুপ্ত বলেন, চমৎকার হবে—লিখে নিয়ে আসুন। উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে কী না হয়! দুমাসও লাগে না 'চরকাশেম' লিখতে। কিন্তু এবার আর কিছুতেই সময় করে উঠতে পারেন না শ্রীগুপ্ত। 'চরকাশেম' আর পড়া হয়ে ওঠে না।"২৬ আরও কিছুদিন এইভাবে কেটে গেল। অমরেন্দ্র আবার দারিদ্র এবং চিন্তার অকূল সমুদ্রে এসে পড়লেন সামনে তখন আর কোন সম্ভাবনা নেই। দিলীপ গুপ্তের উৎসাহেই দুমাসের মধ্যে 'চরকাশেম' শেষ করেও কিছু হল না। "চরকাশেম' তখনি ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। 'মন্থন' রইল দিলীপ গুপ্তের জিম্বায়, স্ত্রীর অসুখে, মেয়ের বিয়েতে দিলীপ গুপ্ত বার বার দরাজ হস্তে সাহায্য করলেন, কিন্তু কী যেন কারণে 'মন্থন' আর ছাপতে পারলেন না। ···তবু দিলীপ গুপ্ত আমার কাছে দানে সত্য, আমি গ্রহণে।''২৭

অনিশ্চিতের মধ্যেই আরও কিছুদিন কেটে গেল। কোথাও কোন সম্ভাবনা অমরেন্দ্রর চোখে পড়ছে না। অথচ সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠল।

"চরকাশেম'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসে আছি, কোথাও যেতে সাহস পাচ্ছি নে অসার্থক লেখা নিয়ে। কিন্তু ছেলে মেয়ে ভাত চায়, স্ত্রী বলেন, আর ধার করা চলে না কয়লা ঘুটে চাল। আমিও অল্পতেই পরিশ্রান্ত বোধ করি। বুঝতে কষ্ট হয় না, একেই বলে কঠোর বেকারি। একটা ভরসা ছিল সেই দশটা টাকার প্ল্যান, কিন্তু তারও মেয়াদ ফুরিয়েছে। কত আর বিরক্ত করা যায় আত্মীয়-বন্ধুদের! ব্যক্তির মজ্জা মাংস রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্রমে পুষ্টির অভাবে নেতিয়ে পড়ছে গোটা পরিবার। একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল তাজা। ভাবলাম, আর দেরি করা চলে না। আলস্য করলে আর তো বলা হবে না আমার ঐতিহাসিক বক্তব্য। যে ভাঙন দেখলাম, তার তো রূপ দেওয়া হল না সাহিত্যে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ক্ষোভ করবে, দুঃখ করবে—তখন যেখানেই থাকি, কী কৈফিয়ৎ দেবো? আজ সিপাহী বিদ্রোহের সমকালীন কোনো উপন্যাস নেই, থাকলে আমরা কী এত বিড়ম্বনায় পড়ে হাবুডুবু খেতাম! স্ত্রীকে একটু কড়া সুরে বললাম, জামাইদের একটু শক্ত চাপ দাও, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আবার যাও, বুঝিয়ে বলো, সবার দায়িত্ব রয়েছে এ রচনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত।

…সমস্ত পরিবারকে আমি উপোসের মুখে রেখে, রক্ত বমি করতে করতে ধ্যানস্থ হলাম। রচনা সুরু করলাম—'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'। পূর্ব বাঙলা ভাঙনের উপকরণে হাত দিলাম। মুখোশ খুলে দিলাম সমস্ত রাজনীতি ও অর্থনীতির। পড়ে বুঝলাম রচনা এপিক ধর্মী হচ্ছে। হচ্ছে প্রতিভূমূলক—যা সর্বকালের গ্রহণযোগ্য। রক্ত উঠছে গলা বেয়ে, চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই, ক্ষিধায় পেট মোচড়াচ্ছে, সময় মত রেশন আনার সঙ্গতি নেই—কিন্তু লিখে চলেছি পুরো দমে। ব্যবহার করছি যা কিছু শরীরের সঞ্চিত পেট্রোল, এনার্জির ইন্ধন। ক্রমে ক্রমে ডান হাতের কব্জিতে ক্র্যাম্পসের সঞ্চার হতে লাগল। তবু বিরতি দেবার উপায় নেই।" ২৮

এই সময় রামমোহন ঘোষ নামে এক ব্যক্তি নিতান্ত অনাহূতের মত একদিন অমরেন্দ্রর বাড়িতে এসে উপস্থিত। এক রকম জোর করেই শুনতে চাইলেন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'র পাণ্ডুলিপির কিছুটা পড়ে শোনালেন অমরেন্দ্র। রামমোহন ঘোষের সংগে পরিচয় সম্পর্কে অমরেন্দ্র লিখেছেন, "ক্রমে টের পেলাম রামমোহন শুধু কেরাণী নন। এঁর একটা ব্রত আছে। সময়তে মনে হবে খেয়াল, সময়তে পাগলামি। আমি কিন্তু ঘোর তুফানে হালে পানি পেলাম। ·· ধার-কর্জ শেষ সীমায় পৌঁছেছে। রামমোহনের নির্দেশ মত কচি বাসুদেবকে রিফিউজি সার্টিফিকেট-গুলো দিয়ে পাঠিয়েছি তাঁর অফিসে, বেলা গেছে, কিন্তু কাউর ফেরার নাম নেই। লিখতে লিখতে কেবল অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছি। স্ত্রী তো একবার ঘর একবার গেট করছেন। বাসুদেব সাত দিনের রেশন নিয়ে হাজির। হাওড়া থেকে সরকারী সাহায্য ধরে দিয়েছেন রামমোহন—অফিস আওয়ারে গা ঢাকা দিয়ে।"২৯

আবার কয়েকটা দিন দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে অমরেন্দ্র লেখায় মনোনিবেশ করলেন। অবশেষে 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' শেষ করলেন। কিন্তু কাশির সংগে সেই রক্ত বন্ধ হল না। উঠে আসতে লাগল তাজা রক্ত। অমরেন্দ্র নিজের মনের সংগে বোঝাপড়া করতে করতে ভাবলেন, এখন তো মরা চলবে না। তাঁর যে এখনও অনেক কাজ বাকি। এভাবে যদি তিনি পান্ডুলিপি ফেলে রেখে চলে যান, কেউ তো জানবে না তিনি কী লিখেছেন। কেন পূর্ববাঙলা থেকে মানুষ এখানে এসে যাযাবরের জীবন যাপন করছে? অনেক মূল্য দিয়ে মানুষ কী পেয়েছে! অমরেন্দ্র নিজের তীব্র প্রাণ কামনাকে তীব্রতর করলেন। লড়াই চলল দারিদ্রের চড়াই ভেঙে। কিন্তু হঠাৎ হোঁচট খেলেন 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' শেষ করে। ভিতরের বাঁধন কোথায় যেন একটু শিথিল হয়ে গেছে আবার সুরু করলেন লেখা। আবার সুরু হল কঠোর সংগ্রাম। হাতের আঙগুলগুলো টন টন করে, মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যায় হাতের কব্জি। কেরোসিন ফুরিয়ে যাচ্ছে লণ্ঠনের, তবু পঁচিশ দিনের মধ্যে শেষ করে ফেললেন।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' শেষ করেই অমরেন্দ্র শয্যা নিলেন। এবারেও পরিত্রাতা হিসেবে এসে দাঁড়ালেন রামমোহন। নিয়ে গেলেন ডাঃ সন্তোষ পালের কাছে। তিনি বাকিতে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুললেন অমরেন্দ্রকে। টালিগঞ্জের আরও দুজন ডাক্তারের সংগে অমরেন্দ্রর আলাপ হল। একজন শিল্পী ডাক্তার কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য, অপরজন শুধু ডাক্তার নন, দুর্ধর্ষ সমালোচক শিবপ্রসাদ বসু। এই দুজন অমরেন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহ এবং সাহায্য দুই-ই জুগিয়েছেন সমানে। রামমোহনের একটা বৈশিষ্ট্য হল—অমরেন্দ্রর যথার্থ প্রয়োজনের মুহূর্তে সে হাজির। কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই উধাও। তাই অমরেন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠার সংগে সংগেই রামমোহন কোথায় উধাও হলেন। আবার অকস্মাৎ একদিন উদয় হয়ে অমরেন্দ্রকে 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর সংগে যেতে বললেন। পাণ্ডুলিপি বগলে অমরেন্দ্রও বেরিয়ে পড়লেন তাঁর সংগে।

পাণ্ডুলিপি বগলে অমরেন্দ্র রামমোহনের সংগে এলেন এমন এক জায়গায় যা দেখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। সেখানে তখন উপস্থিত দেবেশ চন্দ্র বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় আই. সি. এস, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম. এল. সি (তৎকালীন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান), অধ্যাপক অনিল চক্রবর্তী এবং শিবশম্ভু সরকার। রামমোহন সকলের সংগে অমরেন্দ্রর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এই সেই প্রতিভা, যাঁর পুনর্বাসন একান্ত জরুরী।"৩০ রামমোহনের অনুরোধে অমরেন্দ্র পাণ্ডুলিপি থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন। কিন্তু কয়েক পাতা পড়ার পরই তাঁর গলার স্বর ভেঙে গেল "এ স্বরভঙ্গ রোগের প্রতিক্রিয়া নয়— মনে পড়েছে গোটা পূর্ব বাঙলার ছবি। গাছপালা মঠ মসজিদ জলবায়ু আকাশের রূপ, পিতা পিতামহ প্রতিবেশীর স্মৃতি—পঞ্চরত্ন, গোরস্থান, সোনালী ফসল। তারপর কান্না, অগ্নি, বলাৎকার ধর্ষণ। মানুষের চরম অপমান। একটা বলিষ্ঠ জাতির বিশিষ্ট অংশ মুছে গেল বিংশ শতকের পাতা থেকে।"৩১ সেদিন দেবেশবাবু ও দেবপ্রসাদ আশ্বাস দিলেন অমরেন্দ্রকে শ'পাঁচেক টাকা তুলে দেবেন। অপরদিকে কবিশেখর কালিদাস রায়, ডঃ কালিদাস নাগ এবং মোহিতলাল মজুমদারও অমরেন্দ্রকে সাহায্যের আবেদন জানালেন।**

শ'পাঁচেক টাকার প্রতিশ্রুতি আনার পর থেকেই রামমোহনের চোখের ঘুম চলে গেল। সে তখন রীতিমত বিনিদ্র ও উৎকণ্ঠ। তিনি তখন হন্যে হয়ে সপ্ত সমুদ্র মন্থন করে টাকা তুলছেন। মাঝে মাঝে সে টাকা অমরেন্দ্রর হাতে চলে আসছে। অধ্যাপক অনিল চক্রবর্তী কলেজ কামাই করে অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়েছেন। "দক্ষিণ কলকাতায় একটা যেন সাড়া পড়ে গেছে, এসেছে, কে যেন এসেছে একজন—যার চালচুলা নেই, শুধু একটা মাত্র কলম সম্বল। আমি ব্যঙ্গ শ্লেষ ঈর্ষা আদর্শ শ্রদ্ধা হয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে

গেলাম। এখানে বসেই খবরের ঢেউ পাচ্ছি নানা রকম, ছড়িয়ে যাচ্ছি বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে।''৩২ এর পর আরও দিন সাতেক পান্ডুলিপি বগলে অমরেন্দ্র রামমোহনের সংগে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালেন। কোথাও তেমন কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না অমরেন্দ্র। দিন যায়, আবার বাড়ে দারিদ্র। টালিগঞ্জের মাথাওয়ালাদের কিছুতেই এক করতে পারেন না রমেশদা এবং রামমোহন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একদিন এলেন অমরেন্দ্রর টালিগঞ্জের বাড়িতে। অবশেষে তিনিই একদিন বেংগল পাবলিশার্সের মনোজ বসুর কাছে অমরেন্দ্রকে হাজির করলেন। মনোজ বসু 'পদ্মদীঘির বেদেনী' প্রকাশের চুক্তি করে পঞ্চাশ টাকা অগ্রিমও দিয়ে দিলেন। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় থেমে থাকলেন না। তিনি তখন 'চরকাশেম' নিয়ে বুক ওয়ার্ল্ডের সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের সংগে অমরেন্দ্রর যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। প্রকাশের নিশ্চিত ভরসা পেলেন অমরেন্দ্র। টাকা পেলেন না কিন্তু পেলেন সহানুভূতি। কিন্তু অমরেন্দ্রকে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। এল জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ১৩৫৬ সাল। প্রকাশিত হল, 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী'—এক তারিখে যমজ ভাই-বোনের মত।''৩৩ সাহিত্যে অমরেন্দ্রর শুধু পুণরাবির্ভাবই হল না—হল অভিষেক। শ্রীমতী লীলা রায় লিখলেন, "Many years ago Amarendra Ghosh wrote for Kallol but he buried himself in Barisal untill he emigrated to west Bengal shortly before the Partition. Here he resumed his writing, being so poor he could scarcely buy the necessary paper. His return is an event.''৩৪

অমরেন্দ্রর এই পুণরাবির্ভাব ও অভিষেক সম্পর্কে আরও একজনের অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হলেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ডঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "অমরেন্দ্রবাবু আসলে কিন্তু বাঙলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত নহেন,—কল্লোল যুগের লেখক তিনি, কিছু কিছু লেখা তিনি সেই যুগেই প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তারপরে দীর্ঘদিন তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন পল্লী-জীবনের নিছক বিষয় কর্মে। কিন্তু অন্তরের আগুন বোধ হয় নিভিয়া গিয়াছিল না, তাহা হয়ত জীবনের ক্ষেত্রে আবার একটা দমকা হাওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। সাম্প্রতিক বঙ্গবিভাগ এবং তাহার ফলে ঘটিয়াছে যে ধর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব তাহা তাঁহার মনের আগুনকে নূতন করিয়া সন্ধুক্ষিত করিয়া দিয়াছে। পল্লীগ্রামের বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ আবার কথা সাহিত্যের রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।''৩৫ 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদিঘীর বেদেনী' প্রকাশিত হবার পর কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর Bengali Literature প্রবন্ধে

লিখেছেন, "After Manik Bandopadhyaya is to be mentioned Amarendra Ghosh. His 'Char Kashem' is a memorable production of our times like its European Counterpart, 'Growth of the Soil.''৩৬

অমরেন্দ্রর পুণরাবির্ভাব ও অভিষেক সম্পর্কে আরও একজন প্রবীন লেখক শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন। "Amarendra Ghosh a refugee from Literature has returned to it as a refugee from East Bengal." ৩৭
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও চিঠি লিখে জানালেন, "তুমি যে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পেরেছ এ দেখে মনে মনে কত গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। প্রার্থনা করি তোমার বেদনা ও সাধনা জয়যুক্ত হোক।''৩৮

তিন

সাহিত্যে পুণরাবির্ভাব ও অভিষেকের পর অমরেন্দ্রর সামনে আবার সীমাহীন দারিদ্র এসে উপস্থিত হল। 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' প্রকাশিত হবার পর 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'র পান্ডুলিপি বগলে নিয়ে ঘোরা সুরু হল। অমরেন্দ্রর মনে হল তিনি যেন এক বিশাল মরুভূমির ওপর বিচরণ করছেন। এমন সময় আকস্মিক ভাবে পরিচয় হল রবীন মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের সংগে। তিনিই স্বল্প বেতনের একটি চাকরী ঠিক করে দিলেন। মাড়োয়ারী ফার্ম, ল্যান্ড কাস্টমের এজেন্ট—একজন সরকার চায়। অমরেন্দ্র বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে মন্মথ সান্যাল ও সাগরময় ঘোষের প্রশংসা পত্র নিয়ে বড়বাজারে মাড়োয়ারী ফার্মে এসে হাজির হলেন। গদির মাড়োয়ারী মালিক প্রশংসা পত্রগুলো বাঁ হাতে পাশে সরিয়ে জানালেন পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। চাকরী হবে কি না অমরেন্দ্র জানেন না, তবু তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে। এই সামান্য বেতনের চাকরীটাই হয়তো তাঁর পরিবারকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তাই বাধ্য হয়েই তিন তলার ঘরে বসে, বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে একটা জীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ির আঙিনায় বে-আইনি জনতা-কে প্রবেশ করতে দেখতে লাগলেন। "অন্ধ-খঞ্জ-জুতোপালিশ-ভিখারী -বেকার। শিল্পী আছে, গায়ক আছে, আছে রঙিন কিন্তু ছেঁড়া ঘাগরা,-পরা মধুয়ালী। এঁরা সব জড়িয়ে সমাজের একটা শক্তির উৎস। মাথা গোঁজার

ঠাঁই চায়। কিন্তু এত হর্মমালার মধ্যে ও এঁদের তৈজস পত্রটুকু রাখার স্থান নেই। তুমুল ঝগড়া হল, কার যেন হারিয়ে গেছে বাঁশের বাঁশিটা। দেখলাম খঞ্জের দৃষ্টি এবং অন্ধের শক্তির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। সাময়িক একটা সংসার সাজালে দুজনে। এরা নারী-পুরুষ। এদের প্রাণকামনার সঙ্গে গর্ভ সঞ্চার হয় বে-আইনি স্থানে—আবার ভূমিষ্টও হয় মানব শিশু পিতৃ-পরিচয়হীন। যখন আমরা বলি জারজ, তখন বে-আইনি মাতা বুকে তুলে হয়ত দুধ দেয়, ঘন ঘন খায় চুমো। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশালাম। তন্ন তন্ন করে আরো অনেক আস্তানা দেখলাম। একখানা উপন্যাসের কাঠামো খাড়া হল।" ৩৯ চাকরীর সন্ধানে গিয়েই অমরেন্দ্র পেয়ে গেলেন 'বে-আইনি জনতা' উপন্যাসের উপাদান। চাকরীর নিয়োগপত্র সেদিনই হাতে হাতে পেয়ে গেলেন।

ল্যান্ড কাষ্টমের এজেন্ট-এর ফার্মে চাকরী করতে এসে অমরেন্দ্র এক নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়লেন। স্বল্প বেতন. হাড়ভাঙা খাটুনি। সারাদিন কাজে কাজেই কেটে যায়। সাহিত্য পিছনে পড়ে থাকে। কেন না সারাদিন জীবিকার জন্য যাদের সংগে কাষ্টমের চড়াই ভাঙেন, তাদের অধিকাংশ ভাটিয়া, সিন্ধি ও গুজরাটি ব্যবসাদার। কথায় কথায় চাঁদির জুতোর ঠোক্কর মারে। সাহিত্য, পাণ্ডিত্য, তাদের ত্রিসীমায়ও নেই। অমরেন্দ্রর এ চাকরীও বেশি দিন স্থায়ী হল না। মাড়োয়ারী ফার্ম একদিন বন্ধ হয়ে গেল। তিনি আবার বেকার হলেন। আবার সেই রমেশদার পরামর্শ ছাড়া উপায় নেই। এই রমেশদাই বিজয় ব্যানার্জীর কাছে অমরেন্দ্রকে এনে হাজির করলেন। হ্যারিসন রোডে বিজয় ব্যানার্জীর সেই চিলতে কোঠায় ঢুকতে গিয়েই 'সূর্যমুখীর মৃত্যু' গল্পটিকে পেয়েছিলেন অমরেন্দ্র। চিলতে কোঠার ভিতরে একজন জোর জবরদস্তি করে শোয়া যায়—বসলে দুজন। সুমুখে দক্ষিণ খোলা রাস্তার ওপর জানলা। ছিটকানি নেই, দড়ি দিয়ে বাঁধা, এই জানলার বিপরীত ফুটে আর এক জোড়া জানলা—বোধহয় কোন মেয়ে হোস্টেলের।

সামান্য আলাপের পর বিজয় ব্যানার্জী অমরেন্দ্রর হাতে দিলেন Encyclopaedia of Information & General Knowledge : Literature -in 1950.

এই গ্রন্থে অমরেন্দ্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"But most powerful and objective type of fiction, and yet romantic, produced in the recent time in Bengali are those of Amarendra Ghosh. His two outstanding works are 'Char Kashem' and 'Padma Dighir Bedini.' His 'Dakshiner bil' which is being published in Basumati has the qualities of an epic and yet different in treatment compared with the other

two books. Here is a genius whose creative mind can conceive of varied ideas and forms. He has already proved himself to be the most powerful writer since Sarat Chandra….."
নিজের সম্পর্কে এই অভিমত প্রসংগে সেদিন অমরেন্দ্রর প্রতিক্রিয়া ছিল, "এ নিতান্ত প্রীতির পুষ্পার্ঘ, তবু আমার জীবনে প্রথম কালির অক্ষরে অভিনন্দন, আমি যেন নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।"৪০

'চরকাশেম' ও' পদ্মদীঘির বেদেনী' বই আকারে প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই অমরেন্দ্রর পরিচিতিটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লেও, তখন পর্যন্ত তিনি কোন সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পাননি। এতবড় সংসার অথচ স্থায়ী কোন আয় নেই। তবুও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই অমরেন্দ্র সাহিত্যের যাত্রা সুরু করলেন। তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানতেন, সে পথে অনেক চড়াই উৎরাই ভাঙতে হবে। সে পথে সীমাহীন দারিদ্র্যই একমাত্র তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবু অমরেন্দ্র সংকল্পে অটুট। মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা তাঁর ললাটে দারিদ্রের রক্ততিলক পরিয়ে সাহিত্যের পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। সীমাহীন দারিদ্র্য আর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করে সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনার এক অসামান্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁর কাগজে অমরেন্দ্রকে তেমন স্বীকৃতি না দিলেও, জীবিকার প্রশ্নে দেখালেন অপরিসীম আন্তরিকতা। সজনীকান্তের সংগেই এগিয়ে এলেন দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাগরময় ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী রায়। এঁদের সকলের একান্ত সুপারিশেই তদানীন্তন পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী নিশাপতি মাঝির দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তাঁর চেষ্টাতেই সরকারী চাকরীটা হয়ে গেল। গভর্নমেণ্ট রেশন স্টোরের ম্যানেজারের পদে যোগ দিলেন অমরেন্দ্র ১৯৫০-এর নভেম্বর মাসে। পরে অবশ্য সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠিতে' লেখার জন্য অমরেন্দ্রকে আহ্বান জানালেন। সজনীকান্তের এই আন্তরিকতা প্রসংগে অমরেন্দ্র লিখেছেন, "তিনি আজীবন বহু সাহিত্যিককে খ্যাতির খেয়ায় একের পর এক সরবে পৌঁছে দিয়েছেন, আমাকেও দিয়েছেন নীরবে পৌঁছে জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশের কাছে।"৪১

রেশন স্টোরের চাকরিতে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই অমরেন্দ্র আবার এক সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন। সব রেশন স্টোর গুলো উঠে গেল। দলে দলে লোককে টেনিং দিয়ে জমিদারী তুলে দেওয়া খাতে পাঠাতে লাগল মাঠে মাঠে বন বাদাড়ে। এমন সব আইন কানুন তিন মাসের মধ্যে শিখতে হচ্ছে যা ঝানু আই.সি. এসরাও বোধ হয় বহু বছর কাজ করে শিখতে পারে না। তখন সব ম্যানেজারদেরই কিছু টাকা পাওনা রয়েছে পুরনো

ডিপার্টমেন্টে। কেউ তা আংশিক পেয়েছে, কেউ পায়নি। বিলি ব্যবস্থারও চরম হট্টগোল। অমরেন্দ্রও তার পাওনা টাকা আদায় করতে পারলেন না। অথচ বিদেশে ট্রেনিং এ যাবার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন।

প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় অমরেন্দ্রকে ট্রেনিং-এ চলে যেতে হল। গোপাল নগর ল্যান্ড রেকর্ড অফিসে হোত ট্রেনিং ক্লাস। দশটা পাঁচটা একটানা ট্রেনিং চলত। প্রায় সকলেই ছিল বিদ্যায় দিগ্‌গজ। যা দু একটি জুয়েল ছেলে ছিল, তারাও এতদিন স্টোরে ম্যানেজারী করে ভোঁতা হয়ে গেছে। ট্রেনিং-এ এসে সকলেরই চিন্তা কি করে আইন কানুন মুখস্থ করে পাশ করবে? অমরেন্দ্র দেখলেন হাজার হাজার এ্যাক্‌ট এ্যামেন্ডমেন্ট করেও ভূমি ব্যবস্থার গলদ দূর হয়নি। বরং তা আরও জটিল হয়েছে। অমরেন্দ্রর মত বয়োঃবৃদ্ধরা নতুন আইনের মার পাঁচ দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্লাসের এক কোণে বসে সাত পাঁচ ভাবেন আর ভাঙা শরীরের জন্য হাঁফাতে হাঁফাতে দম নেন, তখন নিতান্ত অযাচিত ভাবেই একজন এগিয়ে এসে জানায়, সাদা খাতা জমা দিলেও রেহাই নেই। পাস লিখে পাঠিয়ে দেবে। আসলে এরা কাউকেই বসিয়ে খাওয়াবে না। এই ক্লাস ঘরে বসেই অমরেন্দ্রর সংগে আলাপ হল, বাবড়ি চুলো পঁয়ত্রিশ বছরের এক ছাত্রের সংগে। ক্লাসে তখন ইনস্ট্রাকটর নেই—ছেলেটি ওস্তাদের মত মাথা নাড়তে নাড়তে উদাত্ত কন্ঠে আবৃত্তি করছে 'ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনি করেছ' ৪২ কবিতাটি অমরেন্দ্রর মনে চমক জাগাল, একটু সাবেক ধরনের কবিতা হলেও ছন্দ বেশ সুললিত। পরিচয় প্রসংগে অমরেন্দ্র জানতে পারলেন, ছেলেটি কবিতাও লেখে। কিন্তু রেশন স্টোরে ম্যানেজার হবার পর চাল-আটার নির্ভুল হিসেব রাখতে গিয়ে, সব হারিয়ে গেছে। কে যেন কবির সংগে অমরেন্দ্ররও পরিচয় করিয়ে দিয়ে জানাল, উনিও লেখক। অনেকগুলি বই লিখেছেন। কবির যথার্থ পরিচয় ছিল—বাংলায় অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছিল কাঁচা পয়সার ফাঁদে পা দিয়ে, বিয়ে থা করে সংসারের বোঝা ও আরও দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে লেখা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই কবিই অমরেন্দ্রকে লেখার সুযোগ করে দিলেন। এখান থেকেই জন্ম নিল 'কনকপুরের কবি' উপন্যাস। "সত্যিই আমি প্রাণ ঢেলে 'কনকপুরের কবি' লিখলাম। গতানুগতিক উপন্যাসের ধারা গেল পালটে। হল সাবজেকটিভ টাইপের লেখা কিন্তু রোমান্টিক, অথচ বাস্তব ধর্মী এ উপন্যাসের কাঠামো।"৪৩

গোপালনগর ল্যান্ড রেকর্ড অফিসে ট্রেনিং-এ এসে এক এক সময় অমরেন্দ্রর মনে মনে ভয় হতে লাগল, অনেক দূর মাটি জল ফসল ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন, এবার বুঝি হারিয়ে যাবে 'কনকপুরের কবি'—তার জীবন কাব্য, যৌবনের এক সংঘাতময় পরিস্থিতি, বহু অভিজ্ঞতা লব্ধ ফল। এতকাল মাটির মাধুর্যই শুধু দেখেছেন, দেখেছেন তার মাতৃরূপ। কিন্তু তাকে নিয়েই যে হানাহানি কালো কারবার গড়ে উঠেছে, তা কারুর নজরে পড়েনি। তুলটে, তাম্র ফলকে বাদশাহী

অঙ্গুরীয় ছাপে, বণিক রাজত্বে স্ট্যাম্পের পটভূমিতে শুধু ঠকাঠকি হিংসা-দ্বেষ, স্বার্থ আর স্বার্থ। অন্ধকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শুধু লোভের ইতিবৃত্ত। অমরেন্দ্র আরও দেখেছেন, সহস্র সহস্র অর্ধাহারী অনাহারী মুখ রেশনের দোকানের কাউন্টারে। এ সব না লিখলে ভুলে তলিয়ে যাবে যত সংগ্রহ করা মাল মসল্লা। তাই আবার বন্ধুদের আশ্বাসে লিখতে বসলেন। তিনবার লিখে 'কনকপুরের কবির' পান্ডুলিপি শেষ করলেন।

কয়েকদিন পরেই এক মার্জিত রুচি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে অমরেন্দ্র সাক্ষাৎ করলেন। পড়ে শোনালেন 'কনকপুরের কবির' পান্ডুলিপি এই প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার গোপালচন্দ্র রায়কে অমরেন্দ্র বললেন, "সমগ্র সমাজের আদ্যোপান্ত কাঠামো আমি মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছি। এক ফোঁটা চোখের জলও। প্রেম এখানে গৌণ—বঞ্চনা এবং বৈষম্য হচ্ছে মুখ্য। বসুন্ধরার জীবন সংগীতেও এই ক্ষুধা ও বঞ্চনার সংঘাত। এই ক্ষুধাকে কতিপয় বে-আইনি করেছে। শিল্পী ভাস্কর কবি করেছে সাহায্য। তারই ছদ্মবেশ খুলে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।"৪৪ কিন্তু বাধ সাধলেন এই প্রতিষ্ঠানের আর একজন অংশীদার বিরাম মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে 'কনকপুরের কবি' হাফ্ ফিনিসড্। বিরাম মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এর আগে স্ত্রী পঙ্কজিনী এবং সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার একই কথা বলেছিলেন। অতএব অমরেন্দ্রও রসিক শ্রোতা এবং পাঠকের নির্দেশে 'কনকপুরের কবি' কে ত্রুটি মুক্ত করলেন, তথাপি গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিরাম মুখোপধ্যোয় এ বই ছাপতে রাজি হলেন না।

'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' প্রকাশিত হবার পর অমরেন্দ্র ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেতে লাগলেন। সেই প্রতিষ্ঠাকে আরও সুদূর প্রসারী করল টালিগঞ্জের নাগরিক বৃন্দের আন্তরিক সংবর্ধনা। একুশে শ্রাবণ, তেরশ সাতান্ন সকাল আটটা। টালিগঞ্জের একটা প্রাচীন বাড়িতে মীরা কেমিকেলস—তারই দোতলায় হলঘরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা রামমোহন, রমেশদা এবং রামপরায়ণ। এছাড়াও ছিলেন দেবব্রত রায়চৌধুরী, কবি নির্মল সিংহ। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি মনোজ বসু। আহবায়ক ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় এবং দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাণী রায় প্রভৃতি। এক কথায় দল মত নির্বিশেষে সভায় উপস্থিত হয়েছেন কলকাতার তথা সারা বাংলা দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিক। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আহবানে একে একে বক্তব্য রাখলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বাণী রায় এবং অতুল গুপ্ত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জলদ গম্ভীর কন্ঠে বলেছিলেন, "যদি খনি গর্ভ থেকে মণি তুলতে পেরে থাকেন অমরেন্দ্র ঘোষ, তবে সংবর্ধনা জানাতে আপত্তি কি ?"৪৫ সংবর্ধনার শেষে অমরেন্দ্রর হাতে পাঁচশো প'য়ত্রিশ টাকার একটি তোড়া উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

আগেই বলেছি টালিগঞ্জের নাগরিক বৃন্দের সংবর্ধনা অমরেন্দ্রর প্রতিষ্ঠার

পক্ষে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। প্রায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স 'দক্ষিণের বিল' (১ম) প্রকাশ করলেন। তারপর সুসাহিত্যিক বিনয় ঘোষের আন্তরিক চেষ্টায় বুক ডিপো 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' এবং 'বে-আইনী জনতা' প্রকাশ করলেন। প্রথম সংস্করণের জন্য মাসিক একশো করে দেড় হাজার টাকা দিলেন। এই টাকা পাওয়ার ফলে অমরেন্দ্র দারিদ্রের আর একটা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু তবুও অমরেন্দ্র যেন কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। পরিচিতি, নাম ডাক কিছু কিছু হলেও প্রতিষ্ঠা তখনও তেমন ভাবে আসে নি। এই গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যেই অমরেন্দ্র একদিন ডি. এম. লাইব্রেরীর কর্ণধার গোপাল দাস মজুমদারের কাছে হাজির হলেন। গোপালবাবু ইতিপূর্বে 'একটি সংগীতের জন্মকাহিনী' প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বইটি তখনও তেমনভাবে চলেনি। তাই গোপালবাবু অমরেন্দ্রর পরবর্তী বই সম্পর্কে তেমন কোন উৎসাহ দেখাতে রাজি না থাকলেও, 'কনকপুরের কবি'র পান্ডুলিপি শুনে কোথায় যেন সম্ভাবনা দেখলেন। তাই বললেন, "এত বড় বই কে ছাপবে বলুন? আপনার তো নাম যশ নেই। কত পার্সেন্ট রয়্যাল্টি চাই?"৪৬ শেষ পর্যন্ত টেন পার্সেন্ট রয়্যাল্টির চুক্তিতে গোপালবাবু 'কনকপুরের কবি' ছাপতে রাজী হলেন। তাড়াহুড়ায় বহু মুদ্রণ প্রমাদ নিয়ে বেরুলেও 'কনকপুরের কবি' অমরেন্দ্রর প্রতিষ্ঠা আর এক ধাপ বাড়াল।

'কনকপুরের কবি' প্রকাশিত হবার পরই অমরেন্দ্রর সংগে আলাপ হল 'স্বাধীনতা' পত্রিকার কবি ও সাংবাদিক স্বরোজ দত্তের সঙ্গে। আলাপের মাধ্যম কবি বন্ধু বিমল চন্দ্র ঘোষ। সরোজবাবু বয়সে অমরেন্দ্রর চেয়ে কিছু ছোট হলেও, সাহিত্য-সাংবাদিকতা-বিচার-বিশ্লেষণ-অনেকগুলো গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু সব গুণকে ছাপিয়ে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ দরদী মানুষ— যিনি শুধু উদ্ধৃতি কণ্টকিত থিওরী সর্বস্ব নন। তবে রাজনীতি সমাজনীতির কথা উঠলে সরোজবাবু বড় নিষ্ঠুর। পরম বন্ধুরও এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি সইতে নারাজ। সাহিত্যে তো বটেই। এই সরোজ দত্তই অমরেন্দ্রকে হাত ধরে স্বাধীনতা পত্রিকায় নিয়ে এলেন এবং সেদিন থেকেই তিনি স্বাধীনতার নিয়মিত লেখক হয়ে গেলেন। বিমলচন্দ্র ঘোষের বাড়িতেই একে একে দেখা গেল বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রবিন মিত্র, অনিল সিংহ, সুধী প্রধান কে। সাহিত্য চর্চাই ছিল এখানের প্রধান আকর্ষণ, তবু এই বাড়িটাকে মনে হত যেন পার্টি অফিস। এই বাড়িতেই অমরেন্দ্র আর একজন মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। তিনি হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদ। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের মেয়ের বিয়েতে এসেই অমরেন্দ্র মুজফ্ফর আহমেদের সংগে প্রথম পরিচিত হলেন। এক্ষেত্রেও মাধ্যম ছিলেন কবি বিমলচন্দ্র। আলাপের পর মুজফ্ফর সাহেব বলেছিলেন,

"বিমলচন্দ্র ঘোষের মেয়ের বিয়েতে এসে বড় লাভ হল, অমরেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ।"৪৭

সরোজ দত্তের আহ্বানে স্বাধীনতা পত্রিকায় অমরেন্দ্র যেদিন প্রথম এলেন, সেদিনের স্মৃতি তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই ধরা পড়েছে। "দেখেছিলাম স্বাধীনতা অফিসের সিঁড়িতে সরোজ দত্তকে। সম্মুখে স্ট্যালিনের ছবি। কোণায় কাস্তে হাতুড়ি। এমনি একদিন দেখেছিলাম গোলাম কুদ্দুসকে—সোমনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে মোটা ফ্রেমের চশমার সুকুমার মিত্র ও অরুণ রায়কে।"৪৮ ঠিক এর কিছুদিন পরেই এল ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাংলা-বিহার মার্জারের চক্রান্ত। এর বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা প্রতিবাদে গর্জে উঠল। এ সময় বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'Voice of Bengal' পুস্তিকায় বামপন্থী ঋজুতা নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর প্রবন্ধ চিন্তাশীল সমাজে আলোড়ন তুললে সুদূর প্রসারী। "অতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিনেশ দাস, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে রুগ্ন অবস্থায় আমিও লাঠি ভর করে মার্জারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম। ভুলে গেলাম না আমি 'চরকাশেম'-এর শেষ কথা-প্রতিকার না হলেও প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের। দু'তিনটা মিটিং করলাম সাহিত্য সভায় উপস্থিত হয়ে। আজো বাঙলা ভাষা বনাম রাষ্ট্রভাষার লড়াই চলছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তো দিল্লীর মসনদ পর্যন্ত আওয়াজ তুলেছেন। অনেক স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে, তবু আমাদের পংক্তিতে অতুলচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে বুদ্ধদেব। অতুলচন্দ্র মনীষী, বুদ্ধদেব তপস্বী তবু বোঝা গেল মায়ের সম্মান বিপন্ন হলে এঁরাও জনতার সঙ্গে হাতে হাত মিলাতে পারেন। সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ অনস্বীকার্য।"৪৯

খাদ্য দপ্তরের হাড়ভাঙা খাটুনি, অনাহার, অনিদ্রা—একটানা সাহিত্য রচনা, অমরেন্দ্রর শরীরটাকে ক্রমশঃ দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে টেনে আনছিল। খুব তাড়াতাড়িই স্বাস্থ্য ভাঙল, আক্রান্ত হলেন হাঁফানিতে। ফলে বাধ্য হয়ে উনিশ'শ তিপান্নর জুনে খাদ্যদপ্তরের চাকরী থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু সহকর্মী বন্ধু সত্যবন্ধু ভৌমিক উদ্যোগ নিয়ে অমরেন্দ্রর বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করলেন। ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান, কিন্তু তবুও তার গুরুত্ব অপরিসীম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এলেন কাজী আবদুল ওদুদ। ওদুদ সাহেব সভায় এসে একান্তে অমরেন্দ্রকে ডেকে বললেন, "আপনি অসন্তুষ্ট না হলে একটা কথা বলি, আপনাকে সাহিত্যের কোনো কৃতি পুরুষের সঙ্গে তুলনা করতে চাই। এ হেন বিদগ্ধ জনের মুখে এ উক্তি শুনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। বললাম, আপনার যা খুশী তা করতে পারেন। আমাকে জিজ্ঞাসার কি আছে? আপনি যতটা মার্কসিস্ট, তার চাইতে বেশি হিউম্যানিস্ট। সেই জন্যই অনুমোদন চাইছি।"৫০ এর পরেই কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর Contemporary Indian Literature-এ লিখলেন, "His Char Kashem

is a memorable production of our time. But Ghosh is more a humanist than a leftist.''৫১ এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এসে ওদুদ সাহেব অমরেন্দ্রর অনুমতি পাবার এক বছর পরেই 'চরকাশেম' উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে সত্যিই একজন বিখ্যাত লেখকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে লিখলেন, "শরৎচন্দ্র জীবনের শেষভাগে সংকল্প করেছিলেন মুসলমান সমাজের চিত্র তিনি যা জানেন অংকিত করবেন। কিন্তু তার সময় তিনি পাননি। .. শরৎচন্দ্রেরই মতো দরদী শিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষ যেন তাঁর গুরুকৃত্য পালন করেন।''৫২

খাদ্য দপ্তর থেকে অবসর নেবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অমরেন্দ্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রমেশদা এবং রামমোহনের চেষ্টায় স্থানীয় ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার রায়চৌধুরীর কাছে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। অত্যন্ত সদালাপী মানুষ এই প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী। তেমনি মমতাময়ী হলেন তাঁর স্ত্রী শৈলজা চৌধুরী। অপূর্ব সুমিষ্ট কণ্ঠ শৈলজাদেবীর। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তীর স্মৃতি সভায় শৈলজাদেবীর গান অমরেন্দ্রকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, 'রোদনভরা এ বসন্ত' গানের কলিটি একই নামের একটি উপন্যাসের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু ক্রমশঃ অমরেন্দ্রর দুরারোগ্য হাঁফানি ডাঃ প্রফুল্ল কুমারের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল। অমরেন্দ্রকে হাসপাতালে ভর্তির আদেশ দিলেন, সেই সঙ্গে ভর্তির সুপারিশ। বন্ধু সত্যেন সরকার অমরেন্দ্রকে এনে ভর্তি করে দিলেন ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে। এখানে এসে অমরেন্দ্রর মনে হল, স্বাস্থ্য নেই, ঘুণে ধরা কাঠামো। তাই বেড়ে বেড়ে চিন্তা গ্লানি, ওষুধে-ডাক্তারে-নার্সে সিসটারে এ এক নতুন জগৎ। হাসপাতালে কড়া ডিসিপ্লিন। সেখানে বসে কি মন খুলে লেখা যায়। কাশি এবং হাঁফানির ঝাঁকুনিতে সব অঙ্গের যেন জোড়া খুলে গেছে, শুধু ঠিক আছে তাঁর মাথাটা, কলম ধরলে হয়তো এখনো লেখা সম্ভব, সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এত উদ্বেগের মধ্যে ও অমরেন্দ্র সান্ত্বনা পেলেন, কারণ এখনও অনেক ফর্মা জবানবন্দী লেখা বাকি।

ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের ডিরেক্টর ডাঃ আর. এন. চৌধুরীর পেসেন্ট বলে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং স্টাফেরা অমরেন্দ্রকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হাউস সার্জেন এসে অমরেন্দ্রর কেস হিস্টি তৈরী করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরিন-ব্লাড-স্টুলের ফর্দ তৈরী হয়ে গেল। চিকিৎসা চলতে থাকলেও অমরেন্দ্রকে হাসপাতালে কঠোর নিয়ম শৃংখলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বেশ কয়েক দিনের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেল, তিনি কল্লোল-যুগের লেখক। কিন্তু হাসপাতালের এই শৃংখলাবদ্ধ জীবন অমরেন্দ্রর কাছে ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠছিল। হাসপাতালের কঠোর নিয়ম শৃংখলা ভেঙে ফেলতেই রাতে লাঠি ধরে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবেন। অমরেন্দ্র ভাবলেন তিনি তো

শয্যাশায়ী রোগী নন। তা ছাড়া এটা হাসপাতাল, জেলখানা নয়। কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখলেন পায়ে বেড়ি। নার্স টর্চ জ্বেলে বলে দিলেন, আপনার 'বেড কেস' সব কিছু বিছানাতেই করতে হবে। ডাক্তারের কঠোর নির্দেশ। অমরেন্দ্র মনে মনে কঠোর হলেন সত্যেন সরকারের প্রতি। হাসপাতালের এই শৃঙ্খলিত জীবনের নাটের গুরুতো সত্যেন সরকারই। এই সত্যেন সরকারের চরিত্রই অমরেন্দ্রর অপ্রকাশিত উপন্যাস 'একটি স্মরণীয় রাত্রি'র নায়ক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জবানবন্দীতে অমরেন্দ্র সত্যেন সরকার প্রসঙ্গে লিখেছেন, "জানি তোমার আসমুদ্র হিমাচল পরিচিতি—শুধু সাহিত্যের গন্ডিতে আবদ্ধ না থেকে কত বেকার বিধ্বস্তকে জুটিয়ে দিয়েছ চাকরি, কারুর বা ডিগ্রী রুখেছ কোর্টে গিয়ে যা ঝুলছিল ফাঁসের দড়ির মত, দিয়েছ আশ্রয়হীনকে আশ্রয়ের সন্ধান, জ্ঞানপিপাসু দুঃস্থ ছাত্রকে দুটো ভাল টিউশনি। মৃত বন্ধুকে তুমি আজও অমর করে রেখেছ স্মৃতি তর্পণে। সুধীরলালের স্মৃতি বার্ষিক উদ্‌যাপন তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কত গায়ক গুণীজনের সমাবেশ। তুমি কিন্তু অন্তরালে। আমার চোখে গুণীর চেয়েও গুণী। ধন্য মনে করি তোমার বন্ধুত্যে। ধন্য মনে করি তোমার সান্নিধ্য। তোমার তুলনা শুধু তুমিই। কিন্তু কেন এ নিষ্ঠুরতা, আমার প্রতি অবিচার আজ।"৫৩

হাসপাতালে একটানা কুড়ি দিনের চিকিৎসায় ডাক্তার, নার্স ও স্টাফেদের চেষ্টা যত্নের কোন ত্রুটি না থাকায় অমরেন্দ্রর রোগ প্রায় নির্ণয়ের কাছাকাছি। হাঁফানি কমেছে খানিকটা, কিন্তু বায়ুর চাপ প্রবল। ওজনও কমে গেছে বেশ খানিকটা। অমরেন্দ্র বেশ বুঝতে পারছেন, অস্থি-মজ্জা-পেশী নিঃশব্দে ক্ষয় হচ্ছে। একটানা পেনিসিলিন ইনজেকশনের ফলে আরও কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন অমরেন্দ্র। পায়ের বেড়ি খুলে দেওয়া হল। অনুমতি পেলেন হাঁটা চলার। হাসপাতালের জীবন শেষ হলে এই পা দুটোর ওপরইতো তখন নির্ভর করতে হবে। মাঝে মাঝেই আবার হাঁফানিটা বাড়ে, সেই সঙ্গে বুকে-পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তার জানালেন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে ডিউডিনাল আলসার। তাই এত উইন্ড এবং বুকে পেটে যন্ত্রণা। হাউস সার্জেন নতুন করে ওষুধ লিখে দিয়েছেন তিনদিনের, কিন্তু খেতে হবে ন দিন। ওষুধগুলোর দাম কুড়ি টাকা। ন দিনের জন্য লাগবে ষাট টাকা। কিন্তু তখন অমরেন্দ্র কিংবা পঙ্কজিনী কারুর হাতেই কপর্দক নেই। স্ত্রী পঙ্কজিনীর চেষ্টায় তিন দিনের জন্য ওষুধের একটা ফাইল কেনা হল। একটা ট্যাবলেট খাওয়ার পরই ডাক্তার তা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কুড়ি টাকা জলে পড়ার জন্য অমরেন্দ্র ভেঙে পড়লেন। হাসপাতালে অমরেন্দ্রকে অনেকেই এসে দেখে যেতেন। তাদের মধ্যে সস্ত্রীক মনোজ বসু, সজনীকান্ত দাসের পুত্র রঞ্জন, স্বাধীনতা পত্রিকার রিপোর্টার, দক্ষিণ কলকাতার অসংখ্য ছাত্র-যুবা।

প্রায় এক মাস হাসপাতালে চিকিৎসা করে অমরেন্দ্রর রোগ ধরা পড়ল, চেষ্টা যত্ন-ও হল অনেক। কিন্তু ক্ষতির বিরাম নেই। অমরেন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন।

চার

ট্রপিক্যালের প্রেসক্রিপশনগুলো পকেটে নিয়ে অমরেন্দ্রকে আবার অর্থ সংগ্রহের অভিসারে বেরুতে হল। কখনো সঙ্গী রমেশদা, রামমোহন, পবিত্র রায় আবার কখনো স্ত্রী পঙ্কজিনী। এই সময়ে অমরেন্দ্রর মানসিক অবস্থা তাঁর নিজের লেখার মধ্যেই সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। "আমি শুধু ফেইলিওর নই, অনেক সাকসেস্। আমি যতটা প্রতিভা, তার চেয়ে অনেক বেশী কমেডি। কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে বেঁচে হাঁপাই। তাই তো রিলিফ চাই বন্ধুরা।"৫৪ এই রিলিফের আশাতেই একদিন 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস থেকে ট্রামে চড়ে খিদিরপুর ঘুরে বাড়ি ফিরছিলেন। আলিপুরের হাওয়া অফিসের কাছে এসে কবি দুর্গাদাস সরকার ও গল্পকার হরেন ঘোষের মেসে এলেন। কিন্তু নিরাশ হলেন কেন না মেসের ঘরে তালা ঝুলছে। দুর্গাদাস সরকার ও হরেন ঘোষ তখন বাংলার এম.এ. ক্লাসের ছাত্র। এই হরেন ঘোষ বহুদিন বহু অভাবের ছোটখাটো চোরাবালি থেকে অমরেন্দ্রকে বাঁচিয়েছেন। সেখান থেকে আবার গোপালনগরের মোড়ে এসে তিনি নামলেন। পথটা তাঁর কাছে খুবই পরিচিত। বছর কয়েক আগে এখানের ল্যান্ড রেকর্ড ট্রেনিং অফিসে তাঁকে আসতে হত। আখতার মসজিদের পথ ধরে এক ভাড়াটে বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। এখানেই থাকেন জাতীয় গ্রন্থাগারের চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁরই পাশে কবি দিনেশ দাস। এখানে শুধু চিত্তরঞ্জনেরই সাক্ষাৎ পেলেন অমরেন্দ্র। কিন্তু দিনেশ দাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল না। ফেরার সময় চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে আশীর্বাদের নির্মাল্যের মত একটা আশ্বাস পেলেন।

কদিন পরেই অমরেন্দ্রর বাড়িতে সোজা চলে এলেন ব্যস্ত বাগিশ মানুষ দক্ষিণারঞ্জন বসু। অমরেন্দ্র কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেলেন। সেই ব্যস্ত বাগিশ দক্ষিণারঞ্জন বসুকে নিজের জীর্ণ কুটিরে দেখে অমরেন্দ্র আশার আলোয় ঝলমল করে উঠলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন শিল্পী সত্তার টানে ছুটে এসেছেন। দক্ষিণারঞ্জন সেদিন অনেকক্ষণ বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে আশ্বাস দিয়ে গেলেন কিছু করার। প্রায় দক্ষিণারঞ্জনের

পিছু পিছু এসে হাজির হলেন, টালিগঞ্জ জাগরণ সাহিত্য বাসরের সভ্য শিবদাস ভট্টাচার্য এবং শান্তনু শিরমণি। এঁরাও বেশ লোভনীয় দুটি ভরসা দিয়ে গেলেন।

সমবেত আশ্বাসে বুক বেঁধে অমরেন্দ্র এগিয়ে চলছেন। ট্রপিক্যালে থাকার সময় মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন, এবার আর গল্প উপন্যাস নয়, লিখবেন জবানবন্দী। সেখানে মৃত্যুর সংগে লড়াই করতে করতেই অমরেন্দ্র সংকল্প করে ফেলেছিলেন, "তাই তো বাঁচতে চাই। আমার তুচ্ছ এ-জীবনের জবানবন্দী শোনাবার জন্য নয়। আমি কণ্ঠ—তোমরা গান, আমি ভেলা—তোমরা যাত্রী, আমি আরশি—তোমরা জ্যোতি, এই অনুভূতিগুলি দরদী মরমিয়া পাঠক—জনতার কাছে পেঁছে দিতে চাই।"৫৫ এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই হাসপাতাল থেকে ফিরে অমরেন্দ্র জবানবন্দী রচনায় হাত দিয়েছেন। অন্য দিকে আশ্বাস অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য ও যথারীতি আসতে শুরু করেছে। পূর্ণ আবেগে তিনি লিখে চলেছেন জবানবন্দী।

কিন্তু বাধা এল। জমা টাকার হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখা গেল, জমা হয়েছে যা, খরচের ফর্দ তার বহুগুণ। রেবা, অশোকের বই কিনতে হবে, ইস্কুলের মাইনেও বাকি পড়েছে। ওষুধ, রিক্সা ভাড়া কদিনই বা চলবে। সুতরাং আবার বেরিয়ে পড়তে হল আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে। ভবানীপুর পাঠাগারের পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় দে, পরেশ সরকার, হেমেন বিশ্বাস সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সে সাহায্য হাতে এসে না পেঁছনোয় নিরুপায় হয়ে জ্বর গায়েই স্ত্রীকে নিয়ে অমরেন্দ্র এলেন অতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে। অমরেন্দ্রর সবচেয়ে বড় ভরসা, এই অতুল চন্দ্র গুপ্তই একদিন তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "অমরবাবু লিখে যান, বাঙলা সাহিত্যে আপনার নাম থেকে যাবে।"৫৬ সে আদেশ অমরেন্দ্র আজও পালন করে চলেছেন বলেই, আজ অতুলচন্দ্রের দরজায় সংকোচের পরিবর্তে বুকভরা ভরসা নিয়েই এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রী পঙ্কজিনীর কাছে খুব সংক্ষেপে শুনেই তিনি একখানি একশ টাকার নোট ও দশটাকা খুচরা দিয়ে, অমরেন্দ্রর চিকিৎসা সুরু করার এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আবার আসার কথাও বলে দিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই মহানুভবতা সম্পর্কে অমরেন্দ্র বলেছেন, "ছেলের নিউমোনিয়া, মেয়ের বিয়ে, আরো অনেকবার এখানে এসে হাত পেতেছি। হাসতে হাসতেই শতকে নোট বার করে দিয়েছেন শ্রীগুপ্ত। টাকা অনেকেরই থাকে কিন্তু এমন করে দিতে ক'জন পারেন। দিতে দিতে অনেকের দেয়া আর্টের কোটায় পেঁছে যেতে দেখেছি, কিন্তু এখানে দেখলাম এক অনাসক্ত দরদ। সন্ন্যাসীর ত্যাগ দিয়ে এর বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, ভারতীয় গৃহীকে দিয়েই শুধু সম্ভব।"৫৭ অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাড়ি থেকে অমরেন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে সোজা চলে এলেন বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনে। অমরেন্দ্রকে স্ত্রীর সঙ্গে

দেখে বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসু অবাক হয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, অমরেন্দ্রর জন্য তাঁরা কি করতে পারেন? উত্তরে অমরেন্দ্র জানালেন, "আপনাদের বিব্রত হওয়ার কিছু নেই। এই যে দিতে চাইলেন, এই যে মহানুভবতা, কিছু না নিয়েও, এটা হল নেয়ার সামিল।"৫৮

মাঝে মাঝে জবানবন্দীর লেখা থামিয়ে ভাবতে হয় এভাবে আর কতদিন চলবে। অভাব, অনটন, এ সব সংসারের প্রাত্যহিক সমস্যা। তবুও অমরেন্দ্রকে বাঁচতে হবে নিজের জন্য নয়, পরিবারের স্বার্থেও নয়, জবানবন্দির জন্য। আবার ভিক্ষার পালা সুরু হল। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এগিয়ে এলেন। ওঁরা আর সুকান্ত ভট্টাচার্য, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কলঙ্ক বাড়াতে রাজী নন। কিন্তু সে সাহায্য ও তো প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্ত কম। অমরেন্দ্রর মনে হল তাঁর এই সাহায্যের আবেদন সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই সংবাদ পত্রের সাহায্য। এ কথা মনে রেখেই অমরেন্দ্র এসে দাঁড়ালেন স্বাধীনতা পত্রিকার সিঁড়িতেই। "এই সিঁড়ি বেয়েই একদিন সুকান্ত উঠেছে, মানিক উঠেছে সেদিন, আমি বুঝি তৃতীয়। মানিক, সুকান্তকে স্বাধীনতা বাঁচাতে পারেনি। তবে আমি কোন্ আশায় এসেছি? একবার ভাবলাম নেমে যাই, আবার দেখলাম স্টালিনের মুখে মৃদু হাসি।"৫৯ সরোজ দত্ত, অরুণ রায়, সুকুমার মিত্র অমরেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে সবকিছু শুনলেন। "আমরা একটা স্থায়ী কিছু করার কথা ভাবছি।"৬০ কদিন পরেই সরোজ দত্ত উদ্যোগ নিয়ে স্বাধীনতা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন— "খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রী অমরেন্দ্র ঘোষ কিছুদিন যাবৎ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত আছেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকের মত শ্রী অমরেন্দ্র ঘোষও দারিদ্রের অভিশাপ মাথায় লইয়া আজীবন সাহিত্য সেবা করিতেছেন····· এই দুঃস্থ ও দুর্গত সাহিত্যিকের চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন। তাই তাঁহাকে সাধ্য মত সাহায্যের জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।"৬১

কয়েকদিন পরেই ভবানীপুর পাঠাগারের পক্ষ থেকে একশ টাকা অমরেন্দ্রর হাতে দিয়ে গেলেন। পরদিন যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে ধরলেন অমরেন্দ্র। বিবেকানন্দ শুধু আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই দিলেন না, যুগান্তরে লেখার সুযোগ এবং সেই সংগে তাঁকে সাহায্যের আবেদন।

অমরেন্দ্রর জন্য একটা স্থায়ী কিছু করার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি প্রাক্তন মেয়র সতীশচন্দ্র ঘোষের কাছে একটি চিঠি লিখে সরকারের কাছে আবেদনের জন্য অনুরোধ জানান। অতুলবাবু লিখেছেন, "My Acquaintance with him in connection with his Literary activities. In fact I noticed one of his novels in Public press, as it struck me as a genu'ne piece of Literary

work. It will be a loss to the country if he is compelled to stop writing owing to poverty."৬২

অতুলচন্দ্র গুপ্তের পদাংক অনুসরণ করে একে একে এগিয়ে এলেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক প্রথমনাথ বিশী। এই তিনজনেরই সুপারিশ করা চিঠিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অমরেন্দ্রর এই পর্বের অবস্থা চিঠিগুলোর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "Sri Amarendra Ghosh has been personally known to me for some time past. He is an author of established reputation and has written a few novels of outstanding merit. It is a pity that his work has, been, subject to constant interruption owing to chronic Poverty and the unsettling uncertainty of his general prospects ......I would strongly urge his claims for a fovourable consideration. Literary talent has a claim for nouri shment by the sta te and I hope that the state would realise its responsibility in the matter."৬৩

অচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, "Sri Amarendra Ghosh is one of our living Bengali novelists who has his own special inche in the hall of present day Indian writers. He started publishing his novels over a quarter of a century ago when the literary life of Bengal was in a ferment through conflict of old and new ideologies in both politics and society. His view-point has always been objective, with a real insight into the life of men and into the motives of men, and suffused by a real spirit of humanisn of interest in and love for man as man. His stories of the life and sufferings of the East Bengal Muslim villagers, people whom he knows best, are unique, and a most poignant story he has written on the grim tragedy which overtook the life of the minority community in East Bengal after the partition. Sri, Ghosh has been universally praised by all discriminating critics of Bengali literature among whom are can mention the names of Sri Atul Gupta, Srimati Lila Ray, Sri Kalidas Roy, Kavisekhar, Dr. Kalidas Nag, Dr. Srikumar Banerjee, Kazi Abdul wodud, Sri Achintya Sengupta & others ...... Sri Ghosh is

applying for state aid from the Centre both for his treatment and for occasion to support his application, I trust, after proper enquiry, the relevant authorities in our welfare state; will be able to do something to save a deserving writer who has proved his worth & from whom the country can get more."৬৪

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশিও সুপারিশ করে লিখলেন,"Sri Amarendra Nath Ghosh is a well known Bengali Novelist, He has written a number of novels which have been appreciated by the reading public as also by eminent critics. His stories deal with the life of "Les miserable" of Eastern Bengal. He has described a portion of life which was so long neglected and as such he has rendered a valuable social service.

"Sri Ghosh is a rofugee from East Bengal. At present he is without any occupation, broken in health and over fifry. He has applied to the Central Government for help and any succon given to him will be most fitting. This will relieve him from financial worries and thus will enable him to give undivided attention to literature which has already enriched and is likely to enrich further.

"I most emphatically recommend his case for sympathetie consideration,"৬৫

ডঃ শ্রীকুমার, ডঃ সুনীতি কুমার, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিধান সভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু এবং সংবাদপত্রগুলির যৌথ সুপারিশ ও আবেদনে অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস থেকে অমরেন্দ্রকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মাসিক ১২৫ টাকা আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও এককালীন দেড়শ টাকা সাহায্য দিলেন। প্রয়োজনের তুলনায় এ আর্থিক সাহায্য নিতান্তই অপ্রতুল। তবুও ডুবন্ত সংসার সমুদ্রে এই সামান্য আর্থিক সাহায্যই অমরেন্দ্রর বাঁচার একটা দিশা।

এদিকে অমরেন্দ্রর শরীরেও তলে তলে ধ্বস নামছিল। আবার হাঁফানি বাড়ল, কাশির সংগে উঠতে লাগল চাপ চাপ তাজা রক্ত। চোখের ঘুম চলে গেল। আর্থিক সংকট আবার তীব্র হয়ে উঠল। ছুটে এলেন আবার আত্মীয়-বন্ধুর দল। এলেন কবিশেখর কালিদাস রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অতুল

চন্দ্র গুপ্ত পাঠালেন আর্থিক সাহায্য। মেয়ে-জামাই এলেন। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার বন্ধু প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী ও বান্ধবী শৈলজা চৌধুরী। সাহায্য পাঠালেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। এবার বাধ্য হয়েই অমরেন্দ্র টালিগঞ্জের বন্ধুদের কাছে তাঁর অভাবের কথাটা জানালেন। সংগে সংগে আবার সংবর্ধনার আয়োজন সুরু হলো। এবার উদ্দেশ্য তাঁর হাতে পাঁচশ এক টাকার তোড়া তুলে দেওযা। দেবব্রত রায়চৌধুরী ও শম্ভু গাঙ্গুলী প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য আড়াইশ টাকা ধার দিলেন। দক্ষিণা রঞ্জন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। অর্থ সংগ্রহের আবেদনে সাড়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। চ্যারিটি শো-র জন্য বিনামূল্যে 'পথের পাঁচালী' ছবি দিতে রাজী হলেন।

টালিগঞ্জ অমরেন্দ্র ঘোষ সংবর্ধনা সমিতির সভাপতি হলেন তারাপদ চক্রবর্তী। এই উপলক্ষে তাঁর বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন সব কিছু খাটছে এই অনুষ্ঠানের জন্য। এদিকে আয়োজন যখন পুরোদমে চলছে, অন্য দিকে তখন মৃত্যুর সংগে পাঞ্জা লড়ে চলেছেন। তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে শরীর। টালিগঞ্জের বিশিষ্ট নেতা প্রাক্তন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান প্রমথ মিত্র অমরেন্দ্রকে এসে দেখে গেলেন।

১৯৫৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ভবানী প্রেক্ষাগৃহের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে এলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। অচিন্ত্য কুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কম্বুকণ্ঠে বললেন, "অমর, অমর। ইন্দ্র তার অধিপতি। ঘোষ হচ্ছে ঘোষণা। ভারত বিভাগ যেমন এক ইতিহাস, অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্যে পুণরাবির্ভাবও এক সাহিত্য ইতিহাস। একদিকে পদ্মা ও মেঘনার সাম্প্রদায়িক ভাঙন—'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'। আর একদিকে অজস্র প্রীতির 'চরকাশেম' জাগছে।"৬৬ এরপর অচিন্ত্য কুমার ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—"শতায়ু হও"। ৬৭ সভাপতি অচিন্ত্য কুমারের অনুরোধে সংবর্ধনার উত্তরে অমরেন্দ্রকে কিছু বলতে হবে এবার। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর অমরেন্দ্র বললেন—"আমি আজ বিচলিত হয়েছি। বেশী কিছু বলতে পারব না। তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে আমি পূর্ব বাঙলায় বসে গোলা কেটে ধান দিয়েছিলাম, প্রত্যেকের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে রেখেছিলাম যখন খাদ্য উঠবে তখন তারা আমায় ষোল আনা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেহ সে প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। পরবর্তী-কালে যখন পশ্চিম বাঙলায় ভিক্ষাভান্ড হাতে নিয়ে এলাম, তা বহুর আশীর্বাদে পূর্ণ। একদিন দিলীপ গুপ্ত, অতুল গুপ্ত প্রভৃতি দানে সত্য হয়েছিলেন, আমি গ্রহণে। আজো দেখছি তাই"।৬৮ এই অনুষ্ঠানে অমরেন্দ্রর হাতে খাগড়াই কাঁসার বড় একখানা থালা, ধুতি চাদর, ফুলের মালা এবং নগদ টাকা তুলে দিয়েছিলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত।

কদিনের মধ্যেই চিকিৎসা আর ওষুধেই টাকা নিঃশেষ হয়ে গেল। সরোজ দত্তের প্রচেষ্টায় বিধান সভায় বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু বিধান সভায় আবেদন জানালেন অমরেন্দ্র ঘোষের পরিবারকে সাহায্য দানের। আবার শিল্পী সত্তার টানে এগিয়ে এলেন বাংলার সাহিত্যিকেরা। সংবাদপত্র মারফৎ আবেদন প্রচার হল—"সাহিত্যিক বিপন্ন। সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট লেখকদের আবেদন—'চরকাশেম', 'দক্ষিণের বিল' 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' 'কনকপুরের কবি' 'বে-আইনি জনতা' 'নাগিনী মুদ্রা' প্রভৃতি উপন্যাসস্রষ্টা কথাশিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষ বছর দুই যাবৎ জটিল ব্যয়সাপেক্ষ রোগে এক সংকটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে কাল কাটাচ্ছেন। অর্থাভাবে তাঁর যথাসময়ে নিয়মিত চিকিৎসাটুকুও হচ্ছে না। তদুপরি তিনি বর্তমানে কন্যাদায়ে বিপন্ন। এই দুঃসময়ে, এ হেন একজন শক্তিধর বাণীর সেবককে প্রত্যেক সাহিত্যিক, সাহিত্য রসিক, সহৃদয় পাঠক ও প্রকাশকের উচিৎ যথাসাধ্য সাহায্য দানে দায়মুক্ত করা। আমরা অগৌণে সকল সাংস্কৃতিক সংস্থাকেও সক্রিয় হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যোগাযোগের একমাত্র ঠিকানা—অমরেন্দ্র ঘোষ, ৩৮, প্রিন্স বক্তিয়ার শা রোড (টালিগঞ্জ), কলিকাতা-৩৩। স্বাক্ষর—শ্রীবলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শ্রীসজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালিদাস রায়, মনোজ বসু, শ্রীশশি ভূষণ দাশগুপ্ত সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।"৬৯

সংবাদ পত্র মারফৎ এই আবেদন প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিকেরা যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। লেখকের স্ত্রী শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের কাছে সংরক্ষিত খাতা থেকে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যিকেরা প্রথমে নাম স্বাক্ষর করে পাশে টাকার অংক লিখেছেন। "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ টাকা, সজনীকান্ত দাস ৫০, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৫০, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ২৫, বুদ্ধদেব বসু ২৫, শশিভূষণ দাশগুপ্ত ২৫, প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৫, মনোজ বসু ৫০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, সন্তোষ কুমার ঘোষ ৫০, সুবোধ ঘোষ ২৫, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, রমাপদ চৌধুরী ১০, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১০, প্রমথনাথ বিশী ২৫, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ২৫, বারিদেবী ২০, গজেন্দ্রকুমার মিত্র ২৫, কুমারেশ ঘোষ ১৫, নীহার রঞ্জন গুপ্ত ৫৫, আশাপূর্ণা দেবী ২৫, শ্রীঅশোক কুমার সরকার ৫০, সাগরময় ঘোষ ২০, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৫, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ২০, উমা মৈত্র ২০, অতুল চন্দ্রগুপ্ত ১00, প্রসাদ সিংহ (উল্টোরথ) ৫০, সমরেশ বসু ২০, বিমল কর ৫, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ১০, সুমথনাথ ঘোষ ২০, শ্রীভুবন মোহন মজুমদার ২৫, দীনেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫০, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০, শ্রীতুলসী চরণ বসু ৫০, টি.কে.রায় ২০ এবং এম.এন.দত্ত ২০ টাকা।"৭০

সঞ্চিত টাকা আবার খরচ হয়ে যাচ্ছে। অমরেন্দ্র আবার হাঁফানিতে কষ্ট পাচ্ছেন এবার যেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। সুরু হল যমে মানুষে টানাটানি। তবু জবানবন্দী তাঁকে শেষ করতেই হবে। কেন না তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন, "বামপন্থাই আমার পথ। কারণ জনতা এই পথেই এগিয়ে চলে। জনসাধারণ বলতে আমি বিশেষ করে বুঝি এক শ্রেণীর মানুষ, যারা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত শোষিত। যারা দেয় বেশী, পায় কম। যাদের শ্রম নইলে কোনো সভ্যতা টেঁকে না। আমি দেখেছি তারা জীবনের সার্বিক ধর্মে বিশ্বাসী। তারা বাঁচতে চায়, আবার অনায়াসে মরতে পারে তোমার জন্য। তারা হিংসায় বর্বর, আবার দানে মহৎ। কাউর হয়ত অক্ষর জ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই, কিন্তু চিন্তায় চেতনায় সুগভীর। এরাই হচ্ছে নীচুতলার মানুষ। প্রদীপের অন্ধকার।"৭১ এদের কথাই জবানবন্দীতে লিখে যেতে চান। ক্রমশঃ অমরেন্দ্র মৃত্যুর কাছাকাছি এগিয়ে আসছেন। দুরারোগ্য ব্যাধিও ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। অবশেষে জবানবন্দী শেষ করে লিখলেন, "যদি বামপন্থাই সংগ্রাম ও শান্তির পথ হয়ে থাকে, তবে আমার লেখার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ সে ঝংকার তোলেনি কি? যদি সত্য দর্শনের প্রত্যয় ও প্রতীতি সিদ্ধ পথে মহাজনেরা হেঁটে থাকেন, সে পথেও কি আমি চলিনি? সব প্রয়াস কি আমার বিফল হয়েছে? এখন আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই আমরা। আমি অভিযোগ জনতার কাছে পেশ করে রাখলাম। হৃদ্‌পিন্ডের রক্ত ক্ষরণের ফটোগ্রাফ রেখে গেলাম জবানবন্দীর ছত্রে ছত্রে। আশা রইল আগামী দিনের মানুষ নতুন মূল্যায়ণে বসবে।"৭২ এই প্রত্যাশা নিয়েই ১৯৬২ সালের ১৪ই জানুয়ারী বেলা ১২টায় অমরেন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেশ বিভাগের পর নিঃস্ব উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসা এবং কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে যখন তার সাহিত্যে পুণরাবির্ভাব ও অভিষেক ঘটে, তখন থেকেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নিপীড়িত জনগণের একজন হয়ে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পরেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, "অমরেন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। বিলম্বিত ব্যাধি আর অভাবের জ্বালা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এই মুক্তি তাঁর কাম্য ছিল না, বাংলা সাহিত্যেরও নয়। অমরেন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, আর একবার প্রমাণ করল বাংলাদেশের লেখকেরা কত অসহায়—কী নিদারুণ ভাবে তারা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার শিকার। প্রতিভার তুলনা করব না, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্য ভাবে তাঁর সাদৃশ্য আছে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই ব্যাধি আর দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন, কিন্তু হার মানেন নি। জনপ্রিয়তা এবং অর্থ সৌভাগ্যের প্রলোভন এড়িয়ে

লিখতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা, তাদের সংগ্রামের ইতিহাস, লিখেছেন প্রগতিশীল জনতার দুর্জয় পদক্ষেপের কাহিনী। সত্য নিষ্ঠায়, জীবন প্রতীতিতে এবং পরিণামে সকরুণ মৃত্যুর ঐক্য সূত্রে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের আত্মজন।"৭৩

অমরেন্দ্রর ৫৫ বছরের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাহিত্য সাধনারও প্রতিফলন ঘটেছে, তাঁর রচিত কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর কবিতা, গল্প ও উপন্যাস আলোচনার মাধ্যমে সেই সাধনার পরিচয় লাভে সচেষ্ট হবে।

টীকা

১. সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার, পৃষ্ঠা ২৪৫
২. India's Strugle for Freedom—Hirendra Nath Mukherjee, P. 263
৩. সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার। পৃষ্ঠা ২৪৬
৪. India To-day—R. Palme Dutt. Revised & Enlarged Edn. Published in India, 1947, Page—521
৫. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২২৩—২৪
৬. ঐ ২২৪
৭. ঐ ২২৪
৮. বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—অনিল বিশ্বাস। (১৯০১—১৯৫১) পৃষ্ঠা ৮
৯. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পৃষ্ঠা ১৩৬
১০. ঐ ১৩৯
১১. সূত্র: Femines in Bengal—Kali Charan Ghosh
১২. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৮৪—৮৫
১৩. ঐ ২১১
১৪. ঐ ২১১—১২
১৫. ঐ ২০১
১৬. ঐ ৭১
১৭. ঐ ২১২
১৮. ঐ ২১২
১৯. ঐ ২১৩
২০. ঐ ১০—১১

২১. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২২৯
২২. ঐ ২৩০
২৩. কল্লোল যুগ—অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৩৯—৪০
২৪. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৩০
২৫. ঐ ২৪০
২৬. ঐ ২৪২—৪৩
২৭. ঐ ২৪৩—৪৪
২৮. ঐ ২৪৪—৪৬
২৯. ঐ ২৪৬—৪৭
৩০. শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার। ২রা জুন, ১৯৮৪
** কালিদাস রায়, ডঃ কালিদাস নাগ ও মোহিতলাল মজুমদারের সুপারিশ ও আবেদন পত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

Kalidas Roy kabi Sekhar
Author & Literature

41/13, Russa Road,
Tollygunge, Calcutta
dated 30.8.1948

শ্রীমান অমরেন্দ্র নাথ ঘোষকে আমি ২৫ বৎসর ধরিয়া জানি। অমরেন্দ্র একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। আমার বিশ্বাস অমরেন্দ্র অনতি বিলম্বে প্রথমশ্রেনীর কথাসাহিত্যিক শ্রেনীতে স্থান পাইবে।

পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগ করিয়া এক প্রকার উদ্বাস্তু। সে সাহিত্য সাধনার উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে। তাহার মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অন্ন সংস্থান করা জাতীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

আমি তাহার নিরাশ্রয়তার দিকে দেশের কর্তৃপক্ষের সানুকম্প দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইতি—

স্বাঃ। শ্রী কালিদাস রায়

আমিও বন্ধুবর কালিদাস রায়ের অনুমোদন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বিপন্ন সাহিত্যিকের জীবনসমস্যা সমাঃ শিক্ষামন্ত্রীর সহানুভূতি দাবী করে।

স্বাঃ। শ্রী কালিদাস নাগ
কলিকাতা বিশ।
৩১। ৮। ৪৮

দুস্থ অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ একজন শক্তিমান সাহিত্যিক। তাহার এই বিপদে সাহায্য করা দেশের পক্ষ হইতে আমিও কর্ত্তব্য মনে করি।

৩১। ৮। ৪৮ স্বাঃ। শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

৩১. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২৫০
৩২. ঐ ২৫২
৩৩. ঐ ২৫২
৩৪. Amarendra Ghosh—Smt. Lila Roy, The Indian P. E. N.-April. 1950
৩৫. উপন্যাস সাহিত্যে অমরেন্দ্র ঘোষের নূতন সংযোজন—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। মধ্যবিত্ত : পূজা সংখ্যা, ১৩৫৯
৩৬. Bengali Literature To-day, A Survey 1947-50
৩৭. Contemporary Indian Literature, Sahitya Academy, 1950
৩৮. অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের চিঠি : ২৮শে পৌষ, ১৩৫৫
৩৯. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২৫৫
৪০. ঐ ১৮
৪১. ঐ ৪৭
৪২. ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক !
উদ্বাস্তু নরনারীর অবাঞ্ছিত শোভাযাত্রা
তোমাদের নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে,
দুর্ভাগা লক্ষ্মীছাড়াদের চিৎকারে তোমরা বিব্রত বোধ করো
আহা তোমাদের কী জ্বালা
আহা তোমাদের কী কষ্ট !

ওরা ক্ষুধিত ওরা লাঞ্ছিত ওদের মাথার ঠিক নেই
তাই ওরা তোমাদের মত অকপট দেশভক্তদেরও বলে :
সাম্রাজ্য বাদীর তল্পিদার
বলে ধনৈশ্চর্যবিলাসী জনশত্রু
সমাজতন্ত্রের মুখোশ-আঁটা চোগাচাপকানওয়ালা বেনিয়া !
ওরা ক্ষুধিত ওরা উন্মাদ ওরা লক্ষ্মীছাড়া
অধঃ পতিতদের হৃদয়বিদারক প্রলাপে কান দিও না !
ওরা বোঝে না তোমাদের সাত্বিকশাসনের মহিমা
বোঝে না ভবিষ্যৎবাণীর মাহাত্ম্য !

বিগত পঁচিশ বছর তোমরা ওদের আশ্বাস দিয়ে এসেছ
কিষাণ-মজদুররাজ কায়েম হবে
অতিলোভের বেইমানীতে তোমরা সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারোনি
অসত্যের অন্ধকারে মিশে গেছে তোমাদের সেই অগ্নিগর্ভ ঘোষণা

এক সিংহকে ভারত-ছাড়া করার ছলনায়
প্রতিষ্ঠা করেছ চার সিংহ
অশোক স্তম্ভের পৌরাণিক গাম্ভীর্যে,
তোমাদের রাজকীয় আড়ম্বরের কূটনৈতিক কুচকাওয়াজে
আসমুদ্র হিমাচল থরহরিকম্প !
ওরা মিথ্যা চ্যাঁচায় দাবী জানায় আওয়াজ তোলে
ওরা ভুল করে ! ওরা ক্ষুধিত ওদের মাথার ঠিক নেই
ওদের মামুলী কথায় কান দিও না।

দয়াকরে তোমরা বিনারক্তপাতে দেশ স্বাধীন করেছ
শত্রুমিত্রের পারস্পরিক দাক্ষিণ্যে।
ওরা বোঝে না তোমাদের রাজনীতি
বোঝে না তো সব হিন্দুস্তান পাকিস্তানের নারকীয় মানচিত্র
ওরা বলে কায়েমীস্বার্থের সাম্প্রদায়িকতা তোমাদেরই সৃষ্টি
নিরুপদ্রব বাঁটোয়ারার যূপকাষ্ঠে,
ওরা ক্ষুধিত ওদের জাতধর্ম নেই ওরাহতভাগা
ওদের ছোটকথায় কান দিও না !

তোমরা সময় চেয়েছ !
সময়।
শিশু রাষ্ট্রকে হাঁটতে শেখানোর সময় !
তবু ওরা বলে, রাম না জন্মাতেই রামায়ণ ?
যে শিশুর জন্মই হল না তার আবার হাঁটতে শেখা !
ওরা ক্ষুধিত ওরা অজ্ঞ ওদের তুচ্ছ কথায় কান দিওনা।
আহা তোমরা কত সুন্দর ! কত ভাল ! কী বড়লোক !
কী চমৎকার তোমাদের বক্তৃতার ভাষা
মার্জিত-সংযমের রোমাঞ্চকর আভিজাত্যে।
কত সহজে পেয়ে গেছ তোমরা আমলাতান্ত্রিক স্বাধীনতা
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের হুমকীতে
অহিংসায় অনশনে
আধ্যাত্মিক অসহযোগে
নিরুপদ্রব কারাবরণে
কত কষ্টে
আহা কতকষ্টে তোমরা লাভ করেছ

ইংরেজের এত সাধের বাণিজ্য তীর্থে প্রবেশাধিকার !
যে তীর্থে তোমরা ছিলে চণ্ডালের মত অস্পৃশ্য
যে তীর্থের অণু পরমাণু ক্ষুধার বিস্ফোরণ দিয়ে গড়া !
ওরা ক্ষুধিত ওদের মাথার ঠিক নেই।
অধঃপতিতদের ছোট কথায় কান দিও না।

ক্ষুধাকে তোমরা বে-আইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক,
হে দেশভক্ত মহানায়কেরা
তোমরা ভুল বুঝোনা এই কবিতাকে
যদি ব্যঙ্গ মনে হয় তবে সমস্ত ক্ষুধার জগতকে
ঝোলাও ফাঁসিকাঠে,
টেনে উপড়ে ফেল ক্ষুধিতদের রসনা,
গেঁথে ফেল সমস্ত ক্ষুধার কঙ্কাল
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কবরে।
(বিমলচন্দ্র ঘোষ। ক্ষুধা)

৪৩. জবানবন্দী ৫১
৪৪. ঐ ৫৫-৫৬
৪৫. দৈনিক বসুমতী ঃ ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৭
৪৬. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ৫৯
৪৭. ঐ ৬৪
৪৮. ঐ ১০২
৪৯. ঐ ১৫৭-৫৮
৫০. ঐ ১৮৯-৯০
৫১. Contemporary Indian Literature—Sahitya Academy 1950, P-30.
৫২. চারকাশেষ—কাজী আবদুল ওদুদ। সংকল্প ঃ১ম সখ্যা, ১৩৬১
৫৩. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪
৫৪. ঐ ২৬৫
৫৫. ঐ ৬
৫৬. শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার। ২রা জুন, ১৯৮৪
৫৭. জবানবন্দী ১৫৫-৫৬
৫৮. ঐ ১৫৭
৫৯. ঐ ১৬৩

৬০. জবানবন্দী ১৬৩
৬১. স্বাধীনতা : ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭
৬২. অতুল চন্দ্র গুপ্তের চিঠি।
৬৩. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি ১৪.২.১৯৫৪
৬৪. ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি ১৮.১.১৯৫৫
৬৫. প্রমথ নাথ বিশীর চিঠি ২২.২.১৯৫৫
৬৬. স্বাধীনতা : ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯
৬৭. শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার : ২রা জুন, ১৯৮৪
৬৮. ডায়েরী, ৮।২।১৯৫৯
৬৯. শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের কাছে সংরক্ষিত মূল আবেদন পত্র।
৭০ ঐ (মূল হিসাবের খাতা থেকে সংগৃহীত)
৭১ জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১২৮
৭২. ঐ ১৭২
৭৩. অমরেন্দ্র ঘোষ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমীপেষু : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৮

তৃতীয় অধ্যায়

কবিতা

বাংলা সাহিত্যে অমরেন্দ্র ঘোষের খ্যাতি তাঁর গল্প-উপন্যাসের জন্য। আসলে অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব তাঁর কবিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'শ্মশানে বসন্ত' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের বৈশাখে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। ঐ একই বছরে 'বঙ্গবাণী'র ভাদ্র সংখ্যায় দ্বিতীয় কবিতা 'মরুভূমি' প্রকাশিত হবার দু-একদিন পরেই 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হল অমরেন্দ্রর প্রথম গল্প 'কলের নৌকা'। একেবারে প্রথম দিকেই 'বঙ্গবাণী,' 'কল্লোল', 'ধূপছায়া', 'প্রবাসী' 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকায় কিছু কবিতা ও গল্প লিখে অমরেন্দ্র সাহিত্য জগৎ থেকে গেলেন অজ্ঞাত বাসে।

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা বয়সকালে দু চার পংক্তি কবিতা লেখেন নি এমন দৃষ্টান্ত বুঝি বিরল। সরস, শ্যামল নদী-মৃত্তিকার দেশে সত্যিই এ ঘটনা কিছু বিচিত্র নয়। যৌবনের দূত যে বাণী বহন করে আনে—মনের গহন যার অনুরণনে উদ্বেল হয়ে ওঠে অহরহ—একমাত্র কবিতার সূক্ষ্ম প্রতিধ্বনিতেই তার প্রকাশ স্বাভাবিক। কাব্য তাই যৌবণের দূত। অথচ প্রাত্যহিক জীবন-মঞ্চের রূঢ় কর্কশ দৃশ্য মানুষের সে স্বপ্নানুভূতিকে নিয়তই ব্যঙ্গ করে চলেছে, কঠোর গদ্যময় জীবনের হাতুড়ির আঘাতে কবিতার অপমৃত্যু ঘটেছে। এ সবকিছু প্রতিকূলতার ঝড়কে উপেক্ষা করে—তবুও কিছু কবিপ্রাণ স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে বেঁচে থাকেই। বর্তমানের অনেক প্রতিষ্ঠাবান সাহিতাকের জীবন অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যাবে—তাঁদের মানসভূমি কাব্য-রস ধারায় সিক্ত।[১] আর কবিমনের সজীবতাই তাঁদের উত্তরকালের সার্থক সাহিত্য সাধকের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে। অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য-মানস অনুসন্ধানকালেও এ ছবির ব্যতিক্রম নজরে পড়ে না। তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব—কবিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।

অমরেন্দ্র ঘোষের কবিতা রচনার কাল পর্ব মোটামুটিভাবে তেরশ একত্রিশ বত্রিশ সাল। বাংলা সাহিত্যে সে সময় রোমান্টিক যুগ এবং কাব্যের আদর্শ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে অমরেন্দ্র ঘোষ বলেছেন,

''রবীন্দ্রনাথ আমার ভাব-গুরু। এই সময় তাঁর 'শিশু' কবিতার বইখানা আমার হাতে আসে। মনে হয়, এমন কবিতা বুঝি আমিও লিখতে

পারি। একলব্যের মত দ্রোণাচার্যকে ধ্যান করতে লাগলাম। ভিতরে ভিতরে প্রেরণা বহ্নিমান হয়ে উঠল। বসে গেলাম কাগজ কলম নিয়ে। দেখলাম মহৎ কথা সহজ কথায় লেখা বড় সুকঠিন, তখন আবার ছন্দমিলভির যুগ। রাতারাতি প্রতিভা হওয়া অসম্ভব। কবিতা লিখতে হলে তার ব্যাকরণ জানা চাই। কিন্তু কার কাছে শিখি?"

"রবীন্দ্রনাথ মধ্যমণি, তাঁর চারপাশে অনেক গ্রহ উপগ্রহ। অচিন্ত্য বুদ্ধ প্রেমেন ঘুরছে পাশাপাশি, নজরুল জিঞ্জির বাজাচ্ছে খানিকটা দূরে, কখনো বিপ্লবী, কখনো বুলবুল। মোহিতলাল আছেন সদম্ভে। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিপূর্বে ব্যস্ত ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর আছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নবাগত দুঃখবাদী বটেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষুরে শান পালিশ। অনেক কথা, অনেক কবিতা লিখে জীবনানন্দ যা করতে না পেরেছেন, শ্রীসেনগুপ্ত ইত্যমধ্যেই তা করেছেন। যতীন বাগচি, করুনানিধান, কুমুদ মল্লিক তখন উল্লেখযোগ্য।"২ আবার এক জায়গায় বলেছেন, "শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল না, রবীন্দ্রনাথকে দেখা হল না, সুযোগ হল না কবিতা লেখার ব্যাকরণ শেখার। আবার সাধনায় বসলাম ভাব-গুরুর ছবি মনে এঁকে। এবার কিছু কবিতা লেখা হল।"৩ অমরেন্দ্র ঘোষের কাব্য জীবনের অংকুরোদগম সেই থেকেই। রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করেও সে যুগে 'কল্লোল" অবলম্বন করে নতুন প্রাণ চেতনার কলোচ্ছ্বাসে কাব্য সাহিত্য ধারার নতুন স্রোতমুখ অন্বেষণের অভীপ্সা দেখা দিয়েছিল। শ্মশান, কারখানা, বস্তি, শকুন অথবা মজুরের চিন্তা তখনও কাব্য চেতনায় অস্পৃশ্য ছিল। 'কল্লোলে'র নবীনেরা এই অপাংক্তেয়দের নিয়েই সাধনা সুরু করলেন। সে সময়ে অমরেন্দ্র ঘোষের কাব্য রচনার মূলেও এ চিন্তা কাজ করেছে। তাঁর 'শ্মশানে বসন্ত', 'আধুনিক কবি', 'বেকার' ও 'যন্ত্রশালা' কবিতায় তারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

অমরেন্দ্র ঘোষের প্রথম কবিতা 'শ্মশানের বসন্ত' ১৩৩৪ এর বৈশাখে 'বঙ্গবাণী' সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হয়। এই কবিতা রচনার আগে ছাত্রাবস্থায় অমরেন্দ্র অচিন্ত্য সেনগুপ্তের বাড়ি যান। এবং তাঁর কাছেই শেখেন কবিতার ব্যাকরণ। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "অচিন্ত্যই আমাকে ছন্দের তালমাত্রা শিখিয়ে দিলেন। শুধু কবিতার নয়, গদ্যের।"৪ তাঁর মোট কবি ভার সংখ্যা হল ৩৬।৫

তাঁর প্রথম কবিতা 'শ্মশানে বসন্ত' এর প্রথম চরণ দুটি হল—
তিনি শুধু কাননে নয় শ্মশানেও বসন্ত দেখে আনন্দ উপভোগ করেন। কবি এই রসজ্ঞের দৃষ্টিতে শ্মশান দেখছেন—

> মাটির তলায় মরার মাথায় উছলে মহুয়া সুরা
> শ্মশানে আজিকে দখিনা এসেছে, ফুর্তি চলেছে পুরা।"৬

'আধুনিক কবি'র সুরুতেই কবি বলেছেন—

সহরের বুকে খোলা খাপরার
বস্তিতে তব ঠাঁই
দুয়ারের ধারে মরা বেলগাছ
কদম্ব তরু নাই।
উঁচু বাড়ীগুলি শকুনের মত
মেলিয়া রেখেছে ডানা
সারা দিনমান আলো নাহি পাও
শুধু ছায়া একটানা।

বস্তির জীবনযাত্রা বর্ণনা করতে গিয়ে, সু-উচ্চ অট্টালিকার প্রসারিত কার্নিসের সংগে শকুনের ডানার কল্পনা কিংবা,

বাস্তব যার নিছক সত্য
তাহা কি গো অপরূপ ?
প্রাণপাত্রে কি তাই তারি লাগি
জ্বলে কামনার ধূপ ?
কোটি মজুরের কঙ্কালে আজ
গড়িবে কি নব পথ—
ঘর ঘর করি ঘুরে যাবে চাকা
আসিবে বিজয় রথ !
হে কঙ্কাল কবি বাস্তব যদি
হয় তব এত প্রিয়
ক্ষুধাতুর তব আত্মারে মোর
এ প্রণাম জানাইও।

সে যুগের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে রীতিমত দুঃসাহসের কাজ।
'বেকার' কবিতার—

হয়ত তখন চিমনী শিখরে দেখা দেবে প্রেত-পাংশু শশী
তুমিও নীরব জগৎ নীরব, বিধুরা অষ্টাদশী।

পংক্তি দুটি চিত্র কল্পনার সুন্দর নজির হিসেবে তুলে ধরা যায়। যে চোখ দিয়ে পৃথিবীকে তিনি দেখেছেন—মানুষের কান্না হাসির পালার শরিক হয়েছেন, রচনার ইমারতে সেই অভিজ্ঞতার মাল মসলার প্রয়োগই তিনি বারে বারে ঘটিয়েছেন। পড়ো যুগের মাঝে দিন বদলের পালার অমোঘ রূপটি, তাঁর মনের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

১৩৩৫ সালে রচিত 'যন্ত্রশালা' কবিতায় তাই তিনি সভ্যতাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন—

হে বিরাট!
ওই তব পরিখার পারে
বিষ-বহ্নি প্রজ্বলিত লক্ষ লক্ষ চুল্লির কিনারে
যুগে যুগে জন্মিয়াছে কত সাহিত্যিক
সাম্যবাদী বৃদ্ধ দার্শনিক,
বিশ্বের বেদনা বোধে ব্যথা যার হয়েছে মৌলিক!
অতি তুচ্ছ লৌহতারে
আকাশের বিদ্যুৎ শিখরে
বাঁধি আনি করিয়াছ সে চিন্তার দূতী—
নব নব তীক্ষ্ণ অনুভূতি
দিকে দিকে মুহূর্তে ছড়ালে,
যে অমৃত গুপ্ত ছিল ওই তব বক্ষের আড়ালে।
... ...
নিখিলের সভ্যতার ওগো অগ্রদূত!
বর্বর বিশ্বেরে তুমি পরাইলে বসন অদ্ভুত।
নূতন সম্বিত দিলে, দিলে আত্মবোধ
দুর্বার বন্যার বেগে আর তার কে করিবে রোধ ?৭

অমরেন্দ্র ঘোষের কাব্য রচনার সেই মৌলিক সুরের সংগে পরিচয় থাকলে তাঁর পরবর্তী জীবনে গল্পকার, ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় উত্তরণের ইতিহাস পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বিশ্বাস করেন সব কিছু মতবাদের ঊর্দ্ধে 'হিউম্যানিটি', আর কবি সাহিত্যিকের সমস্ত তপস্যার ফল— 'হিউম্যানিজম্' সেই 'হিউম্যানিজমে'র স্বপক্ষে তাঁর কলম ধরা। যেখানেই তিনি দেখেছেন বৈষম্য ও পীড়ন, সেখানেই তিনি হয়ে পড়েছেন দুর্দম ও অনমনীয় এবং তাঁর লেখনী হয়েছে অনলবর্ষী। সে জন্য প্রয়োজন হল আরও বড় ক্যানভাসের তাই কাব্য স্রোতস্বিনীর তীর ভূমি ছেড়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন—উদ্দাম-উত্তাল পদ্মা মেঘনার কূলে। সৃষ্টি আর ধ্বংসের জীবন ও মৃত্যুর, হতাশা এবং সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মীলিত হতে লাগল তাঁর গল্প, উপন্যাসে।

টীকা

১. অমরেন্দ্র ঘোষের আগে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(১৯০১), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮) ও নরেন্দ্র নাথ মিত্র (১৯১৬)—প্রত্যেকে কবিতা লিখেই সাহিত্য জীবন সুরু করেছেন।

২. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১১৯-২০

৩. ঐ ১২২

৪. ঐ ১২৪

৫. অমরেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের কাছে সযত্নে সংরক্ষিত লেখকের বিভিন্ন রচনার অনুলিপি থেকে ৩৬টি কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। শ্রীমতী ঘোষের অভিমত কবিতার সংখ্যা পঞ্চাশেরও অধিক। কিন্তু বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন সময়ে খোয়া যাওয়ায়, সে গুলি পরবর্তী কালে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৬. মানসী ও মর্মবাণী :আষাঢ়, ১৩৩৫

৭. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২১০—১১

চতুর্থ অধ্যায়

ছোটগল্পে মানবতাবোধ

'কুসুমের স্মৃতি' ও 'স্বনির্বাচিত'

অমরেন্দ্র ঘোষ ত্রিশ দশকের বাংলা ছোটগল্পের এক আশ্চর্য শক্তিমান লেখক। তাঁর প্রথম গল্প 'কলের নৌকা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'কল্লোল' এর পাতায়। তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্য জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, "কল্লোলে অনেক লেখকই ক্ষণদ্যুতি প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম।···· দেখি সে গল্প লেখে। এবং যেটা সব চেয়ে চোখে পড়ার মত—বস্তু আর ভঙ্গি দুই-ই অগতানুগ। খুশি হয়ে তার কলের নৌকা ভাসিয়ে দিলাম কল্লোলে··।"১ গল্পটি অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় 'অগতানুগ' ঠিকই, কারণ তখনও মুসলমান নায়ক নায়িকাকে উপজীব্য করে কোন লেখার কল্পনা হয় নি। অমরেন্দ্রই প্রথম 'কলের নৌকা'র রহিমকে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নতুন আল্পনা আঁকার রীতি প্রবর্তন করালেন।

অমরেন্দ্রর প্রথম গল্পটি যদিও সেণ্টিমেণ্টাল এবং রোমাণ্টিক আবেগে পূর্ণ, তথাপি তাঁর নিজের জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাসে আসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পটি একটু বিস্তারিত আলোচনা করলেই, বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট হবে। গল্পটির সূচনা হয়েছে, "মা মারা গেল আগে, তারপর বাপ। যাবার সময় রেখে গেল দুশ টাকার দেনা আর তাই শোধ দেবার জন্য একখানা কুড়োল। তাই সে তার বাপের মতই দিন-মজুর।" অমরেন্দ্রর প্রথম গল্পেই নিঃসহায়, নিঃসম্বল, বংশ পরম্পরায় দিন মজুর শ্রেণী বিষয়বস্তু হয়ে সাহিত্যের সারস্বত মন্দিরের আঙিনায় এসে সমবেত হল। সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অমরেন্দ্রর এটি বিরল কৃতিত্ব। গল্পের মূল চরিত্র রহিম নামে এক মুসলমান দিন-মজুর। সংসারে তার আপনজন বলতে একমাত্র বহিন ছাড়া আর কেউ নেই। সারাদিন পরের বাড়িতে খেটে রহিম কোনমতে চালায়। কয়েক মাসের মধ্যে বাপের দেনা শোধ করতে না পারলে ভিটেমাটি সব চলে যাবে। তাই বাপের দেনা শোধ করার জন্য রহিম দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। দুলালী যখন তাকে একটু জিরিয়ে নিতে বলে, তখন বহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রহিমের বুকটা হা-হা-কার করে ওঠে। "দুশ টাকার জন্যই ত রোদ বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ওকে খাটতে হচ্ছে, বহিনের মুখটিও ওর

ভাবনাতেই শুকনো। চান করবার সময় তার একফোঁটা তেল পর্যন্ত জোটে না, লম্বা লম্বা চুলগুলিতে জট বাধবার জোগাড় হয়েছে।" এরই মাঝে এসে দাঁড়াল ফিরোজা। প্রতিবেশী মোড়লের মেয়ে। দুলালীর সই—রহিমের চোখে সে স্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। শৈশবের স্মৃতি থেকে রহিম একটি কল বসানো নৌকা তৈরী করতে আরম্ভ করল। তার আশা-সেই নৌকা সে ভাল দামে বিক্রী করতে পারবে, আর তা দিয়েই দেনা শোধ করে ফিরোজাকে সাদী করবে। ইতিমধ্যে কলের নৌকা তৈরী হোল, কিন্তু ভিটে মাটিও চলে গেল। দুলালীকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে—সে চলল সহরে। ইতিমধ্যে ফিরোজা অসুস্থ হল। "দুদিন বাদে রহিম শহর থেকে তার নৌকাটা নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে এসে ঠিক জ্বরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মত কম্পিত হস্তে নোঙর ফেলল। নৌকাটা কেউ নিল না। রহিমের প্রাণের গভীরতম ব্যথা কেউ একবার টেরও পেল না। বেশী চাল ধরে না, তিনজনার বেশী মানুষ ধরে না, তাই বোধহয় কারুর পছন্দ হলো না, সবাই ঘৃণার চক্ষে চেয়ে তার নবীন উদ্যম ব্যর্থ করে দিল।" এদিকে দুলালীর মুখে ফিরোজার মৃত্যু সংবাদ শুনে রহিম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে একটা প্রাণহীন বরফের পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। তারপর ডালিম ফুল দিয়ে ভাই বহিনে কবরটা সাজিয়ে ফিরোজার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল, কেউ কিছু কথা বল্লে না। অবশেষে রহিম দুলালীর হাত ধরে নদীর ধারে গিয়ে নৌকার নোঙরটা তুলে গলুইয়ের ওপরে রাখল, নৌকাটা ঠেলে দিয়ে ধীরে ধীরে বল্লে—"আমি এসেছি, তুমি ফিরে এসো, নাও পাঠালাম।" এই হল সংক্ষেপে কাহিনী।

আগেই বলেছি এই গল্প অমরেন্দ্রর নিজের জীবন ও সাহিত্যের ইতিহাসে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা 'কলের নৌকা'র রহিমই পরবর্তীকালে 'কাশেম' রূপে আবির্ভূত হয়েছে পূর্ব বাংলার আরও বৃহৎ পটভূমির আলেখ্য 'চরকাশেম' উপন্যাসে। তাৎপর্যের অপরদিক হল কল্লোল যুগে অমরেন্দ্র যে নাও পাঠিয়েছিলেন প্রায় দুই যুগ পরে সেই নায়ে চড়েই অমরেন্দ্র আবার সাহিত্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা প্রাক্ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগের পূর্ব বাংলার এক প্রত্যন্ত প্রদেশে—যেখানে ডাক বিলি হয় সপ্তাহে একদিন, নদী নালা বিল ঝিলে বিচ্ছিন্ন যে দেশ, বার মাস নৌকা ছাড়া গতি নেই, যে দিকে নজর যায় জলে থৈ থৈ। সে এক নতুন পৃথিবী। বাংলা সাহিত্যের ভূগোলে যে পৃথিবীর রূপ সংযোজনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পথিক সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানের নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের এমন সামগ্রিক প্রতিরূপ মাণিক অথবা পরবর্তী অন্য কোন লেখক এমন কি কোন মুসলমান লেখকের লেখাতেও সে চিত্র বোধহয় এতখানি উজ্জ্বলতা নিয়ে অনুপস্থিত—যেমনটি অমরেন্দ্রর 'চরকাশেমে' প্রতিফলিত হয়েছে। অমরেন্দ্রর প্রথম গল্পেই সেই সম্ভাবনার বলিষ্ঠ ইংগিত লক্ষণীয়।

অমরেন্দ্রর স্ত্রী শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের কাছে সংরক্ষিত তাঁর বিভিন্ন রচনা ও পাণ্ডুলিপি থেকে ছোটগল্পের সংখ্যা পাওয়া গেছে ১২৯।২ কিন্তু শ্রীমতী ঘোষের হিসাব অনুযায়ী গল্পের সংখ্যা দেড় শতাধিক। তাঁর অভিমত, "লেখকের মৃত্যুর পর বহু সাহিত্য পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত গল্প মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে সেগুলি আর সময়মত ফেরৎ না আসায়, বহু গল্প এইভাবে খোয়া যায়।"৩ অমরেন্দ্রর এই গল্পগুলি কল্লোল, প্রগতি, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, মাসিক বসুমতী, দৈনিক বসুমতী, পরিচয়, গল্পভারতী, তরুণের স্বপ্ন, নববাণী, বৈশাখী, ব্রতী, কথাসাহিত্য, অমৃত, চতুষ্কোণ, কথাবার্তা, বসুধারা, মধ্যবিত্ত, বাঙলা, বিবর্তন, প্রবাহ, নয়া দমদম, উল্টোরথ, স্বাধীনতা, সত্যযুগ, আনন্দবাজার, যুগান্তর—প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। অমরেন্দ্রর জীবদ্দশায় 'কুসুমের স্মৃতি' ও 'স্ব নির্বাচিত গল্প' (ছোটদের জন্য)—এই দুটি গ্রন্থই কেবল প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর আজ পর্যন্ত আর কোন গল্প গ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি।

'কুসুমের স্মৃতি' মোট এগারটি গল্পের সংকলন। এতে আছে—কুসুমের স্মৃতি, বাঁদী, সারেঙ্গির সুর, ভেজাল, একটুখানি নুন, ফেরারী, কসাই, বনলতা সোম, সূর্যমুখীর মৃত্যু, একটি স্মরণীয় রাত্রি ও কল্যাণ স্বাক্ষর। এই গল্পগুলি আলোচহার আগে অমরেন্দ্র কিভাবে গল্প লেখার টেকনিক আয়ত্ব করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি জানা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমার ভাবগুরু, শরৎচন্দ্র গল্পের গুরু—বাকী গুরু যাঁরা আমায় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছেন। এ পৃথিবীর চরণপ্রান্তে আমি শিষ্য প্রণতি জানাই। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমি যেন শিখে যেতে পারি। জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে এখনো তো নুড়ি কুড়ানও সুরু করিনি।"৪

এবার টেকনিকের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "মানিক, সুবোধ ঘোষ, নারায়নের কিছু কিছু বাছাই গল্প পড়েছি, এঁদের ঐশ্বর্যে উত্তেজনা জন্মে, কিন্তু ছোটগল্প ছোট করে বলার টেকনিক আমার আয়ত্বে নেই। অর্ধাহারে কঠোর সংকল্প নিয়ে সাধনায় বসে গেলাম। বার বার লিখলাম, বাতিল করেও দিলাম বারবার নিষ্ঠুর হাতে। বছর তিনেক লিখতে লিখতে নতুন টেকনিক আয়ত্ত করলাম। ক্রমে ক্রমে জলের মত সরল হয়ে এলো প্রয়োগ প্রদ্ধতি।...তথ্য ও তত্ত্ব তো আমার নিজেরই রয়েছে প্রচুর...নতুন নতুন প্রযুক্তি আহরণ করেছি, আর আমার চিন্তার কিছু নেই। উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে আজো গল্প লিখি।"৫

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ বিভাগ ও তার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিরাশ্রয় হয়ে পশ্চিমবাংলায় আগমন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক নিদারুণ সমস্যা। এই সমস্যার পটভূমিতে সমসাময়িক জীবনের নানা সংকট ও সমস্যা

'কুসুমের স্মৃতি'র গল্পগুলিতে যেমন রূপ পেয়েছে, তেমনি চিরন্তন মানুষের আনন্দ বেদনার সুরও পদে পদে ধ্বনিত হয়েছে। প্রথম গল্প 'কুসুমের স্মৃতি'তে জমিদার সোমেশ্বর শুধু অত্যাচারী জমিদারই নয়, যুদ্ধের বাজারে ব্ল্যাক মার্কেটিং করে প্রচুর পয়সা অর্জন করেছে, অবশেষে বার্ধক্যে এসে যৌবনের স্বপ্ন যুবতী স্ত্রী কুসুম কুমারীর স্বপ্ন ফুলবাগিচা তৈরী করতে গিয়ে—তাঁর প্রজাদের ওপর শুধু খাজনা আদায়ের জুলুমই হল না, ওদের বসতবাটির জমি থেকে লেঠেল দিয়ে উচ্ছেদ করে—সে জমি দখল নেওয়া হল ফুলবাগিচার জন্য। "কুসুমের স্মৃতি' অত্যাচারী জমিদারের প্রিয়া স্মৃতি বিলাসের কাহিনী। নির্মম বাস্তবতায় কাহিনীটিকে তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'জলসাঘর'-এর জবাব বলা যেতে পারে'' ।৬

'বাঁদী' গল্পটিতে দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসলমান জমিদার সুলেমান এক বর্ষার দিনে একখানা আটমাল্লাই পানসীতে চড়ে সপ্তম পক্ষের তরুণী বিবি এবং আমিনানামে এক বাঁদীকে নিয়ে চলেছেন। এই বাঁদীর কাজ হল বিবি ও সাহেবের তদ্বির তদারক করা। ''আমিনা সবে মাত্র উনিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও কৌমার্য তার অক্ষত।'' ওরা বংশ পরম্পরায় বাঁদী। রাত্রে পানসীতে ডাকাত পড়ে। ডাকাতরা সুলেমানের কাছে অর্থ, গহনা এবং তাঁর তরুণী বিবিকে দাবী করে। সুলেমান মুখোস পরা ডাকাত সর্দারের হাতে টাকা, গহনা এবং মুখে কাপড় পরা বিবিকে তুলে দেয়। ডাকাত সর্দার দূরে গিয়ে জানতে পারে সুলেমান তাদের ঠকিয়েছে। বিবি বলে যাকে সর্দারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, আসলে সে জমিদারের বাঁদী আমিনা। এই ডাকাত সর্দারিই হল সুলেমানের শোষিত অত্যাচারির গরীব প্রজা রমজান। অবশেষে আমিনার ঐকান্তিক চেষ্টায় বহুদূরের সমুদ্রের জেগে ওঠা চরে ওরা মহব্বৎ ও মেহেদী হয়ে ঘর বাঁধে। এই গল্পে একটি অসহায় নারীকে কেন্দ্র করে জমিদার সুলেমানের ও গ্রামের ডাকাতের যে তুলনামূলক চিত্র অমরেন্দ্র এঁকেছেন তাতে নিঃসন্দেহে তিনি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। নীচুতলার জীবনের প্রতি শুধু মমত্ব নয়, একটি আশ্চর্য সম্ভ্রম নিয়েই অমরেন্দ্র গল্পটি লিখেছেন।

'ভেজাল' গল্পটি বাংলার গ্রাম্য জীবনের দুর্নীতি ও দারিদ্রের একটি চমৎকার ছবি। 'একটুখানি নুন', 'কসাই' গল্প দুটিতে এ কালের সমাজের দুঃখ দৈন্যের পুঁজি ভাঙ্গিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যেভাবে লাভের কড়ি কুড়াচ্ছে তাদের সেই হীনতার উপর তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে। 'একটুখানি নুন' গল্পটি সম্পর্কে অমরেন্দ্র লিখেছেন, ''প্রথম জীবনে শুধু মাত্র পাঁচটি টাকা পেলাম প্রবাসীতে 'একটু খানি নুন' গল্প লিখে।''৭ গল্পটিতে এক নিষ্ঠুর পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে নায়িকা মালতী—একালের ফুল্লরাও বলা যেতে পারে। আকালের সময়ে নুন চলে গেছে কালোবাজারে। নগদে কেনার

পয়সা নেই। ঘরে অসুস্থ বাপ, আর মা মরা কচি ভাই সন্তু। আলুনি বালি আর ভাত খাওয়াতে হবে এদের দুজনকে পল্লীর এই স্নেহশীলা পল্লীজননীর। অবুঝ ভাইকে বোঝানোর জন্য একটা যুক্তি খাড়া করে মালতী বলে—"আজ যে তোমায় নুন খেতে দিইনি তাকি জান না—আজ নুন সাগরের পুজো, কারুকে নুন খেতে নেই।" আর সেই যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে "বৃদ্ধের চোখের ধারায় আলুনি বালি লোনা হয়ে ওঠে।" আমাদের প্রশ্ন জাগে, এবার সন্তু কি করবে? এ গল্পের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল সংহতি আর সারল্য। কি কাঠামো বিন্যাসে, কি পরিবেশ রচনায়, কি চরিত্র প্রক্ষেপণে, কিংবা সংলাপ লিখনে সর্বত্রই ঐ সংহতি আর সারল্যের হদিশ পাওয়া যায়। এই সংহতি ও সারল্যের গুণেই গল্পটি একদিক দিয়ে যেমন একটি বিশেষ কালের তথ্য হয়ে থাকে, অপরদিকে তেমনি চিরকালের একটি মানব সত্যকেও ছুঁয়ে যায়।

'কসাই' গল্পটি একটি অসাধারণ গল্প। জন্ম থেকেই গোলামী করেছে কুট্টি। কিন্তু এবার সে স্বাধীন হবে গোলামীর শৃঙ্খল ভেঙে। সে পুরুষ মানুষ পরিশ্রম করে জোগাবে খাদ্য। তাই জীবিকার তাগিদে সে হয়েছে কসাই। কিস্তিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করে মাংসের দোকান খুলে সেজেছে কসাই। এ গল্প সম্পর্কে অমরেন্দ্র নিজেই বলেছেন, "'কসাই' গল্পটা পড়লাম, মোহিতলাল শুনলেন স্থির গম্ভীর হয়ে। বললেন, এমন গল্প কী কেউ লেখে? ছিঃ ছিঃ! ধন্য হয়ে ফিরে এলাম। ঠিক করে নিলাম, মোহিতলালের তিরস্কার প্রগতিশীল চিন্তাধারার পুরস্কার। পাণ্ডিত্যের কংস কারাগারে এ যুগের ভগবান বন্দী ছিল। রণজিৎ কুমার সেন সেই গল্পটি বঙ্গশ্রীতে ছেপে আমাকে আরো উৎসাহিত করলেন। বুঝলাম শ্রীসেনের দৃষ্টি সেকালকে ছাড়িয়ে একালের দুঃখজর্জর পৃথিবীতে নেমে এসেছে।"৮

'বনলতা সোম' গল্পে কাব্যময় রসকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে এবং গল্পে নতুন আঙ্গিক রচনার নিদর্শন হিসেবে 'সূর্যমুখীর মৃত্যু' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "টেকনিক এবং সংলাপের নিপুণ কারুকর্ম এবং পরিবেশনের হৃদ্যতার গুণে 'কুসুমের স্মৃতি'র গল্পগুলি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। লেখকের ভাষা অতি মনোরম।"৯ অমরেন্দ্রর গল্পের শেষ কথা হল—মাটির মানুষের কাহিনী হৃদয়ের রসে জরিয়ে মানুষের জন্য লিখে যাওয়া।

'স্বনির্বাচিত গল্প' (ছোটদের জন্য) পুস্তকাকারে প্রকাশিত অমরেন্দ্রর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। এই সংকলনে-পোড়ো বাড়ীর ছেলে, জন্মদিন, মা, কালশত্রু, মেনকা মালিনী, দাঙ্গা ও জবাব—মোট সাতটি গল্প আছে। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে অমরেন্দ্র জানিয়েছেন, "এই বইয়ের কয়েকটি রচনা আমার কিশোর বয়সের রচনা। 'জবাব' আমার জীবনের দ্বিতীয় ছাপা গল্প। 'কল্লোলে' বেরিয়েছিল 'মুশাফির' নামে ১৩৩৪ সনে।" এখানে অমরেন্দ্রর পরিবেশিত তথ্যে ভুল

রয়ে গেছে। 'মুশাফির' তাঁর দ্বিতীয় গল্প ঠিকই, কিন্তু 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সাল নয়, ১৩৩৫ সালের আষাঢ় সংখ্যায়।

আমরা এখানে অমরেন্দ্রর দ্বিতীয় গল্প 'মুসাফির' থেকেই আলোচনা সুরু করবো। বর্তমান গ্রন্থে তিনি নিজেই এই গল্পের নাম পরিবর্তন করে 'জবাব' রেখেছেন এবং বলেছেন "মূল রচনা ঠিক রেখে একটু কলম চালিয়ে দিয়েছি মাত্র।" গল্পের বিষয়বস্তু হল—ইংরেজ আমলে বোমার মামলার আসামী অশোক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অশোক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় আর বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বাবলম্বী ও ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে গড়ে তোলে। তারপর একদিন নিজের গ্রামে ফিরে এসে দেখে বন্যায় গোটা গ্রামটা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সেই স্বজন হারানো শ্মশানে দাঁড়িয়েই অশোক স্বাধীন ও সুখী ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখে।

কিশোর বয়সের রচনা হলেও – এই বয়সেই ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তির স্বপ্ন তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রিফিউজিদের খাদ্য বস্ত্র. সরকারী সাহায্য, পুলিশী জুলুম বন্ধের দাবীতে উদ্বাস্তুদের আন্দোলনের ছবি আছে 'পোড়ো বাড়ির ছেলে' গল্পে। 'জন্মদিন', 'মা' গল্পদুটিতে আছে কিশোর বয়সের এক মিষ্টিমধুর ঘরোয়া ছবি। কিন্তু 'কালশত্রু', 'মেনকামালিনী' ও 'দাঙ্গা' গল্পে কিশোর অমরেন্দ্রর তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'কালশত্রু' গল্পে এক মৎস্যজীবি পরিবারের কথা বলা হয়েছে। "রতনের বাপ মৎস্যজীবী। ক বছর ধরে সব ব্যবসাই বড় মন্দা। এ অঞ্চলে তবু মাছের কারবারটা ছিল ভালই, চলতও বেশ। হঠাৎ কজন নাপিত ক্ষুর রেখে সুড় সুড় করে ঢুকল মাছের এই চালানি কাজে। এল ধোপা, তারপর ব্রাহ্মণ, অবশেষে শূদ্র বৈশ্য সাহা তিলি কেউ বাদ রইল না। প্রতিযোগিতা চলল ভীষণ। অনেক গরিব জেলে অভিমানে জাত ব্যবসায় ইস্তফা দিয়ে ধরল নৈশ ব্যবসা। ফলে, কেউ বা গেল জেলে, কেউ বা জঙ্গলে। শেষ পর্যন্ত ফেরার হওয়া ছাড়া আর তাদের গত্যন্তর রইল না।" এই বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক এমন সব শ্রেণীকে হাজির করেছেন গল্পে, সাহিত্য জগতে এতদিন তাদের কোন প্রবেশাধিকারই ছিল না। অমরেন্দ্রই তাদের হাত ধরে নিয়ে এসেছেন। কিশোর বয়সে অমরেন্দ্রর এ এক বিরল কৃতিত্ব।

'মেনকা মালিনী'র "মেনকা এক গৃহস্থ ভুঁইমালীর মেয়ে, দেশ বাঁটোয়ারার বিপর্যয়ে সে এসে পড়েছে এই সহরে। অনেক রকম রোগে ভুগে ভর্তি হল হাসপাতালে। অল্পতেই তার রোগ সারে। হাসপাতালে পায় রাজসিক চিকিৎসা। খালাস পেয়ে যখন পথে এসে দাঁড়াল তখন সে ভিখারীর চাইতেও অধম।" তারপর তার আশ্রয়স্থল হয় ফুটপাথ। এই ফুটপাথে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম কাহিনী অমরেন্দ্রর সহানুভূতিশীল কলমে মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

'দাঙ্গা' গল্পে অমরেন্দ্রর পরিণত শিল্প নৈপুণ্যের আশ্চর্য স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। "উনিশ শ পঞ্চাশের একটি মর্মান্তিক রাত্রি। ইতিহাসের পাতা থেকে দাগ মুছবে না হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার"—ইতিহাসের এমন একটি নির্মম সত্য উচ্চারণের মধ্যেই এ গল্পের সূচনা। এ দাঙ্গার জন্য ওপর তলার হিন্দু মুসলিম নেতারা দায়ী হলেও নিচের তলায় এই উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য ছিল লৌহদৃঢ় ইস্পাতের মতন কঠিন। তারা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে, হাত ধরাধরি করে একই সঙ্গে পা ফেলে হেঁটেছে। তাদের সে যাত্রা পথে জাত ধর্মের কোন গোঁড়ামি ছিল না। তারা তো সবাই একটাই জাত সে জাত মানুষ। আমিনা, মল্লিকা, বিজয়, গৌর—আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, কেরামত আলী—জাত ধর্মের গন্ডী অতিক্রম করে হিউম্যানিস্ট রূপেই ফুটে উঠেছে।

'কুসুমের স্মৃতি' ও 'স্বনির্বাচিত গল্পে' যার সূচনা তাই ক্রমশঃ পরিণত শিল্প কর্মের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। আমরা অমরেন্দ্রর সেই পরিণত গল্প-সমূহের আলোচনার দিকেই দৃষ্টি নিয়ে যাবো। সে আলোচনাকালে অমরেন্দ্রর বাকী গল্পগুলিকে বিষয় অনুসারে-মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পার্টিশান, উদ্বাস্তু জীবন এবং মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম-শ্রেণী বিন্যাস করে আলোচনা করলে গল্পগুলির মধ্যেকার মানবতা বোধ অনুভব করার এবং পরিপূর্ণ রসাস্বাদনে সহায়ক হবে।

দুই

মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তর

মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত। বিশেষ করে গ্রামের গরীব কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। অনাহারে, অর্ধাহারে, অখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়ে অনেক মানুষ মারা গেল। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরে দেশে এক অরাজক অবস্থা দেখা দিল। ন্যায় ধর্ম সব কিছুই রসাতলে গেল। লোকের মান ইজ্জত সব গেল। পুরানো মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেল। দেশের ভয়াবহ অবস্থার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সেদিন অমরেন্দ্র শুধু সাক্ষীগোপাল হয়েই থাকেননি। নিজের সমস্ত সাধ আর সাধ্য উজাড় করে মানুষের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেননি। শেষে নিজেই ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসে উঠেছিলেন। সেদিনের সেই সংগ্রামী জীবন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে রূপ দিলেন ছোটগল্পে।

এই পর্যায়ের গল্পগুলি বিশ্লেষণের আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, অমরেন্দ্র

ছিলেন মার্কসিস্ট অর্থাৎ সাম্যবাদে বিশ্বাসী আর বিশ্বাস নিয়েই তিনি সাহিত্যে এসেছেন। এখানে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি গল্পগুলি বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলেই, উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, "মহৎ সাহিত্যের জন্য মহৎ অভিজ্ঞতার উপকরণ চাই। সে উপকরণ হঠাৎ কখনো সংগ্রহ হয় না। না কোনো ডাইরি রেখে, না দুদিন মেলামেশা করে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে শোক দুঃখ বেদনায় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে আজ আসতে হয়েছে সাহিত্যে। বামপন্থাই আমার পথ। কারণ জনসাধারণ এই পথে এগিয়ে চলে। জনসাধারণই তার বক্তব্য আমার কলমের ডগায় পেশ করছে। যদি কিছু মহৎ হয়ে থাকে তার সম্পূর্ণ মূল্য জনসাধারণেরই প্রাপ্য।......সেই জন্যই বুঝি আমার নাম যশ খ্যাতির জন্য অপেক্ষা করার হুকুম নেই। লেখার পর লিখেছি এদের কথা।"১০

অমরেন্দ্র প্রতিভাবান শিল্পী। সেজন্য তিনি তাঁর জীবনের গভীরতম আবেগ দিয়েই দ্রুত রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর 'কণকপুরের কবি', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' এবং 'জোটের মহল'.. উপন্যাস এবং 'অসমাপ্ত চুম্বন' গল্পে এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে আর নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে তিনি সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে রাজনীতির মূল সমস্যাগুলি নীরস আর শিল্প রচনার বিরোধী বলে প্রতীত হয়নি। এখানেই অমরেন্দ্রর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মহাযুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতে অমরেন্দ্র অনেকগুলি ছোটগল্প রচনা করেছেন। যেহেতু সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, তাই তার মূল্যায়ণেরও কোন প্রচেষ্টা এ যাবৎ কাল হয়নি। এই পর্যায়ের গল্পগুলি থেকে অন্ততঃ চারটি গল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার—তা হল 'ভেজাল' 'একটুখানি নুন' 'পথিক বন্ধু' এবং 'কুলায় প্রত্যাশী'। এর মধ্যে 'ভেজাল' ও 'একটুখানি নুন'—'কুসুমের স্মৃতি' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ও আলোচিত হয়েছে। ঐশ্বর্য বিলাস, সভ্যতা সংস্কৃতি, পরিবেশ প্রশাসনে জীবনের যে দিকটা চাপা পড়ে থাকে তার মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন এবং কর্দমাক্ত অমরেন্দ্র তাকেই গল্পে রূপায়িত করে তোলেন। তাঁর সৃষ্টি সুদূর প্রসারী।

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মানুষকে কোন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, দু'মুঠো অন্নের জন্য জীবনের যে ক্লেদাক্ত পথ মানুষ বেছে নিয়েছিল, সেই কর্দমাক্ত জীবনটাই একমাত্র সত্য নয়। সেখানেও যে মনুষ্যত্ববোধ, মানবতা বোধ অবশিষ্ট ছিল, 'পথিকবন্ধু' গল্পে অমরেন্দ্র সেই কথাই বলতে চেষ্টা করেছেন। গল্পটি ১৩৬১ সালের আশ্বিনে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনে প্রকাশ্যের চেয়ে প্রচ্ছন্নের ব্যঞ্জনা যে অনেক গভীর, তার সমস্ত গতি বিরতির যে ব্যাখ্যাটা সহজগ্রাহ্য তার চেয়েও যে একটা দুর্জ্ঞেয় ব্যাখ্যা আছে তার অবচেতনার, তার সমস্ত সারল্য যে দুর্বোধ এক কুটিলতার

কুণ্ডলী, তার সমস্ত প্রেরণা আসছে উর্ধ্বস্থ আকাশ থেকে নয়, আদিম ও মৌল মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে, তার উদ্‌ঘোষণ এই গল্পগুলিতে। আর এই বলা ও দেখা কি আশ্চর্য মিলেছে তাঁর সজাগ শিল্পবোধের সংগে। ভংগির সংগে মিলেছে আংগিক, বিষয়ের বক্রতার সংগে মিলেছে ভাষার তীক্ষ্ণতা।

গল্পের নায়ক ইসমাইল নামে মুসলমান যুবক। "ইসমাইল একজন জাহাজের খালাসী। মার্চেণ্ট নেভিতে কাজ করছে আজ প্রায় দশ বছর। গেছে ঢাকা, আমেরিকা লিভারপুল, করাচী, কিন্তু ষোল আনা মাইনে পায়নি বোধ হয় সাত বছরের, কারণ ঠিকা চাকরি বেকার খেটেছে বাকি বছর কটা।" মাত্র দুটি টাকা সম্বল করে ইসমাইল রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল ফ্রক পরা যুবতী। সে ইসমাইলকে সিগারেট অফার করে। তাকে দেখে ইসমাইলের লোভ হয়। বাড়িতে টাকা দিতে না পারায় তার বাবা দরজা বন্ধের নোটিশ দিয়েছে। সুতরাং বাড়ী গেলেও ইসমাইল হয়ত দরজা খোলা পাবে না। "সারা দিন ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে চষে বেড়িয়েছে। খোঁজ নিয়েছে সমস্ত জাহাজ-কোম্পানির দুয়ারে দুয়ারে। আজ কোন আশা নেই। কাল আবার যেতে বলেছে। এমনি চলেছে দিনের পর দিন। এক ঘেয়ে জীবন আর কাঁহাতক ভাল লাগে সহসা ইসমাইলের মনে হয়, বাড়ী ঢোকার যখন আশা নেই, তখন বাইরে রাতটা কাটিয়ে গেলে ক্ষতি কি? সঙ্গী ও সে পেয়েছে, দুটো টাকাও রয়েছে পকেটে।" মেয়েটি ইসমাইলের কাছে এই রাতটার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাড় কাঁপানো শীত। একটা দেশলাই কাঠি জেবলে ইসমাইল "ভাল করে দেখে মুখখানা। না, বয়স আন্দাজসই, গড়ন মোটমাট ভালই। প্রত্যেক বন্দরে একটি করে স্ত্রী আছে জাহাজীদের—এ প্রচলিত উক্তি কোনদিনের জন্য ঘুণাক্ষরেও সার্থক হয়নি ইসমাইলের নসিবে। সে এ জীবনে নারীসঙ্গ পায় নি। ও একান্তই একা। কত একা বুঝিয়ে বলা কঠিন।" ঠাণ্ডার হাত থেকে মেয়েটিকে ইসমাইল একটি জীর্ণ গোয়ালঘরে নিয়ে এল। "খটখটে। বিচালি—বোঝাই। না, বেশ হয়েছে আস্তানাটি। যেমন কেউ দেখবে না, তেমনি হাওয়াও লাগবে না। তারপর সবিস্তারে বলে যায় নিজের জীবনের সকরুণ কাহিনী। আজ ছ মাস ধরে বেকার। অবশেষে জিজ্ঞাসা করে, বন্ধু তোমার নাম?"

"মেয়েটি একটা দীর্ঘশ্বাস যেন গোপন করে।—শুনে করবে কি? বলই না : তুমি তো বেশ বাংলা বল।

মেয়েটি চুপ করে থাকে। ইসমাইল বারবার অনুরোধ করে।

তেরশো ছেচল্লিশ অবধি আমার নাম ছিল সুহাসিনী। তারপর হল তেরশো পঞ্চাশে সাহেরবানু। এখন ডরোথি। কাল কি হবে জানি না।"

"অর্থ বুঝতে মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করে ওঠে ইসমাইলের। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর সমস্ত অর্থ বোধগম্য হয়। সে আর

ভারোথিকে ডাকে না। ততক্ষণে তার ঘুমন্ত দেহ নেতিয়ে পড়েছে খড়ের গাদা আশ্রয় করে।"

ইসমাইল এক ফাঁকে পকেটের টাকা দুটো সুহাসিনীর ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে সরে পড়ে। "ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থাকে মেয়েটি। কেন দিল তার খালি ব্যাগে টাকা দুটি? এ দিয়ে তো কোন উপকারই তার হবে না। সে সহরে গেলেও তো এ খরচ করতে পারবে না।"—তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ মানুষকে করেছে ভিখারী, নামিয়েছে জীবনের কর্দমাক্ত পংকিল পাপের পথে, তাকে করেছে রিক্ত, নিঃস্ব, দরিদ্র—কিন্তু কেড়ে নিতে পারেনি তার বিবেক আর মনুষ্যত্ববোধকে। লেখক এখানে যত না মার্কসিস্ট, তার চাইতে বেশি হিউম্যানিস্ট।

'কুলায় প্রত্যাশী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৬০-এর শারদীয় চতুষ্কোণ-এ। গল্পটি 'কুলায় প্রত্যাশী' নামে প্রকাশিত হবার পরেই অমরেন্দ্র নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'ঠিকানা বদল'। পরবর্তীকালে এই গল্প অবলম্বন করেই তিনি 'ঠিকানা বদল' নামে একখানি উপন্যাসও লিখেছিলেন এবং সেটি ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সব খুইয়ে বুকভরা মধু বাংলার বধু অহল্যা এসেছে একটা পাথুরে শহরে আশ্রয় নিতে। কিন্তু কেন? "অহল্যা চাষীর ঘরের বৌ হয়েও এসেছে শহরে। স্বামী, সংসার তার নিম্নতম অন্ন বস্ত্রের দাবী মেটাতে পারেনি। দুর্ভিক্ষ, কর্ডন, বন্যা, ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছে কাল।" এখন যে বাড়িতে অহল্যা আশ্রয় পেয়েছে, সেই বাড়িতেই—"প্রায় বছর খানেক পূর্বে ভিক্ষা করতে আসে অহল্যা। প্রকাণ্ড একটা ইস্কুলের মত খোপ খোপ ঘর। মাঝখানে বিঘা খানেক উঠান। সকলে অবাক হয়ে দেখে অহল্যাকে। শতচ্ছিন্ন ময়লা শাড়ীর ভিতর একটা দ্যুতি—যেন কয়লার খনির ভিতর এক খণ্ড হীরক, রূপই প্রধান নয়—স্বাস্থ্য এবং বলিষ্ঠ গড়ন সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।"

"ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন, 'কতদিন ভিক্ষা করছ, দেশ ছেড়ে এসেছ কবে?' একটু ম্লান হয়ে আসে অহল্যার মুখ। হয়ত মনে পড়ে কালো দীঘি, ঘন আম, কাঁঠাল, বেল, বেতসের বাগান। হয়ত স্মৃতি জাগে আরও অনেক কিছুর। তবু একটু ক্ষীণ হাসি ছড়িয়ে পড়ে ওর মুখে। এ আনন্দও নয়, বিষাদও নয়,—ওর জন্মগত প্রকৃতি।

অহল্যা উত্তর দেয়, 'বাড়ি ছেড়ে এসেছি মা প্রায় দেড় বছর'।

'কেন?'

জবাবে অহল্যার মুখ আবার ম্লান হয়ে আসে, চোখ ওঠে ছল ছল করে।" এর পরের ঘটনা হলো অহল্যা তার পঙ্গু স্বামী ফেলে চলে এসেছে। আশ্রয় স্থল একটি ফুটপাথ। ফুলদির সংগে ঐ খোপের বাসিন্দারা যথাসাধ্য দান করে অহল্যাকে।

"অহল্যা চলে যাবে—ফুলদি বলেন, 'একটু দাঁড়াও মা—তোমার কপালটা একেবারে বাড়ন্ত।' সিঁদুরের কৌটা এনে ফুলদি একটি ফোঁটা পরিয়ে দেন অহল্যাকে। 'বাঃ কি চমৎকার মানিয়েছে'।

'ভিক্ষা করলেও লৌকিকতা ভুলে যায়নি অহল্যা, সে বর্ষীয়সীদের পায়ের ধুলো নেয় নীরবে।

রওনা দেবার সময় ফুলদি একটু ব্যঙ্গ করেন, "খাও তো ভিক্ষে করে, কিন্তু স্বাস্থ্যটি রয়েছে নিটোল। একখানি ধোপ কাপড় পরালে এ বাড়ির অনেক বৌ-ই জ্বলে মরবে।"

"অহল্যা আবার আসে সপ্তাহান্তে। এ জীবনে তার ফিরে যাওয়ার আশা নেই। সে একটি চাকরী চায়, আশ্রয় চায় সৎব্যক্তির। একটা কিছু তার উপায় করে দিতেই হবে।

ফুলদি একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'আমরা তো জানতাম যারা একবার পথে নামে তারা আর ঘরমুখো হয় না। সত্যি তুমি কাজ করবে? 'অহল্যা রোদে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকে। তার বুকের ভিতর যেন আরও অনুরোধ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।"

'তুমি চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারবে?'

চব্বিশ ঘণ্টা কেন, সারা জীবন অহল্যা দাসখৎ লিখে দিতে প্রস্তুত। 'ওভাবে আর মান সম্ভ্রম বজায় রেখে থাকা চলে না। রাত্রে ঘুমাতে পারিনে যন্ত্রণায়।"

সেদিন থেকেই ফুলদির অসুস্থ ভাইপো প্রমথর যাবতীয় দেখাশোনার কাজে লেগে গেল অহল্যা। বিনিময়ে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ আশ্রয়। এ পাথুরে শহরে নিরাপদ আশ্রয়ে-কেউ তার খোঁজ করবে—অহল্যা এ কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। অথচ সত্যি সত্যিই আজ তাকে একজন খুঁজতে এসেছিল। অহল্যার দেখা না পেয়ে আগন্তুক পুঁটলি রেখে চলে যায়। ওদিকে "অহল্যা মাকড়শার মত জাল বুনে চলে আশায়। ওর অসুস্থ আশ্রয়দাতাকে মনে প্রাণে সেবা করে সুস্থ করবে। ও অন্ন এবং অর্থের বিনিময়ে জয় করবে চিত্ত।"

অহল্যার সেবা, যত্ন ও কঠোর তত্ত্বাবধানে প্রমথ সুস্থ হয়ে ওঠে। "কিন্তু একটি মর্মবেদনা অহল্যাকে পীড়া দেয়। দেশে টাকা পাঠানোর সে তো কোনও সুযোগ করতে পারছে না।" দিন কয়েক পরের ঘটনা—

দেখ অহল্যা কে এসেছে?

এ কি বিশ্বাস করা যায়।

প্রমথ বলে, 'তোমাকেই খুঁজছিল। বসতে দাও। সকাল বেলা রাগ করে গিয়েছিল, বিকাল বেলা আবার এসেছে। তোমার ঠিকানা খুঁজতে নাকি ও নাজেহাল হয়েছে।"

অহল্যা মাথায় ঘোমটা টেনে একখানা পিঁড়ি ঠেলে দেয়।

আগন্তুক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সে যে ঠিক চিনতে পারছে অহল্যাকে তা মনে হয় না। সে একটা বোঁচকা ও লাঠি কোথায় নামিয়ে রাখচে তাই ভাবে। তারপর রাত্রে বারান্দায় দুজনের কথা হয়। সুস্থ অহল্যার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু অহল্যা জানিয়ে দেয়, নতুন চাকরী, চলে গেলে এ দরজা আর খোলা পাবে না। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে প্রমথ বলে, "জোগাড় কর, তৈরী হয়ে নাও—বাড়ী যাবে অহল্যা।"

"অহল্যা বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে।"

মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর বহির্জগতে মানুষকে রাস্তায় নামালেও আত্মিক জগতে সে তখনও আগের মতই বিত্তশালী। এই গল্পে অমরেন্দ্র মানুষের সেই মহত্ত্ব, নারীত্বের চিরন্তন শাশ্বত প্রথা—সব কিছুকেই যেন একটি বৃত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ কোন নতুন কথা নয়—এ যেন আমাদের সেই চিরন্তন ঘরের কথাকেই অমরেন্দ্র আবার নতুন করে আমাদের কাছে গল্পের ফ্রেমে এঁটে হাজির করেছেন। তাঁর সমবেদনা হতভাগ্য বঞ্চিত মানুষগুলির প্রতি। এদের দুঃখে তিনি শুধু আর্দ্রতাই সৃষ্টি করেননি। তিনি এই ভগ্ন মানুষের হৃদয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন। এখানেই অমরেন্দ্রর বড় কৃতিত্ব।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ঐতিহাসিক ডাক ধর্মঘটের পরেই এল আর একটি কলংকিত দিন ১৬ই আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ইংরেজ তখনো এ দেশের শাসন ক্ষমতায়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হল না। বরং তাদেরই চক্রান্ত শুরু হল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। যে ২৯শে জুলাই হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, সেই হিন্দু-মুসলমান ১৬ই আগস্ট-এ একে অন্যের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে লাগল। এই ঘৃণিত দাঙ্গা চলে অনেকদিন ধরে। বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান কোলকাতা সহর যেন হিংস্র মানুষের জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হিন্দু বা মুসলমান কারুরই হয়নি। হয়েছে ইংরেজ শাসকের। তারা দেশকে দু'ভাগ করে দিয়ে আর ও বহুদিন ধরে এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে পরোক্ষে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেল। এই দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা অমরেন্দ্রর গল্পগুলি হল—'শুভার্থী', 'স্ফুলিংগ', 'পুনর্বাসন' এবং, অপরিচিত।'

অমরেন্দ্রর দৃষ্টিভংগী মার্কসবাদী। তিনি জীবনকে বিচার করেন সামগ্রিক ভাবে। সে জন্য এ জীবনে তিনি যেমন দেখেন অবিচার, অত্যাচার, দাঙ্গা, খুনোখুনি অন্যদিকে তিনি উপলব্ধি করেন এগুলোই জীবনের চরম সত্য নয়। মানুষ জীবনের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এই আশা এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয় না থাকলে জীবনে বাঁচার সার্থকতাই থাকে না। কোন নিয়মই চিরকাল এক থাকে না। যুগে যুগে জীবনের বাস্তবতাবোধের ফলে তা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন করে মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনে। এখানেই অমরেন্দ্রর বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য।

'শুভার্থী' গল্পের প্রধান চরিত্র এ.এস.আই গোলাম মহম্মদ। ওরফে শের-ই-পাকিস্তান! খাস বিলাতি সিভিলিয়ান অফিসারের বদান্যতায় এবং নিজের অত্যাচারের জন্য গোলাম মহম্মদ প্রমোশন পেয়ে সম্প্রতি দারোগা হয়েছে। গোলাম মহম্মদের চেহারাটি হচ্ছে—"ঘন গালপাট্টা দাড়ি। ছোট ছোট চকচকে চোখ···ষাঁড়ের মত ঘাড়। তখন সাম্প্রদায়িক অগ্নিশিখা শুধু লক লক করে জ্বলে উঠেছে নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার চারদিকে। ভীত ত্রস্ত, নরনারী ছুটে পালাচ্ছে দিকবিদিকে।" সাহেব কদিন আগেই গোলাম মহম্মদকে একটা রিভালবার উপহার দিয়েছিলেন। আর সেই রিভালবারটাই "নির্বাচারে গোলাম মহম্মদ ব্যবহার করছে। লেলিয়ে দিয়েছে পাগলা কুকুর··· খাবলা খাবলা মাংস তুলে খেয়েছে। যারা পারল বাড়িঘর ছেড়ে পালাল। গোলাম মহম্মদ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল সাহেবদের দিলদরিয়া দানের বহর দেখে। সপ্তাহ যেতে না যেতেই গোলাম মহম্দ দারোগা হয়। তার উৎসাহ বেড়ে যায় চতুর্গুন। যারা আইনের আশ্রয় নিতে এলো, তারা ধমক খেয়ে ফিরে গেল। ফিরে গেল পাংশু মুখে চোরের মত। হয়তো তারা বাড়ী পৌঁছতে পারল না, তাদের লাস পড়ে রইল—নদী, নালা, খানা—ডোবার কিনারায়! তাতে কিছু এসে যায় না গোলাম মহম্মদের। সে নির্দেশ মেনে চলছে ওপর ওয়ালার। ক্রমে দাবানল থামল···কিন্তু ছাই চাপা আগুণের তেজও কি কম। সেই আগুনেই যতদূর সম্ভব কবর প্রস্তুত করে নিল গোলাম মহম্মদ।"

একদিন এক অস্থায়ী ক্যাম্পের সামনে রাতে ডিউটি দিচ্ছে গোলাম মহম্মদ। একটা আর্ত নারীকণ্ঠ এবং ধস্তাধস্তি শোনা যাচ্ছে। "হয়ত আরও বেশী কিছু হবে। সে শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক, কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকবে? যাবে, এগিয়ে যাবে···এক্ষুনি যাবে। এমন বুকভাঙা কান্না সে তো কোনদিন শোনে নি।" কিছুদূর এগিয়েই সে বাধা পেল। তার সামনে সেই সাহেব ইনস্পেক্টর। "গোলাম মহম্মদ কি ছিলে? কি হয়েছ? আরো বড় হবে ইনস্পেক্টর, দেন্ ডি, এস, পি।···থামো।" বাঁকা হাসি হেসে সাহেব বাইকে চড়ে চলে যান। গোলাম মহম্মদ আজ হঠাৎ একটু দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। বড় মর্মান্তিক কণ্ঠ কিনা ; "একটা অসহায় মেয়ে মানুষ কতক্ষণ আর চীৎকার করতে পারে। খানিক বাদে ঠান্ডা হয়ে গেল সব। শুধু শিশির পড়ার শব্দ আসছে কানে। একটু আগে কি হয়েছিল কেই বা জানবে ? দুনিয়া তো ঘুমন্ত।" কিন্তু গোলাম মহম্মদ তার বদলে হয়ত ইনস্পেক্টর হবে। দশটা পাঁচটা এলাকায় সর্বময় কর্তা। খুন-জখম, দাঙ্গা-রাহাজানি তার কথায় জল হয়ে যাবে। কত অফিসার, লোকজন, চৌকিদার দফাদার দৌড়বে তার পিছে পিছে। "তারপর আর একটু সহ্য করতে পারলে হয়ত ডি, এস, পি···হয়ত এস, পি-ও হতে পারে। খোদা এতখানি কি মেহেরবানী করবেন এ বান্দা গোলাম মহম্মদকে ? সে কাফের নষ্ট করেছে, সহায়তা করেছে পাকিস্তান অর্জনে। খোদা কি এসব দেখছেন না ?"

কিছুদিন পরে "হঠাৎ সে দেখল পথের ধুলো উড়িয়ে অজস্র সৈন্য আসছে। সঙ্গে তাদের নানা রকম মারণাস্ত্র। তারা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, সঠিক বুঝল না গোলাম মহম্মদ। তাদের ক্যাম্পের কাছে এসে যেখানে চারটি রাস্তা মিশেছে সেখান থেকে ক'দিকে ভাগ হয়ে গেল পল্টনরা। এখানে যে একটা পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে তা তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। আশ্চর্য, তাদেরও পথ দেখিয়ে দিচ্ছে সেই সাহেব। দু'চারদিন যেতে না যেতেই সহস্র সহস্র মুসলমানের লাস এসে জমল ক্যাম্পে। গোলাম মহম্মদ কিছু বুঝে উঠতে পারল না। বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের কি মতিভ্রম ঘটল ? পাকিস্তান কি একটা ভুয়া জিগির ? কিছু ঠিক করতে পারল না সে।" গোলাম মহম্মদকে নোয়াখালি থেকে সরিয়ে আবার কলকাতায় বদলী করা হল। তবে দারোগা নয়, এ, এস, আই করে। কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তান কায়েম। অফিসার, জমাদার কনস্টেবল ইত্যাদি বদলে গোলাম মহম্মদ পাকিস্তানে থাকার জন্য ঢাকা এসে ছুটি পেল। এবার কদিন বিহারে তার নিজের বাড়িতে ঘুরে আসবে।

রাতে ঘুমিয়ে গোলাম মহম্মদ স্বপ্ন দেখল। সেই আর্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার। দাঙ্গায় তার নিজের দেশ শ্মশান হয়ে গেছে। তার একমাত্র কন্যার কোন খবর সে জানে না। তবে কি তার কন্যাও—আর ভাবতে পারে না গোলাম মহম্মদ। আবার সেই আর্ত নারী কণ্ঠের চিৎকার। গরুর গাড়ি করে সে গ্রামের পথে চলেছে। গাড়োয়ান কোন উত্তর দেয় না। প্রচন্ড আক্রোশে সে তার শক্ত হাত দুটো দিয়ে গাড়োয়ানের শ্বাসনালীটা চেপে ধরে। "স্বপ্ন ভাঙল গোলাম মহম্মদের। সে ঢাকার পুলিশ লাইনে একখানা খাটিয়ায় শুয়ে। সবে কাল রাত্রে এসেছে এখানে।"

"সকালবেলা উর্দি পরে সে যার সুমুখে কম্যান্ড সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, সে একজন পাঠান সুবেদার। কিন্তু তার পাশের চেয়ারে কে ? এখানেও সেই সাহেব, মুখে তার সেই হাসি, চোখে তার সেই কটাক্ষ। 'কেয়া

খবর গোলাম মহম্মদ ?' হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পাকিস্তানী শের। স্বপ্নে সে যে দুটো থাবা দিয়ে একটা নিরীহ গাড়োয়ানের গলা চেপে ধরেছিল, সেই দুটো বক্র থাবা সাহেবের দিকে এগিয়ে দেয়। তারপরই গোলাম মহম্মদ বরখাস্ত হয় তার ঔদ্ধত্যের জন্য।"

নিপুণ শিল্পীর মত তুলির সামান্য আঁচড়েই দাঙ্গাকালীন চিত্র অমরেন্দ্রর হাতে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। গভীর রাতে আর্তনারী কণ্ঠ, সাহেবের দেওয়া রিভলবার-- সব কিছুই যেন স্পষ্ট। একদিকে অদ্ভুত সংযম অন্য দিকে প্রতিরোধের দুরন্ত প্রচেষ্টায় গল্পটি—অসাধারণ শিল্প গুণান্বিত হয়ে উঠতে পেরেছে।

'স্ফুলিংগ' গল্পে অমরেন্দ্র প্রতিরোধের পরিবর্তে একেবারে সরাসরি বিদ্রোহ করেছেন ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে। নোয়াখালির দাঙ্গার পর একদল মানুষ ছিন্নমূল হয়ে ভাসতে ভাসতে কলকাতার ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে মির্জা একজন ভয়ংকর মুসলমান। একদিন তার দাপট ছিল, আভিজাত্য ছিল, ছিল অত্যধিক শারীরিক ক্ষমতা। আজ তার শারীরিক ক্ষমতা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে, আর সবই গেছে, শুধু ভেঙে পড়া আভিজাত্যটুকু।

"ডাস্টবিনে তখন হুড়োহুড়ি চলছে। মীর্জার সেদিকে খেয়াল নেই,। সে তার পাঁচ রঙা তালি দেওয়া জামার পকেটটা হাতড়াল। জানে যে পকেটে কিছু নেই, তবু রাগ হল। টেনে দূরে ফেলে দিল পায়ের পাতলা চটটা। পৌষের দুর্দান্ত শীত, রাত কাটাতে হবে ফুটপাথে—সে কথা সে ভুলেই গেল। অথচ তখন পর্যন্ত তার কাঁপুনি ছাড়েনি হাড় থেকে। সে-কি যে-সে কাঁপুনি, যম কাঁপুনি একেবারে।"

দলের ছেলেটি যখন ডাস্টবিন ঘেঁটে মুরগীর মাংস খেয়ে এসে মীর্জাকেও যেতে বলে, মীর্জা তখন "ধমক ছাড়ে ছেলেটাকে, চুপ শালা, হামি তোদের মত কুত্তা লই—ভাগ সুমুখ থেকে। মীর্জার রাগে দুঃখে চোখের কোটর ভিজে আসার জোগাড় হল। কিন্তু এ ক্রোধ ও ক্ষোভ কাদের ওপর তা সঠিক সে বুঝে উঠতে পারে না। ষড়যন্ত্র তো নিশ্চয়—ষড়যন্ত্রকারীকে সে খুঁজে পায় না। সে বন্দুকের নলচ্যুত বুলেটের মত আবার তেতে ওঠে। মীর্জা ভাতের কাঙাল নয়। কম খেয়ে উপোস করে সে পেট ও দেহটাকে একটা দুর্গে পরিণত করেছিল। কিন্তু এমন দুর্গের ভেতরেও একটা ফাটল ছিল—তা ওর নেশাখোর মনটা। সে দামী কিছু চায় না, চায় শুধু দুটো একটা কড়া নেপালী শুকোর বিড়ি—গরীবের মন মুগ্ধ করা মৌতাত।"

অথচ এই মীর্জাই একদিন প্রচন্ড পরিশ্রম করত। সে ছিল ভূমিহীন দেহাতি কৃষক। তখনও সম্বল ছিল ঐ বিঁড়ি। মজুরী নিয়ে প্রতিবাদ করে সে মার খেয়েছিল এক জোতদারের হাতে। মারের চোটে কেটে গিয়েছিল কপালের খানিকটা। সেদিন তার জয় হয়নি ঠিক, কিন্তু তার হিম্মতের তারিফ করেছিল.

সব কৃষাণ ভাইরা। সে গৌরবের চিহ্নটা আজও আছে তার কপালে। তারপর সে ভেঙে নেমে এল আর এক ধাপ নীচুতে। পরিণত হল কলের কুলিতে। এখানেও সেই হাড়ভাঙা মেহনত। তখন মীর্জার প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ কেবল। তখন সে এক পাট গুদামের প্রহরী। এখানেও মজুরী নিয়ে গোলমাল। সংগে সংগে মালিককে "সপাং করে মারল এক ছড়ির ঘা।"

"মীর্জা কম করে পাঁচ সাত বছর ফুটপাথে কাটাল। রসুল তো সবে এসেছে। কিন্তু মীর্জা আহার্যের জন্য কারুর কাছে হাত পেতেছে, একথা পরম শত্রুও বলতে পারবে না। সে পথের কাগজ কুড়িয়েই দিন গুজরান করে। জীবনের তটপ্রান্তে এসেছে সে, সায়াহ্ন আগত প্রায়, তবু তার স্বভাব বদলায়নি। মীর্জা মরে যাবে তবু ক্ষমতা থাকতে ভিক্ষা করে উদরান্ন সংগ্রহ করবে না। শ্রমের মূলধন সে আজও ভাঙিয়ে খায়। তবু মাঝে মাঝে সে ঐ নেশার সামগ্রীটা একমাত্র রসুলের কাছেই চায়। অনেকটা দাবী করে বুড়ো বাপের মত।"

রসুল মীর্জার হাতে একটা পয়সা দিতেই, মীর্জা এগিয়ে চলে। একেবারে বিড়ি পট্টির মোড়ের দোকানের কাছে গিয়ে উগ্রকণ্ঠে বলে, "এক পয়সার তিনটে বিড়ি। দোকানীর অপেক্ষা না করেই সে একটা বিড়ি তুলে আগুন ধরায়। দোকানীর ঠিক পাশেই বড় একটা লক্ষপতি শুক্লা মহাজনের গদি। তার একটা ছেলেকে ভুগোল পড়াচ্ছিল এক গৃহ শিক্ষক। তাদের সুমুখে একটা সৌখিন পাতলা কাগজে পৃথিবীর মানচিত্র। ইংরেজ অধিকৃত দেশগুলি ব্রিটিশ পতাকা চিহ্নিত।"

ইতিমধ্যে মীর্জা ও দোকানীর মধ্যে একটা কলহ বাধে। দোকানী এক পয়সায় আড়াইটা বিড়ি দিতে চায়, কিন্তু মীর্জা চায় সম্পূর্ণ তিমনে। সবাই শালিসী করতে এগিয়ে এল। বিচারে মীর্জাই ঠকল। মীর্জা যখন ঠকেছে তখন আর জ্বলন্ত বিড়িটাই বা কেন সে নেবে? "ওটা সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মহা আক্রোশে। আগুনটা পড়ে গিয়ে পাশের গদির মানচিত্রের গায়ে, ঠিক দিল্লীর সীমানায়। সেখানে কতটা আগুন লাগল তা সদ্য সদ্য বোঝা গেল না। উপস্থিত ভাটিয়া-মাড়োয়ারী-সিন্ধী মহাজনরা হায় হায় করে ছুটে এলো। কি আশ্চর্য, ব্রিটিশ ইউরোপ খন্ডে স্ফুলিংগ দেখতে দেখতে ছড়িয়ে গেছে! তাই কি লাল জেল্লা পড়েছে বাকি মানচিত্রটার গায়?"

মীর্জার বিড়ির এই স্ফুলিংগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বলিষ্ঠ প্রকাশ। গল্পের এই অংশে অমরেন্দ্র তাই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন।

'পুনর্বাসন' দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে অমরেন্দ্রর আর একটি ক্রোধবহ্নি। "ক্যাম্পের ভাঙা জানালাটার পাশে বসেছিল ঊর্মিলা। স্বামীহারা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব শূন্য শুধুমাত্র দুটি ছেলের হাত ধরে এখানে এসেছে নোয়াখালি থেকে

সে আজ প্রায় এক মাস। আপনার বলতে যারা ছিল তারা সবাই মরেছে পনেরই আগস্টের অনেক পর একটা ক্ষুদ্র অখ্যাত দাঙ্গায়। সে মরলেও বোধহয় ভাল হতো খুবই, কিন্তু কেমন করে যেন বেঁচে গেছে। বাঁচিয়ে ছিল বাড়ির পাশের পড়শী রাইয়ত মকবুল। ভোরবেলা অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে এনেছিল এক জংগল থেকে। আর ছেলে দুটো হাউ মাউ করে যেন ঠিকরে পড়েছিল তার উঠানে। মুনিবের বৌ মা'র সামিল—এ কথাটা জানত মকবুল, বলতোও মুখে মুখে। তাই সে অনেক বিপদ অনেক শাসানি আগ্রাহ্য করে ওদের পার করে দিয়ে যায় নদীর ওপারে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে, এক মহাপ্রাণে গৃহস্থের জিম্বায়।"

তারপর এসে আশ্রয় নেয়—এই অস্থায়ী ক্যাম্পে। এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে হাজার হাজার বাস্তুত্যাগী উদ্বাস্তু। গত কয়েক দিন ধরে চাল নেই, ওষুধ নেই– নেই সাহায্যের কোন নিশানা। অথচ আতংক আছে সকলের মনেই —তাদের নাকি কালাপানি অর্থাৎ আন্দামানে পাঠাবে। অবশেষে একদিন সাইকেলে চড়ে আসে এই ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কিরণ। কিন্তু ক্যাম্পের অজ্ঞ অধিবাসীরা রিলিফ অফিসার মনে করে তাকেই মৌমাছির মত ঘিরে ধরে। তাকেই তারা ঠিক করল, "যেন দেবেন অন্ন, বস্ত্র ও বৃত্তির সংস্থান করে, দেবেন পঞ্চাশ লক্ষ কাঙালের একটা ক্ষুদ্র অংশকে আজই সুখী-গৃহী করে—যে গৃহের স্মৃতি এখনও ভোলেনি এই সহজ সরল বাঙালগুলো, যাদের বাড়ি ছিল নদীর পারে ধানের দেশে।" কিরণ ওদের নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল, সরকার যথাসাধ্য সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করছে। কাউকেই জোর করে কালাপানি পাঠানো হবে না। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে সকলকে অপেক্ষা করতে হবে।

কথা শেষ করে কিরণ সাইকেলে উঠবে এমন সময় ঊর্মিলার ডাকে সে থামল। চিনতে পারল সে তাকে। তার মুখে সব কথা শুনে কিরণ অবাক হয়ে গেল। "রায়টের কথা শুনে নয়—এত বড় একটা দুর্ভাগ্যের পরও মানুষ কি করে এমন স্বচ্ছন্দে কথা বলে তাই শুনে। তাদের দেশের মেয়ে তাই কলিজায় এত বল। ভেঙেছে তবু গুঁড়িয়ে যায়নি। সংগ্রাম করছে অস্তিত্বের জন্য। একদিন এই ঊর্মিলাকে নিয়েই কিরণের স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল। তাকে দেখলে মনে হতো ভুবন বিজয়িনী এক দেবী প্রতিমা। বামুনের মেয়ে তাই ছোট না হোক সমবয়সী হলেও সে গ্রাম্য সম্পর্কে ডাকত দিদি বলে। কায়স্থ বামুন তখন একটা ব্যবধানই প্রচলিত ছিল। সে একদিন গেছে, যখন দুজনে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত বন পথে। কিরণের মন পথেও আজ যেন মঞ্জির বেজে উঠল সেদিনের সেই শ্রীচরণের। এক বছর পর কলেজের ছুটিতে বাড়ি এসে কিরণ টের পেল ঊর্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে।"

বর্তমানে কিরণেরও আর কেউ বেঁচে নেই। সে এখন তিনশ টাকা মাইনের সরকারী চাকুরে। তাই সে ঊর্মিলাকেও নানাভাবে সাহায্য করতে চায়।

ঊর্মিলার ছেলেদের জন্য নতুন জামা প্যান্ট, লজেন্স নিয়ে আসে কিরণ। আনে ঊর্মিলার জন্যও একখানা শাড়ী। প্রায় প্রত্যহই আসে কিরণ। "তাকে অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, বৃত্তিহীন, পঙ্গপালেরা ঘিরে ধরে, জর্জরিত করে তোলে লক্ষ লক্ষ অর্থহীন শাণিত প্রশ্নে। কথাগুলি কি অর্থশূন্য? তা নয়।......রোগ আসে, খানিকটা ভেঙে যায় ক্যাম্পের পাঁজর। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক হয় মাপা খাদ্যের তালিকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিলিফ আসে, কিন্তু জীর্ণ ইমারতে যেমন চুনকাম স্থায়ী হয় না, তেমনি ফাঁপে ফোলে না এদের ভাগ্যের জোয়ার। ক্যাম্প ভাঙে আরও খানিকটা। শিশু এবং প্রসূতি মরে আরও দু'চারটা।"

তারপর কিরণ ঊর্মিলা ও তার দু ছেলেকে নিয়ে আসে কলকাতায়—এক মুসলমানের পরিত্যক্ত বাড়িতে বাড়িটা সে ভাড়া নিয়েছে। মালিক ফিরে এলেই কিরণ এ বাড়ি ছেড়ে দেবে। কিন্তু হঠাৎ ঊর্মিলা বলে ওঠে, "কিরণ, যেমন করে হক ফিরিয়ে আনো নইলে আরও সর্বনাশ। পূর্ববাঙলার পঞ্চাশ লক্ষ ঘর শুধু জ্বলে এ আগুণ নিভবে না—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের সব ক'খানা ঘর পুড়ে ছাই হবে। এতদিন তোমাদের মুখে মুখে শুনে বুঝলাম—হনুমান খেদাও, নইলে ধ্বংস হবে কনক লংকা।"

বাড়ির ভিতর ঢুকে চারিদিক দেখে "ঊর্মিলা খানিকটা কেঁদে সুস্থ হয়, তার দেহে এবং মনে অনেক জ্বালা, অনেক গ্লানি এই ভারত বিভাগের। সঠিক তাকে উপলব্ধি করতে পারে না বলে, কিরণ ভাবে এ এক পাগলামি তার ঊর্মিলাদির।" পরের দিনের কথা। ঊর্মিলা বিকেলে গা ধুয়ে, চুল বেঁধে নিজেকে ভাল করে সাজিয়ে ছেলেদের নিয়ে কিরণের সঙ্গে সিনেমা দেখল।

"সকলে ঘুমিয়েছে, শুধু কিরণ ঘুমায় নি। সে আনন্দেই ঘুমাতে পারেনি। একটা ক্যাম্প তার চোখের সুমুখে ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে, হাজারও চেষ্টায় রক্ষা করতে পারেনি মানুষের সম্মান। রোগে ওষুধ, ক্ষুধায় অন্ন যা তারা দিয়েছে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎ। তবু যদি সে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র সংসারের পুনর্বসতি করতে পারে! শুভ্র সুগন্ধি হাসিতে ভরে যাবে তার ঘর। ভোরবেলা সে ঘুম থেকে উঠে চমকে পিছিয়ে এলো। সেই ক্যাম্পে বসে যে শাড়িখানা ঊর্মিলা পরেছিল তাইতে লটকে ঝুলছে। পুলিশ এলো, ময়না তদন্তের জন্য লাস চালান হল। রিপোর্ট বের হল ঊর্মিলা ছিল অন্তঃস্বত্বা..... তিন মাস.. পত্র পাওয়া গেল, এ দাঙ্গার অভিশাপ। কিরণ বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ হয় না, এ কেউ পারে না...ভেঙে আবার তেমনি করে গড়া যায় না'। কিন্তু সে মনে মনে ক্ষমাও করতে পারে না যারা এ মহাপাপের ষড়যন্ত্র লিপ্ত। সভ্যতার শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা হুতাশন হু-হু করে জ্বলতে থাকে তার মনে।"

'অপরিচিত' গল্পে রোষ-বহ্নি থেকে এক হিন্দু যুবককে বাঁচানোর জন্য

দু'জন মুসলমান যুবতীর প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রামের এক আলেখ্য রচিত হয়েছে। দাঙ্গায় একদল মুসলমান হিন্দুর বুকে যখন ছুরি বসাচ্ছে, তখন আর একদিকে হৃদয়বান সংস্কার মুক্ত মুসলমান যুবতী অন্দর মহলের নিষেধের বেড়ি ভেঙে বেরিয়ে আসছে হিন্দুর জীবন রক্ষায়।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দু মেহেদি। "তার বয়েস সবে আঠার কি উনিশ। মুসলমান হলেও সে স্কুলে পড়ে। এখনও অবিবাহিতা।" এই মেহেদিই তার পরিচারিকা আসমানী, ভাবী এবং শয়তানের সর্দার গফুরের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজের ঘরেই লুকিয়ে রেখেছে, একজন আহত, ক্ষত-বিক্ষত হিন্দু যুবককে। মেহেদি তাই আর মন দিয়ে নামাজ পড়তে পারছে না। ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাচ্ছে কেবলই। কত আশংকা কত উদ্বেগ তার মনে।

ঘটনাটি হল, "হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা চলেছে, ঘোর দাঙ্গা। পৈশাচিক অত্যাচার হত্যা লুণ্ঠনে সারা সহরটা জর্জরিত। মানুষের আহার নিদ্রা ঘুচেছে—না আছে কোনও ব্যবসা বাণিজ্য, সাহস হয় না কারুর অফিস কাছারিতে যেতে। গুজব ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে মুখে মুখে। এমন বিপদ মাথায় করে কে বা যায় বাইরে। উজ্জ্বল দিবা-লোকেই আততায়ীর ছুরি চলে। মন্দিরে দেয় গো-রক্ত, মসজিদ জ্বলে লক্‌লকে শিখায়।"

এমনি এক সন্ধ্যায় মেহেদি দাঁড়িয়েছিল দোতলার জানলায়। ওদিকে তখনও চলছে যথেচ্ছ ভাবে লুণ্ঠন ও তাণ্ডবলীলা—একটি যুবক বিপরীত দিকের রাস্তা দিয়ে ছুটে এসে হোচট খেয়ে পড়ল ট্রাম লাইনে। তার পিছনে রসি কয়েক তফাতে একজন গুণ্ডা। তার হাতে তীক্ষ্ন কসাইর ছুরি। যুবক কি জানে না এটা মুসলমান পল্লী, একটি হিন্দুও নেই এদিকে।" .....

পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। যুবকটি দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়েও আশ্রয় না পেয়ে শেষে আততায়ীদের হাতে জখম হয়ে পড়ে থাকে মেহেদির বাড়ির পিছন দরজার সামনে। "সে যুবকটির দু বগলের নীচে হাত দিয়ে তাকে সজোরে তুলে ধরে টানতে টানতে নিজের বিছানায় নিয়ে এলো। আনতে কি পারে? একেবারে এলিয়ে পড়েছে।" মুখের দিকে তাকিয়ে মেহেদী চমকে ওঠে। এই তো সেই উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য জহরলাল। সে বছর কাঁচা পাট কেনার জন্য মেহেদির পিতা উত্তরবঙ্গের কোন এক গ্রামে এলেন...... সেখানেই তাদের আলাপ জহরলালের সঙ্গে। জহরকে বাঁচাতেই হবে। মেহেদি বাড়ীর সকলের রোষ দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকে। এমন সময় মেহেদীর বাল্য সঙ্গিনী আসগরী এসে হাজির হয়। মেহেদী সব কিছু খুলে বলে তাকে। তারপর "দুজনে অতিকষ্টে যুবকটিকে ধরাধরি করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, তারপর আসগরীর মোটরে তুলে ছুটে চলে হাসপাতালের দিকে। কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তার যুবকটিকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করে।

"মৃত যুবককে নিয়ে ধীরে ধীরে ওরা গঙ্গার পাড় ভেঙে নিচে নেমে যায়। এক হাঁটু জলে নেমে শুয়িয়ে দেয় অতি যত্নে। পান্ডুর চাঁদ যেন চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে—পলক পড়ে না তার চোখে। মেহেদী ধীরে ধীরে ওকে ভাসিয়ে দিয়ে মনে মনে বলে, হে অপরিচিত, তোমাকে হত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের মাথায় যেন খোদার গজফ হঠাৎ বাজের মত পড়ে।"

এই পর্বের প্রায় সব গল্পই দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজকে কেন্দ্র করে লেখা। ঘটনার বর্ণনায়, চরিত্র রূপায়ণে, মনোবিশ্লেষণে, চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারে এবং অসাধারণ শিল্পী সংযমে অমরেন্দ্রর কুশলতা প্রশংসনীয়। এই পর্বে তিনিই যেন 'পুণর্বাসন' গল্পের সরকারী কর্মচারী কিরণ। নতুন চেতনায় নবযুগের সাহিত্য রচনা করে তিনি একই সংগে সাহিত্য পাঠক এবং সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

পার্টিশান

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসাদের পর সকলেই ভেবেছিল এবার দেশে মুক্ত হাওয়া বইতে আরম্ভ করবে। সাধারণ মানুষ অনেক সুখ শান্তিতে থাকতে পারবে। তাদের অভাব অনটনের অবসান ঘটবে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষকে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। অভাব অনটন বহু গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। চারিদিক থেকে এক সর্বনাশা দারিদ্র ঘনিয়ে এসেছে। ফলে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস সাধারণ মানুষের মনে অল্পদিনেই মিইয়ে গেল। নানা সংকটের আবর্তে তাদের ভরাডুবি অবস্থা দেখা দিল। চোরা কারবার, স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, দুর্মূল্য, বেকারি প্রভৃতি তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। বাঁচার তাগিদে তারা সংঘবদ্ধ হতে লাগল। শ্রমিক-কৃষকেরা সহজে অবস্থাকে মেনে নিতে স্বীকৃত হলো না। তেলেঙ্গানায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে কৃষকদের মধ্যে তে-ভাগা আন্দোলন দেখা দিল। সহরের কলে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রসার লাভ এবং, ১৯৫৯ সালে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত হল। অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর নানা গল্পে মানুষের এই প্রতিবাদের শিল্পরূপ দিলেন।

পার্টিসানের অভিশাপ কিভাবে মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত ও বিপর্যস্ত করে তাকে কলকাতার রাজপথে এনে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ছিন্নমূল মানুষের সব কিছু কেড়ে নিলেও, কাড়তে পারেনি তাদের প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের শক্তি—'ইন্ধন' গল্পে সেই কথাই অপূর্ব

শিল্পরূপ লাভ করেছে। গল্পের সুরু এখান থেকেই—"সুখময় আসামী নয়, ফরিয়াদী নয়, সাক্ষীও দিচ্ছেন না কোনো জটিল মামলার। তবু তাকে হাঁপিয়ে উঠতে হয়—জবানবন্দী দিতে হচ্ছে বিগত কয়েকটা মাসের। মর্মমূলে কেবলই বিঁধছে তার আঠারো বছরের বিধবা মেয়ে মালতীর কথা। বাপ হয়ে ওকে কিনা দেখতে হয়েছে। শক্তি থাকতেও ওকে কিনা সইতে হয়েছে! মনে পড়ে মসজিদের সেই জেহাদী সমাবেশ। মোল্লা-মৌলভীদের আস্ফালন।"

ফুটপাথ ভরে গেছে মানুষে। উত্তম-মধ্যম সবাই ব্যগ্র—কি করা যায়, কি করা উচিত? মানুষটাতো আর ফুটপাথে বসে মারা যেতে পারে না। সুখময় সম্পর্কে সকলেই একটা মীমাংসায় পৌঁছতে চায়। কুলি, কেরানী, ঘুঁটেওয়ালা, দু-একটি পথচারিনী চাকুরে মেয়ে পর্যন্ত। তিনটি বলিষ্ট যুবকও এসে দাঁড়াল—প্রয়োজনে তারা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। কিন্তু কোন কিছুই স্থির হল না। "জনতা উপলব্ধি করলো তাদের হাতের সমস্ত হাতিয়ার কারা যেন চক্রান্ত করে কেড়ে নিয়েছে। একেবারে মাথাপিছু মেরে আর গজে বরাদ্দ। জন্মগত রক্ত-মাংসে জড়িত পীড়িতের জন্য সেবা, আর্তের জন্য ত্রান, মুমূর্ষের জন্য মমতা, তাও যেন শক্ত হাতে কারা করেছে কনণ্ট্রোল!" জনতা সরে গিয়েও চলে যেতে পারে না। সুখময় আবার বলে "ভাগ যাঁরা করেছেন, তাঁরা নাকি সকলের ভালোর জন্যই করেছেন—কিন্তু ভোগ বেড়েছে জনসাধারণের। হিন্দু-মুসলমান অতিষ্ঠ।"

এই পার্টিসান শুধু দেশের ভৌগোলিক সীমার পার্টিশান নয়। এই পার্টিসান সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত। হিন্দু-মুসলমানের চিরন্তন সৌভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধনেরও পার্টিশান ঘটাল। "জীবন দাস দিতে পারল না জমিতে লাঙল ও-পার গিয়ে—আর মিঞাজান সাহস পেল না এপারের হাটে এসে মাছ বেচতে। সে খোয়াতে বসল তার বাপ-দাদার আমলের পেশা।" পার্টিশানের ঠিক প্রাক মুহূর্তের অবস্থা। অমরেন্দ্র নিজে বাস করেন বরিশাল জেলার রাজাপুর থানায় অধীন এক গন্ডগ্রাম শুক্তাগড়ে। তিনি লিখেছেন, "মুসলিম প্রধান এ অঞ্চলের গ্রাম্য রাজনীতি দেখে আমি কিন্তু অনেক আগেই বুঝলাম—পার্টিশান রোকা যাবে না, পাকিস্তানও কায়েম হবে নির্ঘাত। সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর উক্তি শুভ নয়। মাটির মত সহজাত সরল মনগুলোকে কলুষিত করা হচ্ছে বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে।"১১

এই দাঙ্গাই সেদিন পার্টিশানের ইন্ধন যুগিয়েছে। এই প্রসংগে অমরেন্দ্রর নিজের জবানবন্দীও স্মরণযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "রায়ট, রায়ট আসছে। উৎখাত হচ্ছে এবং হয়ে যাবে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায়। কতিপয় বুদ্ধিজীবী মোল্লা মৌলানা বিষম চাল চেলেছে রাজনৈতিক দাবার। আশপাশের শান্ত নিরীহ মুসলমান ভাইরা হতবাক।"১২ আলোচ্য গল্পেও অমরেন্দ্র সেই

প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। গল্পটির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "এপার এবং ওপারের হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস একটা অব্যক্ত ব্যথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে। সেই ধূম্রজালের আড়াল থেকে শয়তানেরা আবার তীক্ষ্ন নখ মেলে ধরে। মাঝে মাঝে এপার ওপার দাঙ্গা বাধে নয়তো চলে বুদ্ধির অদৃশ্য প্যাঁচ খেলা। সুখময় তেমনি একটা প্যাঁচের চোট খেয়ে এসে পড়েছে পশ্চিম বাংলার এক ফুটপাথে। পাথেয় বলতে যা কিছু ছিল তা ফুরিয়েছে একেবারে, কিন্তু তার এবং তাদের সকলের ইতিহাস জমেছে বিস্তর।" অথচ এই সুখময়ই ছিল হাজার ঘর মুসলমানের মধ্যে এক ঘর হিন্দু নাপিত। পাকিস্তানে এমন গৃহস্থ ঢের আছে। তবুও "হিন্দু সমাজের যে পংক্তিতে সুখময়ের স্থান, তার চেয়ে অনেক গর্বে ও গৌরবে সে বাস করতো এই মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে। নাপিত হলেও তার একটা সম্মান ছিল। সাদি-মেজবানে সে একটা বড় রকমের সিধা পেত। প্রায় সব বাড়ি থেকেই পান-বাতাসা পাঠিয়ে দিত ঈদ এবং রমজানের পরবে।"

সেই সুখময় এবং তার যুবতী মেয়ে মালতীকে এনে মসজিদের থামে বাঁধা হয়েছে। মালতী কুমারী নয়, বিধবা। "আজ প্রথম এই অঞ্চলে হিন্দু হবে ধর্মান্তরিত। পবিত্র ইসলামের দোহাই দিচ্ছে মোল্লা-মৌলভীরা। তারপর ঘুচিয়ে দেবে একটি নারীর নির্মম বৈধব্য—যা ওদের শাস্ত্রমতে নাকি অতি সমীচিত। গোঁড়া যারা তারা আল্লার নামে বোঝাচ্ছে অজ্ঞ সাধারণকে। পাকিস্তানবাসী প্রতি নর-নারীরই নাকি উচিত এ শুভ কাজে সহানুভূতি ও সাহায্য করা। 'মেয়েমানুষ, যদি বয়স হয় অল্প, কেন থাকবে বিধবা? কোরাণে কি কয় শোন ভাইজানরা।' একটা অতি পবিত্র ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা চলে মিনিট পাঁচেক।"

তারপর যথারীতি চলে জোরজুলুম ধর্মান্তরিত করার। পাকিস্তান হলেও এখানে বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তির অভাব নেই। বিশেষ করে পীর সাহেব যেখানে স্বয়ং উপস্থিত এবং সশরীরে বর্তমান এ তল্লাটের বড় মিঞা মেম্বর সাহেব। সেই বড় মিঞা বললেন, "ভাইজানেরা, জোর-জুলুম গুন্ডার কাজ। আমরা আজাদী পেয়েছি অনেক মেহেনতে—এখন পাকিস্তান কায়েম করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে, ঠান্ডা মেজাজে। সুখময় কাফের হলেও আমাদের গাঁয়ের নাপিত, ওকে বুঝিয়ে বলো সব। আমি বলি, ওর বাঁধন খুলে দাও আগে। ওকেও বুঝতে দাও যে, ও-ও স্বাধীন দেশের লোক। আমার যতটুকু এক্তিয়ার আছে, তার চেয়ে চুল বরাবরও কম নেই ওর অধিকার।" বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে পীরসাহেবকে কুর্নিশ ও সেলাম করে সুখময় বলে, "আমাদের ছেড়ে দিন হুজুর। আমরা বাড়ি-ঘর গরু বাছুরের কিছু দাবি করিনে—এক্ষুনি এক কাপড়ে চলে যাব হিন্দুস্থান।"

সুখময়ের সকরুণ আবেদনের উত্তরে পীরসাহেব বলেন—"তা হয় না

সুখময়, তা হয় না। তুমি নিতান্তই বেইমান।" "আর বেইমান না বুঝি তুমি?"—একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ মুসলমান ক্ষেপে ওঠে। "কোন্ কেতাবে আছে প্রতিবেশী হিন্দুর জান-প্রাণ ইজ্জৎ নিয়ে মোছলমান এমনি ছিনিমিনি খেলবে!..... শিগগির ছেড়ে দাও ওদের। বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে এগিয়ে আসে।" নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে তোলে। কিন্তু তবুও সুখময় ও মালতীর মুক্তি আসে না। অবশেষে হাতেমের মা ও মিঞাজানের সহযোগিতায় একদিন চলে আসে পশ্চিমবাংলার মাটিতে। "সাদর সম্ভাষণ জানাল নেতারা! শরনার্থী সুস্বাগতম্! পাইকারের লাথি খেয়ে হাটের মধ্যে যেমন পচা কুমড়া গড়ায়, তেমনি গড়াতে গড়াতে সুখময় ও তার মেয়ে এসে পড়ল কলকাতার এক বেসরকারী ক্যাম্পে।"

এই ক্যাম্প থেকেই একদিন খোয়া গেল উপোসী মালতী। সুখময়ের জবানবন্দী শেষ হয়েছে। নিঃশ্বাস থেমে গেছে। "কৌতূহলী জনতা ওর পকেটে হাত দিল। কিছু কাগজ পত্র পাওয়া গেল। সবই কঠোর জীবন-যুদ্ধের পরিচয় লিপি। অনেক চেষ্টা করেছে, কি যেন সামান্য গাণিতিক সন-তারিখের ভুলচুকে 'ফিরেশন' পায়নি, অনেক হেঁটেছে, ওই রকম কি যেন একটা ত্রুটির জন্য রিফিউজি বলেই আজ পর্যন্ত গণ্য হয়নি।"

অমরেন্দ্র নিজেও এই দাঙ্গা এবং পার্টিশানের শিকার হয়েই সাত পুরুষের ভদ্রাসন ছেড়ে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসে উঠেছিলেন। উদ্বাস্তু জীবনকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা ও রাজনীতি হয়েছে তারই বাস্তব চিত্রায়ণ ঘটেছে গল্পটিতে।

'এ নাকি অনিবার্য এবং অনেস্বীকার্য্য' গল্পটি অমরেন্দ্রর তীক্ষ্ন রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে। এ গল্পের পটভূমিও পার্টিশান নামক অভিশাপ। গল্পের একেবারে সূচনায় লেখক লিখেছেন, "ভাঙছে শুধু ভাঙছে। ভেঙে উজাড় হয়ে যাচ্ছে হাট গ্রাম গঞ্জ সহর বাট। পদ্মা কিম্বা মেঘনার ভাঙন নয়—পাহাড়ী ঢলক কখনও নেমে আসেনি এদেশে, দেখা যায়নি কখনও অগ্নিগিরির প্রলয়ংকর গলিত লাভাস্রোত। তবু পূর্ববাঙলা ভাঙছে। মাটিতে ফাটল ধরেনি, চির খায়নি কোন খাড়ি নদীর পাড়, ভূমিকম্প নয়, খন্ডপ্রলয় নয়, তবু ধ্বসে ধ্বসে পড়েছে—ভাঙছে, গুড়িয়ে যাচ্ছে এক প্রাচীন সভ্যতা—হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্য, মিলনগ্রন্থি শিথিল হচ্ছে মসজিদ ও মন্দিরের।" পার্টিশানের অশুভ পরিণতির ইংগিত একেবারে গল্পের সুরুতে দিয়েই অমরেন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ন রাজনৈতিক সচেতনতার পূর্বাভাস ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এই পার্টিশানের সন্ধিলগ্নে হিন্দু কারবারীরা কারবার গুটাচ্ছে, দোকানী বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, চোদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি অনেক আগেই বেচে দিয়েছে। পন্ডিত ব্রাহ্মণদের টনক নড়েছে—বিদায় বন্ধ হতে চলেছে ভাট ব্রাহ্মণ গণকের। বৈরাগী আর গেরুয়া বাস পরতে পারবে না। ইস্কুল-কলেজ

সব ভেঙে যাচ্ছে। ব্যাংকও ভয়ে কাঁপছে। তেজারতি কারবারও বন্ধ হলো—নিবে এলো গঞ্জে গঞ্জে সাহা ও সোনাপটির রোসনাই। উকিল, ডাক্তার, মুদি, গয়লা, কেরাণী, প্রফেসর, জজ, ব্যারিষ্টার—চোখ কপালে তুলে ভাবছেন। "বড় বড় কাগজ ও নেতার কারসাজি এবং গলাবাজিতে ভোট দিয়েছে যারা তারাই এখন আত্মহারা—এ তারা করেছে কি? নিজের পায়ে নিজেই মেরেছে কুড়াল। এখন হাল গরু জমিজায়গা—কারুর কারুর যে জরু নিয়েই টান। কেটেছে কাটুক কান, দিয়েছে দিক্‌না নুন। একগালে কালি এবং অন্যগালে যদি ঠাট্টা করে দিয়েই থাকে মাখিয়ে চুণ—তা তারা মুছবে না, যাবে পশ্চিম বাংলায়। তারা স্বাধীন হবে। তারা সুবিধাবাদী শিক্ষিত এক শ্রেণীর বেবুন।"

তারপর আসে ১৫ই আগষ্ট স্মরণীয় দিন—বরণীয় বাঙালীর তথা ভারতবাসীর কাছে। "কিন্তু বাঙ্গাল বাদরগুলো ভিটে মাটি জোতজমি ছেড়ে সীমা লঙ্ঘন করছে। জাহাজ বোঝাই হয়ে চলেছে যেন বেবুনের দল। চাহিদা অনুযায়ী এবার সৃষ্টি হলো রিলিফ ক্যাম্পের, যাকে শয়তানেরা বলে বেবুন বেরাক্—এক কালে সেখানে ছিলোও নাকি মিলিটারি বাদরগুলোর বাসা।" যারা দেশ ছেড়ে আসতে পারল না তাদের অবস্থা কি হল, কেমন করে তারা দেশের মাটিতে বাস করছে, সে চিত্রও এ গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

কুসুমপুর পূর্ব বাঙলার একখানা গ্রাম। "গ্রামে ছিল পনর ঘর হিন্দু, তার মধ্যে প্রায় পৌনে ষোল আনাই দেশ ছাড়ল—লাঞ্ছনার ভয়ে। এবার তো একেবারে খালি, শূণ্য ভিটাগুলো খাঁ খাঁ করছে। গ্রামের চারপাশে প্রায় পাঁচশ ঘর অন্য সম্প্রদায়ের লোক। তাদের মধ্যে তেরজন নাম করা ডাকু, কুড়ি পাঁচশ জন দাগী আর শতাধিক চোর বদমাস। মুসলমানের মধ্যে যারা ভাল তারাও এদের দাপটে অস্থির।" এরই মাঝে টিকে আছেন ডাঃ গাঙ্গুলী তার ষোল বছরের জোয়ান কন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ দাইমুলের (কালাপানি) থেকে বেশ পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে এল তৈমুর। "তাকে দেখে হিন্দু পাড়ার বৌ ঝি যে কটি ছিল, ঘরে এসে কপাট দিল।" তৈমুরের নজর পড়ল জোয়ান কৃষ্ণার দিকে।

একদিন সত্যি সত্যিই রাত বারোটায় তৈমুর এসে হাজির দলবল নিয়ে "কি গাঙ্গুলী মশাই? কিছু না। এরজন্য রাত্রে আসা লাগে? বিহানে জবাব দিমু—জবাব আর কি দিমু, কলমা পড়মু কেলি ফয়জরে। তবে আর একটা রাত্রির জন্য জোর করে হবে কি? মনে দুঃখ দিলে সুখ হবে না কুটুম্বিতায়।"

ওরা চলে যায়। কিন্তু "গাঙ্গুলী ঘুমাতে পারে না। মনে পড়ে বাপ দাদা পিতা পিতামহের কথা। তারা তো কাপুরুষ ছিলেন না। কিন্তু একা

গাঙ্গুলী দাঙ্গা করবে কজনের সাথে? শত্রু তো একজন নয়—সভ্যতার শত্রু, জীবিকার শত্রু, মানবতার শত্রু।" অথচ এই কুসুমপুরে হিন্দু-মুসলমান পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, কিন্তু দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে ভ্রাতৃ-বিরোধের যে আগুন জ্বলল, কুসুমপুরের বুকেও তার ঢেউ এসে লাগল। পার্টিশানের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং চক্রান্ত কাজ করেছিল। অমরেন্দ্র তারই ইংগিত দিয়েছেন এ গল্পে।

অমরেন্দ্র প্রতিভাবান শিল্পী। সেজন্য তিনি তাঁর জীবনের গভীরতম আবেগ দিয়েই দ্রুত রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি নিজের রক্তে মাংসে এই রাজনৈতিক ধারণার দিকে এগিয়ে গেছেন। তিনি নিজের রক্তে মাংসে এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন আর নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকে তিনি সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে রাজনীতির মূল সমস্যাগুলো নীরস আর শিল্পরচনার বিরোধী বলে প্রতীত হয়নি। এখানেই অমরেন্দ্রর বৈশিষ্ট্য।

অমরেন্দ্র গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবি তিনি শ্রমিক কৃষক নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কত কাছাকাছি হয়েছেন, তিনি তাদের দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন, মধ্যবিত্ত জীবনের ন্যাকামি, ভন্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন, ধর্মঘট হরতালে সামিল হওয়ার জন্য ডাক দিয়েছেন—শ্রেণী বৈষম্যকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন, সাহিত্যে রাজনীতি প্রচার করেছেন কিন্তু কোথাও তার শিল্পধর্মকে নষ্ট হতে দেননি। অমরেন্দ্রর সাহিত্য খুব কম জায়গায়প্রচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

শিল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে তাকে শিল্প হয়ে উঠতে হবে এ কথা মার্কসবাদের প্রবক্তারাও অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, "There is no question that literatare is least of all subject to mechanical adjustment or lavelling. to the rule of the majority over the minority. There is no question, either, that in this field greater scope must undoubtetly be allowed for Personal initiative, individual, thought and fantacy form and content. All this is undeniable". ১৩

মাও সে তুঙ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমরা দাবী করি, শিল্পের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করতে হবে, বিষয়বস্তুকে রূপরীতির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যথাসম্ভব উচ্চস্তরের শিল্পগুণের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিষয়বস্তু রাজনীতির দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্প-মূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ না হলে তা ব্যর্থ হবে। সেই জন্যই আমরা প্রতিক্রিয়া-শীল বিষয়বস্তু সম্পন্ন শিল্পকর্মের যেমন নিন্দা করি, তেমনি নিন্দা করি প্রাচীরপত্র

বা শ্লোগানের ভঙ্গীতে রচিত শিল্পকর্মের, যাতে কেবল বিষয়বস্তু রয়েছে কিন্তু নাই রূপরীতি।"১৪

শিল্পগুণ নির্মাণে অমরেন্দ্রর সংগে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈকট্য লক্ষ্য করা যায়।

উদ্বাস্তু জীবন

উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে রচিত অমরেন্দ্রর গল্প উপন্যাসগুলি যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি। তিনি নিজেও একজন উদ্বাস্তু হয়ে আসেন কলকাতায়। ফলে এই জীবনের সমস্যা, যন্ত্রণা এবং বঞ্চনা তিনি নিজের জীবন দিয়ে যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করেছেন, অমরেন্দ্রর পূর্বে তেমনটি আর আমাদের নজরে আসেনি। তাঁর আগমন সম্পর্কে জবানবন্দীতে তিনি নিজেই লিখেছেন, "যুদ্ধোত্তর যুগে আমি এলাম। কি বলব, হয়ত ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল, নয়ত কোন দুজ্ঞের্য় শক্তির টানে কেন আমি আমার প্রশ্নের জবাব হয়ে এলাম? সভ্যতা ভাঙে অসমবণ্টনে, মনের, অর্থের অথবা ভূমি ব্যবস্থার। আমার যে কোন উপন্যাস অথবা ছোটগল্প খোলো এর নজির পাবে। আমি সার্বিক দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করেছি। যে কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ গৌণ ছিল সাহিত্যে, তাদের রক্ত মাংসে মননে মুখ্য করতে ঘাম ঝরিয়েছি।"১৫ এই প্রসংগে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও দেশত্যাগের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও প্রীতি মধুর জীবনযাত্রা রমেশ চন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ সাই (প্রাণগঙ্গা) প্রমুখ পরিণত বয়স্ক লেখকদের রচনার উপজীব্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে।"১৬

'আহবান' গল্পটি ১৩৫৮ সালের শারদীয় তরুণের স্বপ্নে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার কয়েকমাস আগেই প্রকাশিত হয়েছে অমরেন্দ্রর বিখ্যাত উপন্যাস 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'—দুয়েরই উপজীব্য উদ্বাস্তু জীবন। এখানে আমাদের আলোচা শুধু গল্পটি।

গল্পের মূল চরিত্র দেশত্যাগী তারিণী আর তার একমাত্র নাতি। "তারিনী এই কিছুদিন পূর্বে দেশ ছেড়ে সপরিবারে এখানে এসেছিল। সংগে সংগে কি জানি একটা চুক্তি হল উভয় রাষ্ট্রে। হঠাৎ রিলিফ বন্ধ হয়ে গেল। তারিণী ক্যাম্প থেকেই আবার ফিরে গিয়েছিল দেশে। রাতারাতি নাকি সমস্ত আবহাওয়া বদলে গেছে ওদিকের—বইছে নাকি প্রেমের বন্যা। কাগজে কর্তাদের হাস্যমুখের ছবি দেখলে অন্তত তাই মনে হয়। বিভ্রান্ত হয়ে তারিণী ফিরে গিয়েছিল সপরিবারে স্বদেশে। চুক্তি প্রসব করল এক সুপক্ক রসাল মাকাল। এবার ওরা

কখন ফিরে এল—অবশিষ্ট আছে মাত্র দাদু ও নাতি। তারিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আর সবই তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। ওর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ মরেছে আগুনে পুড়ে। ওঃ সে কি আগুন—চাওয়া যায় না চোখ মেলে। তারিণী সেই অগ্নিশিখাই যেন দেখতে পেল এখানে এই নিরাপদ বাংলায় ফিরে এসেও।"

এই বৃদ্ধ বয়সে তারিণীকে আবার উদ্বাস্তু হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। তাই বয়সের ভারকে অতিক্রম করেও একমাত্র নাতিকে কাঁধে তুলে চলতে হচ্ছে। অথচ বালক তৃষ্ণায় কাতর। কিন্তু জল কই? ভিটামাটি উৎসন্নে যাওয়া, ঘর পোড়া বুড়ো ভূষন্ডীর বুকের দাহ কমবে কিসে? কোথাও তো নেই একটি পাত-কুয়ো। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে কেউ তো বন্ধুর মত ওদের জন্য রাখেনি একটি জলছত্র পর্যন্ত পথের প্রান্তে খুলে।

"তারিণী সব জানে। ত্রিশ বছর পাঠশালার পন্ডিতি করে তার মুখস্থ হয়ে গেছে ভূগোল। কিন্তু এখানে কি দেখছে সে! শুধু ঢক্কা নিনাদ শুধু বহ্বাড়ম্বর! তারিণীর চোখে জল এল। জল এল নিজের পিপাসার কথা ভেবে নয়, ভাবল দাদুভাইর কথা। 'ওরে আমার শেষ খেয়ার একরত্তি সোনা…… 'বাক্যটি আর শেষ করতে পারল না তারিণী—গলা তার ধরে এল। তৃষ্ণার্ত বালক বলল, চলো দাদু, চলো কাঁদে না চলো। আমার কষ্ট হচ্ছে না মোটে।"

তারিণী বহু কষ্টে একটা শ্মশান থেকে ভাঁড় কুড়িয়ে পুকুর ছেঁচে কাদা জলই নিয়ে আসে। কিন্তু প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহে ভাঁড়টাও শুষে নেয় সমস্ত জলটা, ভেঙে যায় খান খান হয়ে। "তারপর শেষ হল অপরাহ্ণ, ক্রমে সায়াহ্ন। ধীরে ধীরে দাদু ও নাতি অদৃশ্য হয়ে যায় আঁধারে। ……বহুদূর থেকে শোনা যায় একটা কলের কর্কশ আওয়াজ—বোধহয় সিটি বাজল সন্ধ্যার। কিন্তু তারিণী পন্ডিত স্পষ্ট দেখল—গেটটা সম্পূর্ণ খোলা—অনিবার্য আহ্বান জানাচ্ছে যেন প্রভাতের।" গল্পের শেষটি আমাদের চমৎকৃত করে। দুঃখ, দারিদ্র, যন্ত্রণা বঞ্চনাই জীবনে একমাত্র সত্য নয়—এ সবের পরে আসে নতুন জীবনের উত্তরণ— নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে নতুন প্রভাত। সেই নতুন প্রভাতের আহ্বানেই গল্পের সমাপ্তি।

'সহরতলির আশে পাশে'—১৩৫৮র কার্তিক সংখ্যা প্রবাহতে প্রকাশিত হবার সংগে সংগে পাঠক মহলে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। এক কারখানার মালিক তার বাড়তি অংশে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু ক্যাম্পটি কেমন ভাবে কৌশলে চক্রান্ত করে তুলে দিতে চাইছে আর সেই চক্রান্ত সকলের মিলিত এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে কেমন করে ব্যর্থ হয়ে যায়, সে কথাই অমরেন্দ্র আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। এ গল্পেও তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা তীক্ষ্ম ফলার মত কাজ করেছে।

গল্পের ঘটনাস্থল সহরতলীর আশে পাশে বিভিন্ন অস্থায়ী উদ্বাস্তু ক্যাম্প। উদ্বাস্তু অমরেন্দ্র লিখেছেন, "আমি চলেছি এক উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করতে রাত কটা তা ঠিক খেয়াল নেই। কোন পথ ধরে কোন দিকে যাব, তাও বলতে

পারছি না সঠিক। কিন্তু চলেছি একা এগিয়ে। আজ এত আঁধার এল কোত্থেকে ? আকাশে তো মেঘ নেই—বাতাসে তো পুরু ধুলোর আস্তরণ নেই। —কৃষ্ণপক্ষের রাত কি এতই কালো ? বিশ্বব্রহ্মান্ড ময় কি দোয়াত উল্টে ছড়িয়ে পড়েছে চিত্রগুপ্তের তৌরিজলেখা ঘন কালি ?"

অন্ধকারের বুক চিরেই লেখক এগিয়ে চলেছেন উদ্বাস্তু শিবিরের উদ্দেশ্যে। মনে ভাবতে থাকেন, উদ্বাস্তুরাতো এখানে পাচ্ছে রাজকীয় আতিথ্য, নাটকীয় সৌজন্য। এখানে অপমৃত্যু নেই। তবু কি আশ্চর্য কেবলই খালি হচ্ছে শিবির—শ্মশানে শ্মশানে শিশু, প্রসূতি ও বুড়োদের ভিড়। সেই উদ্বাস্তুদের কি মনের কালি লেপটে গেছে আকাশে, বাতাসে, এই সহরতলীর পথে। "ওরা নিশ্চয় মরবে—এই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুরা—নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একটা বিরাট মনুষ্য সমাজের বলিষ্ঠ অংশ। ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল আমার বুকটা। আমিও পূর্ব বাঙলার মানুষতো। ওদের সঙ্গে হেসে, খেলে' সময়তে ঝগড়া করে মানুষ হয়েছি। শৈশব, কৈশোর ও প্রৌঢ় জীবনের এক স্মৃতি এল ভেসে। এ স্মৃতির দাগ বড় কড়া, ভোলা যায় না কিছুতে। তাই তপ্ত হাওয়ায় জ্বলতে জ্বলতে চললাম।"

লেখক আজ কোন কলোনীতে যাবেন না, যাচ্ছেন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। স্থানীয় উৎসাহী ছেলেরা প্ল্যাটফর্ম ও ফুটপাথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে প্রায় দেড়শ রিফিউজি। স্থান দিয়েছে একটি কারখানার বাড়তি দালানে। খবর এসেছে যে রিফিউজিরা নাকি ভীষণ উত্তেজিত হয়েছে। ঘুরছে নাকি লাঠি সোঁটা নিয়ে। ভেঙে তছনছ করছে যত ক্যাম্পের দামী আসবাব। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছিল না অনেকে। হাজার হলেও এদের দুর্নাম আছে এক গুঁয়েমির। "শিবিরে কেউ যেতে রাজী নয়। তদন্ত করতে আমাকে যেতে হল। কারণ আমার বাড়ি বরিশাল—একেবারে রাজাপুর থানার এলাকায়—যেখানে এবার একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে দাঙ্গার। যতই ক্যাম্পের কাছে এগুচ্ছি, এখন ততই ভয় হচ্ছে মাথাটার। আবার লাঠি সোঁটা না পড়ে। মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়লাম ক্যাম্পে, ভাষা বদলে ফেললাম নিমিষে, কি হইছে, কি হইছে আপনাগো ?"

রাত প্রায় দশটা। তখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয়নি রাত্রির আহারের। বাতি নেই—সারা ক্যাম্পটা অন্ধকার। কোথায় লাঠি-সোঁটা, কোথায় ক্ষেপুনি। মানুষ আছে কি নেই বোঝা দায়। অতি কষ্টে একটা বাতি জ্বলল। সে এক বীভৎস দৃশ্য লেখকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। "দু'টি কলেরা রোগী মরণাপন্ন। একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে নাকি পাগল হয়েছে। তিন চার জনার ভীষণ জ্বর—বসন্তের আক্রমণ অনিবার্য। ইতিমধ্যেই শিশু ও বৃদ্ধ মরেছে দু'টি। যারা বেঁচে আছে তারা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারের মতই যেন চুপ করে রয়েছে। পূর্ব বাঙলার নানা স্থান থেকে ভেঙে এরা এসেছে কলকাতায়।"

ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে লেখক এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। ক্যাম্পের চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে, তেল নুনও ঘাটতি হয়ে আসছে মুদির দোকান পেরিয়ে রাস্তায় এসে। যে সব তরুণী অভিভাবকহীনা তাদের কাছে এসে দূর সম্পর্কের সব মেসো পিশে দাঁড়াচ্ছে। দরদ দেখাচ্ছে অপরিমেয়। এদের জীবন কথা শুনতে শুনতে লেখক বলেছেন,

"আমি সাংবাদিক নই, একজন সাহিত্যিক। আমার অশ্রু রোধ করা দায় হল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম—এই ভাঙনই এক নতুন সমাজের সৃষ্টি করল, এবার আমাদের মধ্যে গড়ে উঠবে নিশ্চয় একটা নতুন নিবিড়তা—বৈষম্যহীন সমাজের এক মহত্তর ব্যবস্থা।"

লেখক আরও শুনলেন, ঝড়-ঝাপটা খাওয়া একটা নারকেল গাছের মত এক ছোকরা নাকি গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, ওদের সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়, রাজনীতি বোঝাবার চেষ্টা করে। মোটকথা ওরা সকলে সব কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছে যে সরকারী রিলিফ আসবে না, এবং এলেও ওরা ক্যাম্পে অনিবার্য মৃত্যু বরণ করতে যাবে না। থাকবে এইখানে, করবে মাছ ডিম, আলুর কারবার। কেউ কেউ খুঁজবে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, তাঁতের কাজ, সহরতলী ব্যতীত ওরা বাঁচবে না। আরও জানা গেল, কারখানার মালিকই চক্রান্ত করে জনমত বিভ্রান্ত করার জন্য ওদের নামে গুজব

।

"লেখক এবার জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আপনারা করবেন কি?

সকলের হয়ে বুড়ো জবাব দিল, অতিকণ্টে এপার আইস্যা লঙর ফেলাছি জোয়ারের আশায়—এই উজানে কি 'পারা' (নোঙর) তোলা যায় মশায়?

কোন্ জোয়ারের আশায় এরা অপেক্ষা করে দিন গুনছে তা আমার বুঝতে কণ্ট হল না—তাই আমি মনে মনে নমস্কার জানালাম সেই অপরিচিত রাত্রিচর বন্ধুটিকে।"

উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়, নিঃসম্বল, দুঃখ-দারিদ্র, শোক-তাপ, অনাহার, অনিদ্রার মাঝেও এই ছিন্নমূল মানুষকে অমরেন্দ্র বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার পতাকা-তলে সমবেত করেছেন।

'দহন' গল্পটি অমরেন্দ্রর অসাধারণ শিল্পকর্মের আর একটি নিদর্শন।

স্খলন, পতন—কিংবা পাপের পংকিল আবর্তে জীবন, পতিতাবৃত্তি—এ সব নারীর সতীত্ব বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয় নারীর আসল পরিচয় তাঁর চিরন্তন মাতৃত্বে, মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনে। আলোচ্য গল্পে নারীর সেই চিরন্তন শাশ্বত মাতৃত্ব এবং মনুষ্যত্ব বোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন অমরেন্দ্র এক পতিতা নারীর মধ্যে। মানদা নামে এই পতিতা নারী—এক পতিতালয়ের সর্বময়ী কর্ত্রী। তার দিন শেষ হয়েছে, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে।

এই মানদাই একদিন রেল স্টেশন থেকে কুড়িয়ে এনেছিল আতরকে। সেদিন কোনো বিপদকে সে বিপদ বলে মানে নি। কারণ একটি মেয়ের তার প্রয়োজন। বাঁচলে, সে মেয়ের জীবনস্বত্ব ভোগ করার একমাত্র অধিকার ও স্বামিত্ব তার। মানদা তার নাম রেখেছে আতর। আতর ইতিপূর্বে দু'বার গর্ভবতী হয়েছে—দু'বারই মানদা তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু মানদা যখন শুনল আতর আবার কপাল পুড়িয়েছে, তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে বলে ওঠে,

"আমি এবার তোমায় খ্যাংরা মেরে বিদায় করবো। আমার বুঝি থানা-পুলিশের ভয় নেই যে বার বার তোমায় নিয়ে নাচব ?"

কিন্তু তবুও মানদার সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে-আতর একটি ফুট-ফুটে পুত্র সন্তান প্রসব করে। এখন মানদার চোখের সামনেই সেই শিশু হেসে খেলে বেড়ায়। এই জারজই এখন তার চক্ষুশূল।

"একটা নৃশংসতা তার ভিতর খল খল করে ওঠে। মানদা বিষ সংগ্রহ করে। ক্রোধে উত্তেজনায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে। আইনের খাবার কথাও সে বেমালুম ভুলে যায়।"

কিন্তু পারে না বিষ দিতে। অবশেষে একদিন সকলের নজর এড়িয়ে মানদা নিজের বস্তিতেই আগুন লাগাল।

"দেখতে দেখতে আগুনের লেহি লেহি ঝলক। মৌমাছির মত সকলে হাউ-মাউ করে বেরিয়ে আসে। আতর, প্রফুল্ল, মুদী, ময়রা, মানদা সব। একটু বাদেই আতর ডুকরে ওঠে। ঘুমন্ত ছেলেকে আনা হয় নি। আতর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লুটিয়ে পড়ে। মানদার ক্রুর বুদ্ধি করতালি দেয়—এত দিনে, এত দিনে ঈশ্বর দেখেছেন। সে রাঙা চোখে হিংস্র সাপিনীর মত চেয়ে থাকে। এইখানেই মুষলপর্ব শেষ। ও কে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে, আজ মুঠো মুঠো হাসি কই? সারা সুকুমার মুখে যে মুক্তোর বন্যা নামছে অঝোরে।"

"মাতাল মানদা আবার হিতাহিত জ্ঞান হারায়। সে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে বালককে বুকের তলায় আগলে নিয়ে ফিরে আসে। আতর ছুটে যায়। শিশু বাঁচে, কিন্তু মানদা বাঁচে কি না সন্দেহ।"

এই মানদার মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্র মানবতাবোধের বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

'ডালিয়া' গল্পে অমরেন্দ্র উদ্বাস্তু জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশের শিল্প-নৈপুণ্যে। পূর্ব বাঙলার একদল ছিন্নমূল উদ্বাস্তু দাঙ্গা ও দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার মাটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার টালিগঞ্জ-যাদবপুর অঞ্চলে। ফাঁকা মাঠগুলি জবর দখল করে কলোনী তৈরী করেছে। আবার

বাস্তুচ্যুত হবার ভয়ে-এবার তারা প্রথম থেকেই সংঘবদ্ধ। দেশত্যাগের সময় বাপ-দাদার ভদ্রাসন, জোত, গোয়ালগরু, লাঙল, সব খুইয়ে এলেও— তাদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে কিন্তু হারায়নি।

'ডালিয়া' গল্প অবলম্বনে অমরেন্দ্র পরবর্তীকালে 'একটি স্মরণীয় রাত্রি' নামে একখানি বৃহদায়তন উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সে উপন্যাস আজও অপ্রকাশিত থেকে গেছে।

আলোচ্য গল্পে শেখরই প্রধান চরিত্র। অমরেন্দ্র জগৎ ও জীবনকে দেখতে ও দেখাতে গিয়ে এখানে শেখরের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। এই দেখা ও দেখানো হয়েছে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন নিয়েই। শেখর এখানে অত্যন্ত পরোপকারী মানুষ। সে নীরবে মানুষের প্রয়োজনের দিনে এসে দাঁড়ায়— আবার প্রয়োজন শেষ হলে নিঃশব্দে কখন চলে যায়। এ চরিত্র তো অমরেন্দ্রর দেখা। তাঁর নিজের জীবনের সংগেও তো এ চরিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও এ সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, তবুও এখানে তাঁর নামটি উল্লেখ না করলে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে। তিনি হলেন সত্যেন সরকার।

"রাস্তা—ফুটপাথ—ট্রাম-বাস গিজ গিজ করছে। ডালহৌসী স্কোয়ার লোকে-লোকারণ্য। সাহেব, কেরাণী, মেয়ে টাইপিস্ট, বেয়ারা, বড়বাবু সব যেন ভিড়ে মিশে গেছে।"

এইখানেই শেখর-অজয় মুখোমুখি হয়। একই অফিসে কাজ করে ওরা। অজয় ছাপোষা-সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে লড়াই করে চলেছে। থাকে যাদবপুরের কলোনীতে। তার পোষাক পরিচ্ছদে দারিদ্রের তীব্র জ্বালা ফুটে উঠলেও শেখর তার বিপরীত। ভাল বেতন, একটি চাকর ছাড়া তার আর কেউ নেই। অজয়ই শেখরকে তাদের কলোনীর একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু যায় না। পরিবর্তে সে ছোটে মেট্রোতে একটি ইংরেজী ড্যান্স ড্রামা দেখতে। মেট্রোতে আসতে গিয়েই সে রেবতীর অন্ধ বাবার পা মাড়িয়ে বিপত্তি ঘটায়। পরিচয় হয় ফ্রক পরা রেবতীর সংগে। তারপর বাসে করে ওদের শিয়ালদহ রেল স্টেশনে এনে, টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে দেয়। তারপর শেখরের কাছ থেকে আরও কুড়িটা টাকা চেয়ে নেয় একটু কৌশল করে। ভাসতে ভাসতে শেখর সত্যিই চলে আসে কলোনীতে অজয়ের খোঁজে।

কলোনীতে পেঁছবার সংগে সংগে "তার গলায় একটি মেয়ে মালা দেয়। আবার শাঁখ বাজে। একটি বিবাহিতা মহিলা এগিয়ে এসে শেখরের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দেয় সযত্নে। দুটি শিশু জানায় স্বাগতম্। মহিলা বলে, নমস্কার। আমি আপনার বন্ধুর স্ত্রী। আজ আপনার বিয়ে।" এমন সময় অজয় এসে পড়ে। তারপর বলে, "এখন কাজের কথা শোন। এটা

আমাদের কলোনীর লাইব্রেরী। তুই এখানকার সহ-সভাপতি।" শেখর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে।

একটু বাদেই সভা আরম্ভ হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, "অজয়ের মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি—এখন দেখলাম যে সত্যিই তুমি একজন উপযুক্ত লোক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহক। এ পাঠাগারের ভবিষ্যৎ তোমার ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনেই কাশী চললাম। বাবা বিশ্বনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন। আমি পূর্ব বাঙলার বাসিন্দা নই, ভাঙনের কোনো বাতাসই আমার গায়ে লাগেনি, স্রেফ তোমার উদারতায় আমি এগিয়ে এসেছি। তুমি গোপনে তিনশ টাকা এই লাইব্রেরীকে দান করেছ, আমরা কি ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারি?"

ফেরার মুখে ট্যাক্সিতে উঠে শেখর অজয়কে জানাল, আমাকে তিনশ টাকা ফেরৎ না দিয়ে সৎকাজে লাগিয়ে ভালই করেছিস। অজয় কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই মিটিং ফেরতা জনতার কণ্ঠে শোনা যায়—"কলোনি আমরা ছাড়ব না, ছাড়ব না, ছাড়ব না ...."।

উদ্বাস্তু জীবনের দারিদ্র, অভাব-অনটন, তাদের উঞ্ছবৃত্তির পাশাপাশি এসেছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সুস্থ সংস্কৃতির জন্য লাইব্রেরী—সবার উপরে মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা—গল্পটিকে অমরেন্দ্রর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পের শ্রেনীভুক্ত করেছে। বাংলা ছোটগল্প আজ অনেক নিষিদ্ধ দরজা খুলেছে। চোর, ডাকাত, হাঘরে, ভিখারী, পতিতা—প্রভৃতি নানা অবহেলিত শ্রেনীকেই জানিয়েছে স্বাগত। স্খলন, পতন ও পাপ তাপের আড়ালে সুপ্ত মানবতার উৎসটি উন্মুক্ত করে দেখিয়েছে তাদেরও। ব্যক্ত করেছে তাদেরও মানুষের মত বাঁচার অধিকার। তাই অমরেন্দ্রর গল্পের এই বৈশিষ্ট্য গুলি তাঁর গল্প—সাহিত্য কে বিশ্ব—সাহিত্যের বৃহৎ আকাশকে স্পর্শ করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

মধ্যবিত্তের জীবন ও সংগ্রাম

আলোচ্য পর্যায়ে অমরেন্দ্রর-স্বপ্নবাস্তব, প্রেমের কবিতা, মুখোমুখি, স্বরভঙ্গ, চন্দনদার, অসমাপ্ত চুম্বন, মৃগমদ, বাণী দিন বাণী দিন, ঠিকানা, আত্মসাৎ, সাহিত্য পাড়া, গড়িয়ে দিলাম, ডিউটি—মোট ১৩টি গল্প আলোচনার জন্য সংগ্রহ করা গেছে। অমরেন্দ্রর মোট গল্প সংখ্যা ও তার তালিকা সংগ্রহ করা গেলেও, সব গুলি একত্রিত করে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। হলে গল্প শিল্পের আরও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যেতে পারত।

'স্বপ্নবাস্তব' (কথাবার্তা, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩) গল্পটি জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে এক সংগ্রামী ভীল সম্প্রদায়ের আলেখ্য রচনা করেছেন অমরেন্দ্র। "আগুন

লেগেছে যেন দুনিয়াতে। টপ টপ করে ঘাম ঝরছে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন বন্যা ছুটেছে। শিরা-উপশিরা গুলো ফুলে উঠেছে দড়ির মত। মাংসপেশীগুলো নাচছে শরীরের ঝাঁকুনির তালে তালে। পরণে সামান্য একখানা কৌপিনের মত নেকড়া। কোদাল চালাচ্ছে ভাগলু। পদ্মা চেয়ে দেখছে পরিশ্রমী পুরুষের শ্রী।" পদ্মা আকৃষ্ট হল ভাগলুর প্রতি। ভাগলু অসাধারণ পরিশ্রমী। পাথরের বুকে গাঁইতি চালিয়ে সে ফসল ফলায়। কিন্তু গ্রামের ভুঁইয়াবাবুদের এক ভাতিজা পদ্মাকে সাদি করতে চায়। "রাম সিং লম্পটে লম্পট, ডাকাতে ডাকাত, গুন্ডায় গুন্ডা। এ প্রস্তাবে রাজী না হলেও জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে পদ্মাকে।" অবশেষে দূরগ্রামের আলস্য পরায়ণ শুকদেবের সংগে সাদির বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলে পদ্মার মা বাবা। গভীর রাতে পদ্মা ছুটে আসে বটগাছের তলায় শিবলিঙ্গের কাছে প্রার্থনা করে ভাগলুর সংগে সাদির।

শুকদেবের সংগে সাদির পর ডুলিতে চড়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে। বাঘের গর্জন শোনা যায়। "পদ্মা ভাবে, রামসিং কি যে-সে শয়তান! এবার তার জান যাবে—ইজ্জত যাবে। জীবনটাই থাকবে কিনা কে জানে! হে মহাদেও, তুমি একি করলে! কোথায় দ্রৌপদী-সখা নারায়ণ? পদ্মা নিজের অজ্ঞাতেই ডুলি থেকে নেমে দাঁড়ায়। ডাকাতি হয়ে যায়। বহুরী নিখোঁজ। রামসিং-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। পরদিন পদ্মা হাসতে হাসতে তুলে দেয় প্রকান্ড শালপাতার বোঝা ভাগলুর মাথায়। যাবে বাজারে। নতুন সংসার—বহু প্রায়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হবে।" এই ভাবেই জয়ী হল সংগ্রামী ভীল যুবকের সংগে কনৌজ ব্রাহ্মণ কন্যা পদ্মার ভালবাসা।

'প্রেমের কবিতা' (শারদীয় বসুমতী, ১৩৫৯) মূলত গল্প। কিন্তু এ গল্পে জীবন যুদ্ধে বঞ্চিত, শোষিত, হৃদয়ের অপরিমেয় ভালবাসায় উদ্বেল এক সংগ্রামী কৃষক চরিত্র কাব্যময় অপূর্ব ভাষায় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। অমরেন্দ্র মূলত কবি, তাই এখানে কাব্যের ব্যঞ্জনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অমরেন্দ্র তার শ্রেষ্ঠগল্পের যে তালিকা তৈরী করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়—সেখানে এই গল্পের নাম বদল করে 'ব্রজদাসের কুঠার' রেখেছেন। যাই হোক ব্রজদাসই যখন এ গল্পের প্রধান চরিত্র—তখন নামে কি আসে যায়। এই ব্রজদাস একই মূর্তিতে অমরেন্দ্রর 'কনকপুরের কবি' উপন্যাসেও আবির্ভূত হয়েছে। আসলে ব্রজদাস কোন বিশেষ যুগের চরিত্র বিশেষ বা প্রতিনিধি নয়—সে চিরকালের। অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে—ভবিষ্যতেও থাকবে।

গ্রামের কবি প্রিয়নাথকে মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে ব্রজদাস দাঁড় করিয়েছে তার জীবন কাহিনী শোনাবার জন্য। ব্রজকে দেখে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রজ তো পাগল ছিল না। অমরেন্দ্র ব্রজর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, বলিষ্ঠ বাহু, কি না ছিল ব্রজদাসের? রূপ?

তামার তাওয়ায় নীল আগুন গন-গন করত! একটা হাটের ভিতর তাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হত না।" এই প্রিয়নাথকে ব্রজ ধরেছে তার জীবন নাট্য রচনার জন্য। ব্রজ বলে, "এখন কিষাণ খাটি তখন কিষাণ ডাকতাম।" তারপর ব্রজ পরেশের সুন্দরী স্ত্রী যশোদার রূপে আকৃষ্ট হল। গ্রামের বুড়ো শকুন চক্রবর্তীর আশ্বাসে ব্রজ যশোদাকে নিয়ে ঘর বাঁধল। কিন্তু বুড়ো শকুনের চক্রান্তে পরেশ ও ব্রজ উভয়েরই জমি-জমা গিয়ে তার পেটে ঢোকে। তারপর একদিন অকালে একটি মরা সন্তান প্রসব করে যশোদা মারা যায়। কিন্তু ব্রজ তাকে ভুলতে পারে নি, প্রেমে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আবার একদিন প্রিয়নাথকে বাড়িতে ধরে আনে ব্রজ। জীবন নাট্যের শেষে অংকটা বলবে বলে।

"দাসের কথা তো ফুরাবার নয়। প্রেমের কথা কি শেষ হয় কখনও? দাস শুধু প্রেমে নয়, জীবন সংগ্রামেও বঞ্চিত, শঠের পরামর্শে একেবারে দেউলিয়া। এমন অবস্থায়ই মানুষ বিবাগী হয়, ঠকে ঠকে টিকিট করে কাশীর। কিন্তু সে পথ তো দাস আজও পর্যন্ত ধরে নি। সে এখন কৃষাণ খাটে পরের ভূঁইতে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে। আশ্চর্য ঐ মানুষটি! ও একটা গড্ডালিকা প্রবাহে উদ্ধত ব্যতিক্রমের পাহাড়।"

তারপর একদিন রাত্রে ব্রজদাস ধরা পড়ল বুড়ো চক্রবর্তীকে খুন করতে গিয়ে। পাশে পড়ে রয়েছে তার বিশ্বস্ত সংগী কুঠারটি। প্রিয়নাথ তাকে জিজ্ঞাসা করল,

"দাস, উন্মাদের মত এ কাজ করতে গেলে কেন? ব্রজদাস ধীরে ধীরে জবাব দিল, যেন তার ধ্যান ভাঙল প্রিয়নাথের প্রশ্নে। 'নইলে তুমি লিখতে কি? এই তো আমার শেষ অংকের বয়ান।"

গল্পের শেষে ব্রজদাসের মুখের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্র যেন বলতে চেয়েছেন, ঐ মুখে বহ্নিমান ভাষা জোগাতে হবে, বাহুতে জোগাতে হবে শক্তি—আর ঐ মুখের মত চাহনিগুলো ক্রুর নির্মম করে তুলতে হবে, তবে না হবে গণশক্তির অভ্যুত্থান। কবি ওদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বল। সেই জ্ঞান ও সেই বিবেক ওদের ভিতর জাগিয়ে তোল। বৃদ্ধ ব্রজদাস একখানা কুঠার দিয়ে যে পরিচয় রেখে গেছে তা কেউ লক্ষ্য করবে না? হয়ত সে আর জেলখানা থেকে ফিরে আসবে না, কিন্তু তার পরম কীর্তি ভুললে তো চলবে না। একখানা হাতিয়ারে যে ঝলক দেখিয়েছে, সহস্রখানা হাতিয়ারে তার সহস্র গুণ ঝলক দেখান চাই—এ ছাড়া বাঁচার আর কোনও পথ নেই। এ যেন এ যুগের বাঁচার ইষ্টমন্ত্র।

'মুখোমুখি' (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯), 'স্বরভঙ্গ' (শনিবরের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২) গল্প দুটিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের দৈনন্দিন-অভাব-অনটন, দারিদ্র, সমস্যা ও অবক্ষয়ের মধ্যেও প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার

পাশাপাশি নিঃসহায় দরিদ্র মানুষের প্রতি সমবেদনার ছবি এঁকেছেন অমরেন্দ্র।

'চরনদার' (শারদীয় বৈশাখী ১৩৬৩) গল্পের নায়ক চরনদার সেলিম। "উনিশ শ পঞ্চান্নর স্বাধীন দুনিয়ায় সে চাঁদ বিবিদের ঠিকা কিষাণ। জমিতে জল, হাল চলে না—তাই এখন সে এই সিমতলীর গাঁয়ে, এমনি বেগার দেওয়া এ দেশের প্রথা।" এই সেলিমই এসেছে চাঁদবিবির চিঠি নিয়ে সাহেরবানুকে নিয়ে যেতে। "সাহেরবানু কুটুম্বিনী নয় ঠিক—চাঁদবিবির বন্ধু। ছোট বেলায় এক পাঠশালে পড়েছে দুজনে।" তারপর বিয়ে হয়েছে দুজনের। চাঁদবিবি সুখে সংসার করছে, কিন্তু সাহেরবানু তালাক নিয়ে চলে এসেছে। সাহেরবানুর বিড়ম্বিত জীবনের কথা শুনে সেলিম তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে তো "ঠিকা কিষাণ। আজ আছে এখানে—নইলে হয়তো অন্য কোনো গ্রাম গঞ্জে। ভদ্রাসনে তার বসত ঘরখানা পর্যন্ত নেই। এমনি সময়—অসময় বেগার দেওয়া তাদের অদৃষ্ট। এখন চাঁদবিবি তার মালিক। সে যেমন স্বপ্ন জাগিয়েছে, তেমনি ভেঙে দিয়েছে তার মর্জি মত।" চাঁদবিবির ছেলে মোতালেপের জন্মোৎসবে সাহেরবানুকে নিতে এসেছে সেলিম।

তারপর সাহেরবানুকে নিয়ে সে যাত্রা করে। ওদের সংগে যায় বুড়ো মিঞা। নৌকার বৈঠা টানতে টানতে সেলিমের মনে কত স্বপ্ন জাগে। কিন্তু তার মনের কথা কেউ কান পেতে শোনে না। নৌকা এক একটা ছোট বাঁক ঘোরে আর প্রাণ কেঁদে ওঠে সেলিমের। নৌকা এসে থামে নির্দিষ্ট ঘাটে।

"এগিয়ে গিয়ে সেলিম সবিনয়ে ডাকে, 'বিবি সাহেবা'? সাহেরবানু একটু চমকে থামে। এর মধ্যেই চাঁদবিবি দল বল নিয়ে হাজির হয়। একটু পরেই হর রা হাসি আলোর মিছিলে মিশে যায় সাহেরবানু। সেলিমের কথা অন্ধকার বাগিচায় নীরব হয়েই থাকে।"

দরিদ্র বেগার কিষাণ সেলিমের নীরব মূক প্রেমই এ গল্পের প্রধান বিষয়। অথচ অমরেন্দ্রর অপূর্ব শিল্পকুশলতা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ না করে পারে না।

'অসমাপ্ত চুম্বন' অমরেন্দ্রর গল্প শিল্পের একটি দুর্লভ নিদর্শন। এ গল্পের নায়ক দিবাকর দরিদ্র, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের সমবেত করে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জোটের মহল তৈরী করতে চায়। আর এ কাজে তাকেই সাহায্য করতে চায় জমিদার কন্যা কুন্তলা।

"জনসাধারণের কেউ নয় কুন্তলা, তবু যেমনি শুনেছে এই সর্বহারাদের কথা, অমনি ব্যথা জন্মে বুকে। ······এই মূক ও বধিরদের ভাষা জোগাতে হবে, দিতে হবে আশা, দিতে হবে বুক ভরা পূর্ণ ভালবাসা—মহাকবির অমৃতময়ী ছন্দ উথলে ওঠে কুন্তলার বুকে। তাই সে এক মহীয়সী দেবীর মত নেমে এসেছে ড্রইংরুম ছেড়ে।"

দশম শ্রেণীর ছাত্র দেবব্রতর সঙ্গে কুন্তলা চলেছে দিবাকরের সভাস্থলে, তার সঙ্গে আজ কুন্তলাকে আলাপ করতেই হবে। দেবব্রতর কাছ থেকে কুন্তলা দিবাকরের যে বর্ণনা পায় তা এই রকম—"সিংহের মত দেখতে, বন্য বরাহের মত উগ্র · আবার নাকি সাগরের মত শান্ত।" সভার একেবারে নিকটে এসে পড়ে কুন্তলা। "সভা বসেছে উন্মুক্ত মাঠে, নদীর লুপ্ত সীমানায়। নানা গাঁয়ের মানুষ এসেছে। ক্ষেতের কৃষাণ, জেলে-যুগী, মুসলমান চাষী—কিছু ছুতার কামারও এসেছে কাজ ছেড়ে। কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এরা সমবেত হয়ে সংঘ গড়তে চায়। দিবাকরই এদের চালক। একটি ভিন্ন গাঁয়ের ছাত্র এসে পরিচয় করিয়ে দিল, 'কুন্তলাদি ইনি হচ্ছেন সেই স্বনামধন্য দিবাকর। আর শুনুন কমরেড, ইনি হচ্ছেন আপনাদের জমিদারের মেয়ে, আমাদের কুন্তলাদি,' বিপ্লবের অগ্নিশিখা"। এই পরিচয়ে দিবাকর যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তার চোখে হঠাৎ জল আসে।
তারপর দিবাকর আরম্ভ করে,

"শোনেন দেবী, আইছেন যখন অনুগ্রহ কইরা, শুইন্যা যান – আপনার পিতায় আমাগো নাম উঠাইছে পুলিশের খাতায়। আমরা নাকি চোর ডাকু এগেরদের শয়তান। উঠাউক নাম, ধরুক, মারুক, দুঃখ নাই—কিন্তু বলন দিমু না খাজনা। কেন দিমু বলনা, একবার আপনেই বিচার করেন – আমাগো কি আয় বাড়ছে ভদ্রাসনের গাছগাছালির ফলের, না ফসল বাড়ছে জমির? নিলাম, কয়ড়ি নিলাম করাইবে—সর্ব্বহারা দুব্বাদল মাড়াইলেও যে ক্ষণে ক্ষণে গজাইবে।······ও ভাইরা, তোমরা কি বলন দিবা—মাথা পাইত্যা লইবা বজ্রাঘাত? না, না, না······ অস্বীকৃতির ঢেউ ওঠে চারদিকে। কুন্তলা হাততালি দেয়। সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, শুধু বক্তৃতা শুনে নয়, সিংহের মত আস্ফালন দেখে। গর্ব বোধ করে পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে বলে।"

স্বাধীন ভারতে বাংলা দেশের মাটিতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের এ ইংগিত মাত্র। পরবর্তী কালে দিবাকরের নির্দেশিত পথেই হয়েছে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন। এ গল্পের দিবাকর অমরেন্দ্রর 'ভোটের মহল' উপন্যাসের আরও বৃহৎ পটভূমিতে আরও ব্যাপকভাবে আছড়ে পড়েছে।

'মৃগমদ' (শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৬৩) এক ইরানী যাযাবর সম্প্রদায়ের ঠগ জোচ্চুরী, জালিয়াতী ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু সুলতান নামে এক আফগান যুবক—সিন্ধু-শতদ্রু পেরিয়ে রুটির আশায় এসেছে এদেশে। হিমে বন্যায় নাকি গহুম মকাই ফলেনি দু'বছর। সঙ্গে এনেছে হিং আর একশ টাকা ভরি মৃগ কস্তুরী। আর এই মৃগ কস্তুরী আত্মসাতের জন্য শিকারী বাজের মত সুলতানের পিছে পিছে ঘুরছে এক যাযাবর সম্প্রদায়। বুড়ো ইদ্রিস হল এদের সরদার। সাত-সাতবার

জেল খেটেছে—তার তুরুপের তাস বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী মেয়ে জুমেলি।

জুমেলির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন,

"আজ নসিবের ফেরে ওরা যাযাবর। ওদের বুড়া নানা নানী নাকি এমনি মৃগমদ নিয়ে এদেশের জমিনে পা দিয়েছিল। ওদের আসল ডেরা ছিল নাকি ইরান-তুরানে। সেই দেশেরই পড়শী এই তেজী টাট্টু। হিংয়ের আড়ালে নিয়ে এসেছে বাদশাহী দৌলত। ঠগবাজ মেয়ের হঠাৎ মন যায় বদলে। তার বুদ্ধি আর হাত ছলবল করে।"

এদের বাসস্থানের বর্ণনাটিও একেবারে নিখুঁত।

"একটা খোলা ময়দান। তৃণগুল্মের চিহ্ন নেই। কাঁকর পাথর শক্ত গেরুয়া মাটি। সেই মাটির বুকে ছোট একটা তাঁবু। ছেঁড়া ঝলসানো চটের আচ্ছাদন। হাত দেড়েক উঁচু। তিন হাত চওড়া, জোর হাত চারেক লম্বা। খুঁটিতে খুঁটিতে দড়ি বাঁধা। ওর মধ্যে সংসারের যাবতীয় সামগ্রী। এমনি সাত-আটখানা তাঁবু। কুড়ি পঁচিশ জনের একটা ভ্রাম্যমাণ দল। ওর ভিতরেই জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-নালিশ-সালিশ। এবং প্রায় এতগুলো ব্যাপারের খবরদারি করে জুমেলির নানা ইদ্রিস সরদার, মোড়ল বুড়া।"

জুমেলি ও ইদ্রিস উভয়েরই উদ্দেশ্য সুলতানের মৃগ কস্তুরী। তাই ইদ্রিস ছলে-বলে কৌশলে জুমেলির সাহায্যে আকাঙ্খিত বস্তু সুলতানের কাছ থেকে ছিনিয়ে তাঁবু তুলে চম্পট দেয়। চতুর্দিক ঘুরে অবশেষে ইদ্রিস ও জুমেলি আশ্রয় নেয় কলকাতায় এসে। কিন্তু সেখানেও সুলতান এসে হাজির।

"বাঘের থাবা দাবি করে, তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় কস্তুরী। জানের চাইতে বড় কিছু নয়। পলকে যাদুকরী ঝটকা মেরে সরে দাঁড়ায়। সুলতানের চাইতে বয়সে কিছু বড়। হিম্মৎ তার একেবারে কম নয়। সে তার কোমরের চাতালে চালিয়ে দেয় হাত। ছুরির বাঁটটা ধরে শক্ত মুঠিতে। তাঁবুটা লন্ডভন্ড হয়ে যায়। সুলতান আবার লাফিয়ে পড়ে। লড়াই চলে বুনো বাঘ-বাঘিনীতে যেন। কিন্তু চতুরা জুমেলি অচিরেই তার লড়াইয়ের কৌশল বদলায়। সে তার ছুরিটা চালিয়ে কেটে ফেলে পায়জামার ডোর। এবার বুকের ও মুখের মধুতে বিবশ করে দুশমন শেরকে। সকালবেলা এই বস্তির সকলে উঠে দেখে যে, একটা লাশ পড়ে রয়েছে। তাকে সনাক্ত করা দায়।"

অমরেন্দ্র অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়ে গল্পের শেষ টুকু আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে এই যাযাবর সম্প্রদায়ও বাদ পড়েনি। তাদের তুচ্ছ জীবনের কথাও সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

'ঠিকানা' ও 'আত্মসাৎ' গল্পে দুই সংগ্রামী যুবতীর জীবন সংগ্রামের কথা

বলা হয়েছে। 'ঠিকানা'র ইলা মধ্যবিত্ত পরিবারের এক চাকুরীজীবি যুবতী যে ইতিমধ্যেই জীবনের বিশটি বসন্ত পিছনে ফেলে এসেছে। আর 'আত্মসাৎ' গল্পে তের বছরের নমঃশূদ্রের মেয়ে আলতা পিতৃমাতৃহীন হয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়ে তেত্রিশে এসে—জীবনের হাহাকার তুলেছে। সমাজ জীবনের নিতান্ত তুচ্ছতম ঘটনাও যে লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি, অমরেন্দ্র যে সমাজের অতি তুচ্ছ, বিশেষ করে একেবারে অবহেলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে সাহিত্যের শাশ্বত মন্দিরে টেনে এনেছেন, এই গল্প দুটির ঘটনা সূত্রে তাই এখানে চিত্রিত হয়েছে।

'বাণী দিন বাণী দিন' (বসুধারা, মাঘ, ১৩৬৪), 'সাহিত্য পাড়া' এবং 'গড়িয়ে দিলাম'—গল্প তিনটিতে বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনার নেপথ্য জগতই প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। এখানে প্রকাশক, লেখক ও সাহিত্য বাজারের টাউটদের চরিত্র, চলন বলন ও কাজ কারবারের যে ছবি অমরেন্দ্র এঁকেছেন তা 'স্যাটায়ের' অপরিহার্য দাবিতে অতিরঞ্জন হলেও সত্য ও বাস্তব। হয়ত দীন-দরিদ্র লেখকের বহু বিড়ম্বিত জীবনের তিক্ততা থেকেই এই 'স্যাটায়ারে'র জন্ম হয়েছে। মুনাফার লোভে সংস্কৃতির সূতিকাগারে বসে প্রতিদিন যারা নবজাতকদের বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে, কলকাঠি করায়ও থাকায় সহজেই কাচকে হীরে ও হীরেকে কাচ করে দিচ্ছে, তীব্র ভাষায় ও তীক্ষ্ন-তির্যক ভঙ্গীতে তাদের কাহিনীই লেখক আমাদের শুনিয়েছেন এই গল্প তিনটিতে। প্রবঞ্চিত, পঙ্গু সমাজের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের অক্ষমতা ও কপটতার ছবি হিসাবে এই স্যাটায়ার ধর্মী গল্প তিনটি নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অমরেন্দ্র তাঁর 'জবানবন্দী'তে বলেছেন—"আমি গল্পকার নই, শিল্পীও ঠিক আমাকে বলা চলে না। বললে বলতে হয় সাহিত্যের শ্রমিক।"১৭ কিন্তু আমরা জানি তিনি একাধারে গল্পকার, অন্য ধারে যথার্থ শিল্পী, আর শ্রমজীবি সমাজের অত্যন্ত আপনজন। তাই তো তিনি বাংলা সাহিত্যে অচ্ছুৎ, অন্ত্যজ। সমাজের যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, সবচেয়ে বেশী খেটেও যারা পায় না কিছুই—সেই সব সর্বহারাই হল এ যুগের বল, এ যুগের সবচেয়ে বড় রূপান্তরকামী শক্তি। তাই সমালোচকরা অমরেন্দ্রর মূল্যায়ণ না করে তাঁকে বিস্মৃতির অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছেন। অথচ সমাজের এই সব মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করা নিঃসন্দেহে সম্মানের ব্যাপার। এ প্রসংগে রুশ লেখক নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

"The young people described in its masterpieces are young people of the ruling classes. How vividly, how forcefully, the great writers of bourgeois Literature have portrayed the young people of their own classes; their lives, the formation of their characters, their aspirations;

how they are trained in the pursuit of their glory; how, inheriting their parents' wealth they proceed to multiply that wealth, developing over further the technique of pumping the blood of working class ; It's a matter of honour for our Soviet writers to portray in their books, the young revolutionary of our own day, the day of proletarian revolution."১৮

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্র ঘোষ এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হওয়ার নাম নয় নিশ্চয়ই। রাশিয়াও নয় বাংলাদেশ। তবুও কোথায় যেন কি একটা মিল থেকেই যায়। একটা আত্মিক যোগাযোগ, যেন কোন গভীরতার বলয়ের গুনই এসে মিলিয়ে দেয় এদের সবাইকে। লোকের দুঃখ দেখে বুদ্ধ হওয়ার ব্যাতিক নয়। দুঃখী লোকেদের তল্লাটে নেমে এসে, তাদেরকে সাহিত্যের পাদ প্রদীপে এনে নিজেকেই সম্মানিত বোধ করা—এই একই মনস্তত্ব যেন কাজ করে এদের সকলের মর্মে মর্মে।

ভবিষ্যতে যে সমস্ত গল্প লেখকেরা আসবেন তাঁরা নিশ্চয়ই সংগ্রামী লেখক অমরেন্দ্র ঘোষকে জানাবেন অভিনন্দন, তাই সেই অনাগত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যেই রেখে গেছেন তাঁর প্রত্যয়—"যদি বামপন্থাই সংগ্রাম ও শান্তির পথ হয়ে থাকে, তবে আমার লেখার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ সে ঝংকার তোলেনি কি? যদি সত্যদর্শনের প্রত্যয় ও প্রতীতি সিদ্ধ পথে মহাজনেরা হেঁটে থাকেন, সে পথেও কি আমি চলিনি? সব প্রয়াস কি আমার বিফল হয়েছে? আমি অভিযোগ জনতার কাছে পেশ করে রাখলাম। আশা রইল আগামী দিনের মানুষ নতুন মূল্যায়ণে বসবে।"১৯

টীকা

১. কল্লোল যুগ—অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। পৃষ্ঠা ২৩৯
২ শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের কাছে সংরক্ষিত গল্পের সংখ্যা ১২৯।
৩. শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার, ২রা জুন ১৯৮৪
৪. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৯০—১৯১
৫. ঐ ২৩৫
৬. সরোজ দত্ত : স্বাধীনতা,। ৯ই পৌষ, ১৩৬২
৭. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৮০
৮. জবানবন্দী ২৫৬—৫০
৯. রবিবারের যুগান্তর : ৯ই জানুয়ারী, ১৯৫৫

১০. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১২৮—২৯
১১. ঐ ২০৪
১২. ঐ ২০৫
১৩. Party organisation & Party Literature
১৪. ইয়েনান বক্তৃতা : ২রা মে, ১৯৪২
১৫. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৮৪
১৬. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭২) পৃষ্ঠা ৭১০
১৭. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ৭৫
১৮. I render Account—N. Ostrovosky. May 16, 1935 H Hail Life—Foreign Language Publishing, Moscow.
১৯. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১৭২

পঞ্চম অধ্যায়

উপন্যাসের সৃষ্টি বৈচিত্র্য

তৃতীয় অধ্যায়ে অমরেন্দ্রর কবিতার আলোচনা প্রসংগে আমরা বলেছি—প্রয়োজন হল আরও বড় ক্যানভাসের। তাই কাব্য স্রোতস্বিনীর তীর ভূমি ছেড়ে এসে তিনি দাঁড়ালেন—উদ্দাম-উত্তাল পদ্মা-মেঘনার কূলে। সৃষ্টি আর ধ্বংসের, জীবন ও মৃত্যুর, হতাশা এবং সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মীলিত হতে লাগল তাঁর চোখের সামনে। —এই নব নব দিগন্তই চিত্রিত হতে লাগল তাঁর অসংখ্য ছোট গল্পে। কিন্তু গল্পের ক্যানভাসেও অমরেন্দ্রর শিল্পীমন সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। এবারেও ক্যানভাস বদল করে আরও বিশাল ক্যানভাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উপন্যাসই হল তাঁর সেই বিশাল ক্যানভাস। এই বিশাল ক্যানভাসে অংকিত অমরেন্দ্রর উপন্যাস গুলি সৃষ্টি বৈচিত্র্যে অসাধারণ।

১৩৩৪ সালে 'কল্লোলে' অমরেন্দ্রর প্রথম গল্প 'কলের নৌকা' প্রকাশিত হলেও তাঁর যথার্থ সাহিত্য জীবনের সুরু হয়েছিল দেশ বিভাগের পর। এ সময় থেকেই তাঁর বহু গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। 'কলের নৌকা' যেমন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প, তেমনি 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। অমরেন্দ্রর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৬ এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে আর ও দুটি। তাঁর উপন্যাস গুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করলে, তবেই তাঁর উপন্যাসের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সন্ধান করা যথাযথ হবে। (ক) হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন, (খ) উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম, (গ) স্যাটায়ার ও (ঘ) প্রতীকধর্মী।

(ক) হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবন।

'চরকাশেম' অমরেন্দ্রর রচিত প্রথম উপন্যাস নয়। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস মাত্র।

'চরকাশেম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৬-এ। অমরেন্দ্রর নিজের জবানবন্দী থেকে জানা যায় মুখ্যত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই 'চরকাশেম' ও 'পদ্মদীঘির বেদেনী' একই দিনে প্রকাশিত হয়। সেই হিসাবেই এই উপন্যাস অমরেন্দ্রর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

মেছো হাসেমের ছেলে কাশেম। কাশেমের বয়স যখন পাঁচ তখন হাসেম মারা যায়, একটা সাময়িক দুর্ভিক্ষে, "যে দুর্ভিক্ষ সচরাচর লেগেই আছে বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলে। ঠিক শস্যাভাবের দুর্ভিক্ষ নয়—এ দুর্ভিক্ষ ভূমিহীন কৃষকের বেকার জীবনের। এক পক্ষ ব্যাপী দুদীর্ঘ বর্ষা, তাতে ঝাপ্টা বাতাস। পদ্মায় জাল ধরা যায় না। জেলেরা সব বাড়ি বসে ঝিমায়। হাসেম তার মা মরা ছেলেকে রেখে এলো এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর কর্তার আছে। এবং চেয়ে আনল আড়াইটা টাকা। সে বছর আর তা শোধ করতে পারল না হাসেম। মারা গেল তিলে তিলে অল্প খেয়ে। শেষের কটা দিন সে নাকি হাঁপিয়ে ছিল। তাই চৌকিদার তার জন্ম মৃত্যুর হাত-চিঠায় সঠিক সংবাদটাই লিখে নিয়ে গেল, মৃত্যুর কারণ—হাঁপানি।"

বাপের ঋণ আড়াই টাকার জন্য কাশেম মহাজনের বাড়ী বন্ধক থাকল। সেখানে বান্দাগিরি করে সেই "বাড়ী থেকেই বড় হলো। কৃষাণদের তামাক সেজে দিতে দিতে সে শিখল তামাক খেতে। পদ্মার এপার ওপার ডোঙা বাইতে বাইতে সে শিখল—ঘোর তুফানে বৈঠা ধরতে। আর সাঁতার—সে তো জানে এ অঞ্চলের কোলের ছেলেরাও।"

তারপর যৌবনের প্রথমে এক ফুকুর কাছ থেকে আড়াইটা টাকা সংগ্রহ করে বাড়ীর কর্তাকে দিয়ে সে বাড়ীর গোলামী ছেড়ে বাপের ব্যবসা মাছ ধরা আরম্ভ করলো। মাছ বেচে ও অন্যের জমির ধান কেটে অল্প কিছু টাকাও জমালো। তখন থেকে কাশেমের চোখে এক চরের স্বপ্ন। তার নানার নিরানব্বই কানি জমি যা বহুকাল পদ্মায় ভেঙেছে একদিন চর হয়ে জাগবে। যার মালিক হবে কাশেম। যেখানে চর জাগবে মনে করে কাশেম সেখানে অবশ্য অথৈ জল, বাঁও মেলে না। কিন্তু ডাকিনী পদ্মার কৃপা হলে চর জাগতে কতক্ষণ! চরের বুকে ক্ষীরের মত পলিমাটিতে—

"প্রথম জাগবে হেউঁলি গাছের ছোপা, তারপর জন্মাবে হোগলা পাতা। তারপর ধীরে ধীরে জন্মাবে দু এক ছোপা লাঙস, জুড়বে মই। তারপর সোনালী ফসলের অরণ্য—অনুপম লাবণ্যে ভরে যাবে চর। লোকে নাম দেবে 'চরকাশেম'।"

কাশেমের সকল দুঃখ দূর হবে। স্বপ্ন দেখে কাশেম অথৈ পদ্মার জলের তলায় এই চর।

আর এক স্বপ্ন কাশেমের চোখে। তার পূর্ব প্রভুর মেয়ে ফুলমনের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন। গর্বিতা, মুখরা মেয়ে ফুলমন। তিন বছর বয়সে এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, অল্প কয়েক বছর পরেই স্বামী মারা যায়, আর তখন থেকে বাপের বাড়ী আছে। কিন্তু শিশুকালের শ্বশুর বাড়ীর আভিজাত্যের ছাপ মনে এঁকে আছে। এখানে সবাইকে ছোট মনে করে, সর্বদা ছিমছাম হয়ে চলে। গাঁয়ের মেয়েরা বলে 'বাদশাজাদী'।

কাশেমকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে তাদের বাড়ীর গোলাম। যুবক কাশেমকেও 'কাশমা' ছাড়া ডাকে না। তাকে বলে, 'ইসকাবনের গোলাম'। তার কথায় কাশেমের মর্ম পর্যন্ত বিষিয়ে ওঠে, ইচ্ছা করে ওর থুতনিটা ভেঙে দেয়। কিন্তু ফুলমনের আকর্ষণ এড়াতে পারে না। "পদ্মার তীরের মেয়ে— পদ্মিনীর মতই তার রং। তবে মুখখানা একটু গোল। নাকটা সামান্য চাপা, চোখ দুটো একটু ছোট। অনেকটা নেপালী মেয়েদের মত। সোনার বেসরটা নাকে সর্বদা ঝক ঝক করে। মুখখানা যেমনই হক রংয়ের দিকে চাইলে আর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তবু চুরি করে বার বার তাকিয়ে দেখে কাশেম।" রক্ত মাংসের প্রেম, কিন্তু কাশেমের হৃদয়ের ছোঁয়ায় ভাস্বর। কাশেম স্বপ্ন দেখে, ফুলমন তার ঘরে এসে 'চরকাশেমে' ফুল ফুটিয়েছে। কাশেমের আশা চরকাশেমের চেয়েও অথৈ জলের তলায়, কিছুতেই থাঁও মেলে না। তবু কাশেম স্বপ্ন দেখে। কাশেমের দুই স্বপ্নের পরিণতির কাহিনী এই উপন্যাস।

'চরকাশেম' অমরেন্দ্রর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও, উপন্যাসটি কতকগুলি কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পেরেছে। উপন্যাসের বিষয় বস্তু নতুন। বরিশাল—ফরিদপুর অঞ্চলের পদ্মার এক নতুন চর কেমন করে আবাদ হলো, পঞ্চাশের মন্বন্তরে সেখানে এক মহাসংকট দেখা দিল—"কতিপয় মানুষের দুর্নিবার লোভের মুখোস খসে পড়েছে। উদ্ঘাটিত হয়েছে তার হিংস্র পাশবিক রূপ। কে যেন জবাব দেয়, 'আমি যে এসেছি মন্বন্তর ; দৈবের দুর্ভোগ নয়—মানুষের সৃষ্টি'।"—এর পরই চর প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু এই কাহিনী অমরেন্দ্রর হাতে যে ভাবে রূপ পেয়েছে, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এই জেগে ওঠা চরে প্রধানত নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা আবাদ করে। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের জীবনসঙ্গী নদীর বিচিত্র রূপ পরিবর্তন, এ সব অত্যন্ত কাছের থেকে লেখক দেখেছেন—এই শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা এত কাছে থেকে একজন ভদ্রসন্তানের পক্ষে দেখা এতদিন আমাদের দেশে ও সাহিত্যে যেন অসম্ভব ছিল। "দেখার মত দেখা" ১ কিংবা Amarendra Ghosh does not invent his characters. They are people he has known, mostly Muslims. He has a deep and tender understanding of them, rare in the best of times and almost miraculous today. He has been to reach beyond his caste and class and community in a natural manner."২ লেখক এদের যে জীবন এঁকেছেন তাও অনেকখানি বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তব জীবনেও এমন এক বলিষ্ঠ শ্রীছাঁদ রয়েছে যা একালের নাগরিকতা-পীড়িত পাঠকের চিত্ত সহজে জয় করে নেয়।

বিষয়বস্তু নতুনত্বের আরও একটি কারণ হল—"পূর্ববঙ্গের চাষী ও মাঝি জীবনের কাহিনী প্রথম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু সে চাষী ও মাঝিরা প্রকৃতপক্ষে চাষী-মাঝিও নয়—কবি কল্পনার অনুরঞ্জনে রঙিন হইয়া সহুরে ভদ্র সমাজই তাহাদের রূপে উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দেখা দিয়াছে এবং পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় কথা কহিয়াছে। 'চরকাশেমে'র আবেষ্টনী সে হিসাবে ঢের বেশি বাস্তব—খাল, বিল, নদী, নালা, ক্ষেত, মাঠে সমৃদ্ধ পূর্ববাঙলা এবং তাহার দৃঢ় দেহ, আবেগ প্রবণ মানুষগুলি ইহাতে কথা কহিয়াছে ঢের বেশি স্পষ্ট, ঢের বেশি সহজ ও সজীব ভাষায়।...... ইহাতে জীবনের সুর আছে এবং সে সুর নূতন।"৩

কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর নতুনত্বেই যে চরকাশেম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা নয়। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনের সর্বস্তরের ভিতরে লেখক যে আপন চিত্ত প্রবেশ করাতে পেরেছেন এই অভূতপূর্ব প্রেমের যোগই এই উপন্যাসকে সত্যকার মর্যাদা দিয়েছে। সে প্রেম এত অকৃত্রিম যে দেশবিভাগের পরে জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেও লেখক এদের কথা ভুলতে পারেন নি, উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন চরের সেই বলিষ্ঠ মানুষগুলির উদ্দেশ্যে।

কাশেমের স্বপ্নের পরিণতির কাহিনী হলেও এখানে তার সঙ্গী সাথী আত্মীয় অনেকে এসেছে—রহিম, ফরিদ, আঞ্জুমান। এ ছাড়াও এসেছে রসময় ও জীবন হালদার। পদ্মার পারের এ দরিদ্র জীবন্ত মানুষগুলির জীবনের ছবি রঙিন তুলির বলিষ্ঠ টানে লেখক এঁকেছেন। এ জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও দরদ অমরেন্দ্রকে সাহিত্যের সত্য দৃষ্টি দিয়েছে। আরও একটি চরিত্র এ উপন্যাসে আছে—সমস্ত চরিত্রকে ঘিরে, সে চরিত্র কীর্তিনাশা পদ্মা। বর্ষার ডাকিনী পদ্মা, পাড়ের ঘর বাড়ী জমি বাগান মুহূর্তে যে রাক্ষসীর উদরে যায়; যার ঘূর্ণমান জলের দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। শীতের শান্ত মায়াবী পদ্মা, রৌদ্রে ঝলমল। পাড়ের লোকেদের যা যাদু করে। পদ্মা উপন্যাসের মানুষগুলির জীবন ভাঙ্গছে ও গড়ছে, চেতনে ও অবচেতনে মনকে আকার ও রং দিচ্ছে। পদ্মাকে ঘিরে যেটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে তা কোন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র নয়, তা হল এই চরের মানুষগুলির এক সংগ্রামী ঐতিহ্য। যা পরবর্তীকালে এদেশের সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ করা গেছে। "এমনি করে ওরা বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধি করে নয়—যুদ্ধ করে। চরকাশেমের বাসিন্দাদের ওপর দুরন্ত চাপ পড়েছে। বন্যপশুর মত সংগ্রাম করতে হচ্ছে জীবিকার জন্য—সে সংগ্রাম সুসভ্য মানুষ কল্পনা করতে পাবে না।" যে চর মানুষের জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, তবু যে চরের স্বপ্ন দেখে কাশেম—" এ স্বপ্ন শুধু মেছো হাসেমের ছেলে কাশেমের নয়—এ চর শুধু 'চরকাশেমে' নয়—এ স্বপ্ন মানুষের আশার। এর শান্তিকামী মানুষের

কামনার। ফুলমন আর কাশেম আশাবাদী নরনারীর প্রতিভূ।" এই সংগ্রামী মানুষের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী লীলা রায় বলেছেন, "It blows into the mindslike a refreshing gust of cool air.

অমরেন্দ্র বামপন্থী। তাঁর জীবন-দর্শনের প্রবক্তা হয়েছে এখানে জীবন হালদার—সে জাতিতে নমঃশূদ্র, আদালতের পিয়নি করছে বহুদিন ধরে। জীবন হালদার বলে, "রাজা বাদশার যুগ আর ফিরা আসবে না—কারণ প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ আর ভালবাসে না। কাজেই এখন যাঁরা আছেন, নামেই বাইচা আছেন। আইচে নতুন যুগ—নতুন মানুষ। সমাজের তলানী থিকা ভাঙা চুরা মানুষগুলো সিধা হইয়া দাঁড়াইছে। সে যুগের পত্তন করবে এই হাশেম কাশেম রসময় জীবন হালদারের ছেইলা মাইয়ারা।···আমি একলা আমার এই পুঁটলিটা বগলে লইয়া যখন দেশময় ঘুইরা বেড়াই, তখন এই সব কথাই ভাবি আর দিব্য চক্ষে দেখি নতুন দিনের আলো।"

জীবনের এই বক্তব্য থেকে একটা জিনিস আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট তা হল—অমরেন্দ্র বামপন্থী তাত্ত্বিক ও প্রচারক হিসেবে যত বড়, তার চাইতে অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে দুঃস্থ ও নির্যাতিত মানুষের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম। তাই আমাদের বামপন্থী সাহিত্যে সাধারণত যেখানে তর্কের কচকচি ও প্রচারের উঁচুগলা যথেষ্ট বড় হয়ে দেখা দিয়ে সাহিত্যিক অকৃতার্থতাই ঘটায় বেশী, সেখানে প্রেমিক ও বামপন্থী অমরেন্দ্র অবলীলাক্রমে অসাধারণ সার্থকতা অর্জন করেছেন।

বহুকাল পূর্বে 'চরকাশেম' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ অমরেন্দ্র সম্পর্কে দুটি মন্তব্য করেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধের আলোচনাসূত্রে তা অত্যন্ত মূল্যবান বলেই উল্লেখ করার প্রয়োজন। আলোচ্য উপন্যাসের হিন্দু-মুসলমানের জীবন প্রসংগে তিনি বলেছেন।

"শরৎচন্দ্র জীবনের শেষ ভাগে সংকল্প করেছিলেন মুসলমান সমাজের চিত্র তিনি যা জানেন অংকিত করবেন। কিন্তু তার সময় তিনি পান নি। অবশ্য গফুর জোলার যে জীবনালেখ্য তিনি অংকিত করে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তা মহামূল্য। শরৎচন্দ্রেরই মতো দরদী শিল্পী অমরেন্দ্র ঘোষ যেন তাঁর গুরুকৃত্য পালন করলেন। বাংলার মানুষদের দোষত্রুটি বহু, কিন্তু একটি মহাসম্পদের তারা অধিকারী, সেটি তাদের হৃদয়ধর্ম। সেই হৃদয়ধর্মের বশে হিন্দুমুসলমানের পৈশাচিক হানা-হানির দিনে পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান তার হিন্দু প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিল। আর উদ্বাস্তু অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের মণিহার তাঁর পরিত্যক্ত জন্মভূমির অবজ্ঞাত মুসলমান জেলে-জেলেনীদের গলায় পরিয়ে দিলেন।"[৫] সহজ সরল জীবন দর্শনের সংগে তাঁর অপরিমেয় প্রেমের যোগ ঘটায় তা এতখানি প্রাণসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে

যে, তাকে অবজ্ঞা করাও যায় না। কিছুদিন আগে একজন সমালোচক আমাদের বামপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন—

"এরা সবাইকে শূদ্র করছে, কিন্তু শূদ্রকে কেমন করে ব্রাহ্মন করা যায় সে কথা এরা জানে না।"

চমৎকার উত্তর দিয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ—

"কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষ সম্বন্ধে এই উক্তি ঠিক খাটে না, কেন না প্রাণবস্তু শূদ্রই তিনি সৃষ্টি করেন নি, প্রেমবস্তু ও দৃষ্টি সম্পন্ন যে সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন ব্রাহ্মণ তারা হয়েছে কি না বলতে পারব না, তবে সত্যকার ব্রাহ্মণত্বের দিকেই যে তাদের গতি তা মিথ্যা নয়।"৬

এই অভিমতের সংগে অমরেন্দ্রর নিজের কথাও বোধহয় উল্লেখ করলে অপ্রাসংগিক হবে না।

"আমি শ্রেণী-সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূল উপাদান মানুষের মন থেকে সংগ্রহ করেছি। আবার মানুষের দরবারেই তা সাহিত্যের আকারে পরিবেশন করেছি। সরোজ দত্ত 'পরিচয়'তে শুধু একটি লাইন বললেন, 'চরকাশেম' পড়ে কোথায় যেন দাঙ্গা বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।"৭

'চরকাশেমে'র শ্রেষ্ঠত্বের আরও একটি কারণ হল—এর আঞ্চলিকতা। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতাকে প্রথম উপস্থাপিত করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর কয়লাকুঠির সাঁওতাল কুলি মজুরদের নিয়ে। পরবর্তীকালে সেই পথে অগ্রসর হয়েই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রঘোষ ও সরোজ কুমার রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে অঞ্চলিকতাকে আরও সার্থক করে তুলেছেন।৮ 'চরকাশেম' পূর্ব বাঙলার বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের চরের কাহিনী হলেও—তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কেন না কাশেমের স্বপ্ন আর তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন হয়ে থাকেনি। ব্যক্তির গন্ডী অতিক্রম করে সমস্ত মানুষের আশার, শান্তিকামী মানুষের কামনার স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র সংগে চর সাহিত্য হিসাবে একই সংগে উচ্চারিত হবার যোগ্য চর কাশেম। এমন কি knut Hamsun-এর সুবিখ্যাত 'Growth of the Soil'-এর মতো অমরেন্দ্রর 'চরকাশেম' ও একখানি স্মরণীয় উপন্যাস হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

'পদ্মদীঘির বেদেনী' 'চরকাশেম'-এর মতই অমরেন্দ্রর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। অমরেন্দ্রর নিজের ভাষায়, "প্রকাশিত হল, 'চরকাশেম' ও'পদ্মদীঘির বেদেনী'—এক তারিখে যমজ ভাই-বোনের মত।"

'পদ্মদীঘির বেদেনী' আর এক জাতের নরনারীর জীবন আলেখ্য। যাযাবর

বেদে সম্প্রদায়ের কাহিনী। গল্পের পটভূমি নদীমাতৃক পূর্ববাঙলার একটি গ্রাম তমালতলা।

"তমালতলা গ্রামটাকে একেবারে একটুখানি বলা চলে না। তবে গ্রামে বড়লোক কেউ নেই। সকলেই গরীব অথবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শানদার, ভূঁইমালী, কামার, কুমোর, তেলি, নাপিত ছত্রিশ জাতির বাস। নমঃশূদ্র এবং তাঁতিও আছে কয়েকঘর—তারা থাকে গাঁয়ের দক্ষিণ সীমানায়। তাঁতীরাও তাঁত বোনে, নমঃশূদ্ররা হালছালুটি করে। মুসলমানও ঘর দশেক এসে বাড়ি করেছে গাঁয়ের উত্তর দিক ঘেঁষে একটা ছোট খালের ওপারে।"

পূর্ব বাঙলার এই সমাজ জীবনের নীচু তলারই একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক উদঘাটিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে।

পূর্ব বাঙলার বেদেরা যাযাবর সম্প্রদায়। বিচিত্র তাদের জীবনধারা। সারা জীবন তারা নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ায়—পাখীর মত শস্য কুড়ায় এখানে ওখানে—গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের বাড়িতে গিয়ে দেখায় সাপের খেলা, কোথাও তারা ঘর বাঁধে না। জাতিতে তারা মুসলমান, কিন্তু একান্ত ভক্তি ভরে মা মনসার পূজারতি করে। এই বেদে-সম্প্রদায়ের এক দম্পতি—ময়না আর তার স্বামী—তমালতলার শ্যামল পল্লীক্রোড়ে ভগ্নদীর্ন, পরিত্যক্ত শ্রীহীন, নিশ্বংশ জমিদার বাড়ির নিকটে পদ্মদীঘির তীরে এসে নীড় বাঁধল। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে ময়নার স্বামী অকালে মারা গেল সাপের বিষে। তারপর পদ্মদীঘির সেই নিঃসন্তান বেদেনীর জীবনে আবির্ভাব হল বৈষ্ণব সাধু ভৈরবের।

"সে সাধুর দুরূহ কথা সব না-ই বা বুঝল, তবু সে সকল সংশয় দূর করে ভজন করবে। পদ্মদীঘির বিরাট বিষয় ভোগ করে তার শান্তি নেই, বরঞ্চ ক্লান্তি এসেছে প্রতি অংগে। কিন্তু ক্রমশঃ ময়নার মনে দাগ কাটে ভৈরবের আত্মভোলা রূপ, তার বলিষ্ঠ গঠন, খাড়া নাক-বিহ্বল চাহনি।"

সাধু তাকে গেরুয়া বাস ধরাল, দীক্ষা দিতে চাইল বৈরাগ্য মন্ত্রে, কিন্তু সন্তানহীনা বেদিনীর হৃদয়ে মাতৃত্বের নিদারুণ বুভুক্ষা। কেন না 'তাদের সংস্কার ছিল এবং এখনও আছে, স্ত্রীলোক সন্তানবতী না হলে তার নরকেও স্থান হয় না।' তাই ময়না হঠাৎ ভৈরবের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আকুল কণ্ঠে বলে—

"তুই বসন দিলি বেশ দিলি—হামি মা আছি, তুই হামাকে একটি ছেলে দে গোঁসাই।"

ভৈরব কিন্তু পাষাণ দেবতার মত নির্বিকার। নীরব এই আকুল আকুতি তাকে বিচলিত করতে পারল না—এক তারাটি হাতে নিয়ে সে পাড়ি জমাল অজানার উদ্দেশ্যে—আর

"ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই জানতে পারল যে ময়না যেন কোথায় চলে গেছে। পদ্মদীঘির বেদেনী বিশ্বের যত অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা বহন

করে পথে নামল। দীঘির স্বপ্ন, জমিদার বাড়ির বিস্ময় তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। চঞ্চলা যাযাবরী যাত্রা করল কোন যেন অজানা—অনামা নিরুদ্দেশে।"

—এই হল পদ্মদীঘির বেদেনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এই কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দু ময়না। সাধু ভৈরব, নয়ন, গোপী, শ্যামলী, শুখ, রাজাবাহাদুর এবং অসংখ্য যাযাবর বেদে ও বেদেনী—তার চারদিকে বৃত্ত রচনা করেছে। এর মধ্যে ময়নার কাহিনীই প্রধান। তার চরিত্রের উত্থান-পতন ও মাতৃত্বের করুণ আর্তি উপন্যাসের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে।

"বাংলার শান্ত ও শ্যামল পরিবেশে এক বেদেনীর রোমাঞ্চকর ও ব্যথাহত জীবন কাহিনী লেখক পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদেনীর জীবনের পশ্চাতে রহিয়াছে ঊষর, প্রাণহীন ও বালুকাময় এক ভূখণ্ডের স্মৃতি-সম্মুখে উচ্ছল ও প্রাণবন্ত জীবন প্রতি মুহূর্তেই তাহাকে ডাকিতেছে। এই যাযাবর জীবনের স্মৃতির শৃংখলকে সে অস্বীকার করিতেই চলিতেছে। বাংলার নিভৃত পল্লীকোণে নীড় রচনার স্বপ্ন হইতে সে মুক্তি পাইতেও চাহে না—এই স্বপ্নেও যেন কেমন একটি মাদকতা রহিয়াছে। কিন্তু জীবনের কঠোর বাস্তবের আঘাতে একদা এ কথা সে উপলব্ধি করিল যে স্বপ্ন চিরদিন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।"১০

কাহিনী বর্ণনার স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকত্ব এবং অসঙ্গতি থাকলেও অমরেন্দ্র যে শক্তিমান কথাসাহিত্যক এ উপন্যাসে তার পরিচয় আছে।

"রাজা সাহেবের বহুরে পানোন্মত্ত বেদে ও বেদেনীদের ভোগ লালসা পঙ্কিল উৎসব রজনীর যে বর্ণনাটি লেখক দিয়াছেন তাহা একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের প্রকৃতি বর্ণনার হাত বড় মিঠা।"১১

অমরেন্দ্রর এই প্রকৃতি বর্ণনা প্রসংগে, স্বভাবতই তারাশংকরের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র কথা মনে পড়ে। বেদে, সাঁওতাল, বাদুকরী সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা তিনি নিজেই বলেছেন। জীবনের এ-অঞ্চলের রূপ-গুণের তিনি যে কী অকৃত্রিম গুনগ্রাহী, তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' থেকে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিলেই বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট হবে।

"হিজল বিলে মা মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলো। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালোঠাকুরের দন্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল—তুমি তো আমাকে দন্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে; কিন্তু আমি যাবো কোথায় বল; ঠাকুর বলেছিলেন-ভাগীরথির তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও। বিশ্বাস না

হয়, বর্ষার সময় গঙ্গার বন্যায় যখন হিজল বিল মার গঙ্গা এক হয়ে যায় তখন গঙ্গার বুকের উপর নৌকা চড়ে হিজলের চারিপাশে একবার ঘুরে এসো। দেখবে, জল-জল আর জলঃ উত্তর-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে জল ছাড়া মাটি দেখা যায় না, জলের উপর জেগে থাকে ঝাউ আর দেবদারুর মাথাগুলি। দেখো, আকাশে পাখি গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরে হতাশকণ্ঠে যেন মরণ-কান্না কেঁদে আবার উড়ে যেতে চেষ্টা করে। কেন জান? গাছের মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তীক্ষ্ম-দৃষ্টিতে। শরীর তোমার শিউরে উঠবে। হয় তো ভয়ে ঢলে পড়ে যাবে। মা-মনসার ব্রত কথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনে-বেটী মায়ের দক্ষিণমুখী যে মূর্তি দেখেছিল-সেই মূর্তি মনে পড়ে যাবে। ······মা-মনসা বিষহরির ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দক্ষিণদিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরনের সামনে অজগরের কুন্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন-পরনে তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলচে, সর্বাঙ্গ সাপের অলঙ্কার, মাথায় গোখুরা ফণার ছাতা, মণিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি সাপের বলয়, শঙ্খিনী সাপের শঙ্খ, বাহুতে মনিনাগের বাজবন্ধ'·· সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা-বিষের বাতাস।" উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হল এই কারণে, এ ব্যাপারে তারাশঙ্করের সংগে অমরেন্দ্রর কোথায় যেন একটি মিল লক্ষ্য করা যায়।

এ উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাসেও অমরেন্দ্র অবশ্যই নতুনত্বের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যাযাবররা জাতিতে মুসলমান হলেও, তারা কিন্তু একান্ত ভক্তি ভরে মা মনসার পূজারতি করে। কোন কোন সমালোচক অবশ্য অন্য কথাও বলেছেন।

"মনে হয় এ কাহিনী অসমাপ্ত। যেখানে যবনিকা ফেলা হয়েছে, সেখান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর যেতে পারতো 'পদ্মদীঘির বেদেনী'। তার জীবনকে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ধরে রাখা হলেও এ জীবন স্বল্প পরিসরের জীবন নয়। এমন করে মাতৃত্ব চেয়ে তার শেষ কথা সে বলতে পারে না। মনে পড়ে তারাশঙ্করের 'কবি' কে। 'নিতাই' এসে 'বসন্ত'র জীবনকে বদল করে দিয়েছিল। স্বৈরিণীর রক্তে এসেছিল স্নিগ্ধতা, এসেছিল গভীরতা। পটভূমি সেখানে জীবনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি।"১২

এই মতের সংগে আমরা একমত হতে পারিনা। এই উপন্যাসের কাহিনীতে অমরেন্দ্র পূর্ব বাঙলার পল্লী অঞ্চলের একটি অপূর্ব ছবি নিপুণভাবে রূপায়িত করে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আর পেরেছেন বলেই মনীন্দ্র রায় বলেছেন,

"it is the story of a new world, half romantic, half real, half unknown and half ignored, in which sublime aspirations clash with carnal impetuously, intense selfishness gets

transformed into glittering nobility at the accidental touch of a stray button at the closed door of the heart."১৩

ময়নার চরিত্র সৃষ্টি এবং অমরেন্দ্রর অসাধারণ সংযম এ উপন্যাসের ঐশ্বর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ময়নার চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে অমরেন্দ্র এদের আচার নিয়মের টুকিটাকি বিশেষত্ব, এদের বিশিষ্ট নীতিবোধ যা আমাদের সমাজের নৈতিক মান অনুযায়ী নৈতিক শিথিলতা বলে গণ্য হতে পারে, সর্বোপরি এদের বঞ্চিত অত্যাচারিত জীবনে অসহনীয় দারিদ্র প্রভৃতির শিল্পসম্মত বিবরণ নিষ্ঠার সংগে দিয়েছেন। ময়নার জীবনের চরম প্রত্যাশার মুহূর্ত রচনাটি অমরেন্দ্রর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি।

"ময়না আবার বল্গাহীনা কস্তুরীমৃগীর মত অধীর হয়ে পড়ে। তার দেহে ভৈরবেরও স্পর্শ—স্পর্শ তো নয় যেন বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত বাসনা মহাকালের কাছে ধ্বংস কামনা করে। সে হঠাৎ ভৈরবের কন্ঠলগ্ন হয়ে বলে, 'তুই বসন দিলি বেশ দিলি—এখন একটি জিনিস ভিখ দে ভগবান।'

একটু বিরক্ত ও আশ্চর্য হয়ে ভৈরব জবাব দেয়, 'তুমি কন্ঠ ছাড়ো। কি চাও তাই বলো।'

ময়নার কানে যেন সে কথা প্রবেশ করে না। সে এতদিন ভয়ে ভয়ে ভৈরবকে ভজন করেছে কিন্তু আজ একান্ত নির্ভয়ে, নিতান্ত অকুণ্ঠচিত্তে তার কাছে শুধু একটি কামনা ভিক্ষা করে, 'হামি মা আছি। মেলানি মাংগি, তুই একটি ছাওয়াল দে পাষাণ।'

ক্ষণিকের জন্য নির্বাক হয়ে যায় ভৈরব। তারপর দৃঢ়হস্তে ময়নাব লৌহবেষ্টনী খুলে ফেলে। সে আর চাইতে পারে না বুনো বাঘিনীর চোখের দিকে।

'মহুয়া হামাকে অপমান করলেক, শ্যামলী কেড়ে নিলে তোকে—তুই ফির বিদেশে যাবি—হামি মরবেক, তুই হামাকে একটি ছেলে দে গোঁসাই। 'ময়নার কন্ঠে গভীর আকুতি ফুটে ওঠে।"

এ ধরণের বিষয়বস্তু কোনো অসংযত লেখকের লেখনী মুখে অশ্লীল যৌন-তৃষ্ণা চরিতার্থ করার রসদ হয়ে উঠতে পারত এবং গল্পের শেষ অংশে ময়নার করুণ পরিণাম নিয়ে অজস্র চোখের জলে কাহিনীকে ভাসিয়ে দেওয়ার উপক্রম হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানে তার কোনটিই হতে পারেনি। সমস্ত কাহিনীর অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা ভেঙে পড়েনি কোথাও। লেখক কোথাও বিচলিত হননি, সমস্ত ঘটনার মধ্যে তিনি আশ্চর্য রকমের অনুত্তেজিত নিরুচ্ছাস ও নৈর্ব্যক্তিক। এ উপন্যাসে অমরেন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন—সন্ন্যাস বড়, না সংসার বড়। কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেল—ভৈরব সংযম এবং ত্যাগের আদর্শ, ময়না ভোগের—মাতৃত্বের। এবং বলা বাহুল্য ময়নাই বড় হয়ে উঠল। আর সেই কারণেই বোধহয়—"Maina is his creation who will live

permanently in the rank of most attractive of the master minds of Bengal."১৪

'দক্ষিণের বিল' অমরেন্দ্রর তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও, আসলে এটিই তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে রচিত প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসটি মোট তিনটি খন্ডে রচিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৫৭ ও ১৩৬০। কিন্তু তৃতীয় খন্ডটি কোন সহৃদয় প্রকাশকের অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হওয়ায় আজও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, তথাপি আমরা এখানে তিনটি খন্ডকে একত্রেই আলোচনা করবো।

'দক্ষিণের বিল' বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় উপন্যাস। অমরেন্দ্র বলেছেন,

"এ উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ জড়িত। নায়ক বিপ্রপদ সেকালের প্রতিভূমূলক চরিত্র। নায়িকা কমলকামিনীও তাই। কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই কম্পাস ঘুরিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আরম্ভেরও আরম্ভ আছে'। তাই 'দক্ষিণের বিল' আলোচনার আরম্ভেরও আরম্ভ-টুকু এ আলোচনা সূত্রে অত্যন্ত জরুরী। কেন না এই রচনার নেপথ্যে আছে লেখকের সুদীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা, যাকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'যোগ সাধন'।

'দক্ষিণের বিল' রচনার আনুমানিক সময় ঠিক 'কলের নৌকা' গল্পটি রচনার পর। সময়টা সম্ভবত ১৯২৭-২৮ সালই হবে। এই দক্ষিণের বিলের সত্যি সত্যিই অস্তিত্ব ছিল এবং তা খুলনা জেলার মল্লিকবেড় অঞ্চল। রাহেনদ্দি নামে এক মুসলমান কৃষক ৮০ বিঘা জমি চাষ করতো। পরবর্তীকালে ঐ মল্লিকবেড় হস্তান্তরিত হয়ে অমরেন্দ্রর পিতার হাতে আসে—উপন্যাসে এই মল্লিকবেড়ই দক্ষিণের বিলে রূপান্তরিত হয়েছে এবং রাহেনদ্দিও এসেছে অন্য নামে। অমরেন্দ্র প্রথমে এর নাম দিয়েছিলেন 'অগ্নিবলয়', কিন্তু এ নামে পূর্বেই একটি উপন্যাস থাকায় স্ত্রীর পরামর্শে 'দক্ষিণের বিল' রাখেন।১৫

তথ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, দক্ষিণের বিলের পটভূমিতে অমরেন্দ্রও এক বিশাল মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানান কারণে সে স্বপ্ন ভেঙে কেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এর পিছনেও আছে এক মর্মান্তিক ইতিহাস। অমরেন্দ্র নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন,

"আমরা আর কোন বাদে বিশ্বাসী নই—চাই হিউম্যানিটি। আমাদের সমস্ত তপস্যার কাম্যফল হিউম্যানিজম। যে বাদের পথ ধরে আমরা আজ এগোই না কেন, মিশতে হবে গিয়ে সাগর মোহনায়—সর্বকালের সব মানুষের শেষ ঠিকানা। সেই ঠিকানা পর্যন্ত 'দক্ষিণের বিল'কে টেনে নেওয়ার আগ্রহ ছিল। ক্যানভাসে তুলি বুলাতে না বুলাতে হাত টেনে ধরলেন প্রকাশক। তাই দক্ষিণের বিলে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা কাহিনী থাকলেও, আসলে অসম্পূর্ণ দু-খন্ড উপন্যাস। যদি তোমার ভালও লেগে থাকে, তবু বলব আমি যা লিখতে

চেয়েছি তার প্রস্তাবনা মাত্র। সেখান হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। শুধু ফসল তোলা হয়েছে। তার ঐশ্বর্যে যে কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্থান পতন হল, তার চিত্র তো আঁকতে পারিনি।''১৬

আই.এস.সি. পরীক্ষা না দিয়ে এবং কলকাতা ত্যাগ করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমরেন্দ্র সাহিত্য জীবন থেকে নির্বাসনে গেলেও মনের অতলান্ত প্রদেশে একটা আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছিল। সে আন্দোলন সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন। ঠিক এমনি এক মানসিক বিক্ষোভের মুখে দাঁড়িয়ে স্ত্রী পঙ্কজিনী অমরেন্দ্রকে বললেন আবার লিখতে। না লিখলে নাকি তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তারপর পঙ্কজিনী মেয়ের বিয়েতে উপহার পাওয়া পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' উপন্যাস খানা দিলেন। অমরেন্দ্রও এক নিঃশ্বাসে বইখানা শেষ করে ভাবলেন,

"পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের উপকরণ নিয়ে তো এর চাইতেও ভাল বই লেখা যায়। এই ভাবেই 'দক্ষিণের বিল'এর সূত্রপাত। কিন্তু ভাব আসে তো ভাষা নেই। কাহিনী আছে তো কথা নেই। ইচ্ছা আছে, শক্তি নেই। আসন্ন প্রসবা মায়ের মত ব্যথা বেদনায় পায়চারি করতে লাগলাম। একদিন সুরু হল 'দক্ষিণের বিল' লেখা। কিন্তু কোথায় থামব তা তো জানিনে। বর্ষার ধারা স্রোতের মত আসতে লাগল কাহিনী, এ ঢল সামাল দেয়া দায়। আনুমানিক ছাপা পৃষ্ঠার পাঁচশ লিখে একবার নিশ্বাস ফেললাম।''১৭ প্রথমবার এ ভাবেই লেখা হল।

দ্বিতীয়বার লেখার ইতিহাস আরও মর্মান্তিক। তখনো পার্টিশান হয়নি, ১৯৪৭-এর মাঝামাঝি অমরেন্দ্র মেজভাই নারায়ণ ঘোষের বাড়ি বরিশাল টাউনে এসে উঠলেন সপরিবারে। সম্বল বলতে বসত বাড়ী বিক্রীর চারশ টাকা। পরিবেশের চাপে পড়ে অমরেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী ভাইয়ের সংসারে দাসত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হলেন। অবশেষে অমরেন্দ্র সকাল থেকে রাত একটা পর্যন্ত এক দোকান সামলানোর কর্মচারীর কাজ নিলেন। এবং এখানে রাত জেগে আবার নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন 'দক্ষিণের বিল'। অবশেষে দ্বিতীয় পর্যায় লেখা সারা হল। এখানেই ব্রজমোহন কলেজের বাঙলার অধ্যাপক সুধাংশু চৌধুরী 'দক্ষিণের বিল' শুনে বললেন, "অনেক বিদেশী নামজাদা লেখকদের তুলনায় আপনার লেখা বর্ণনায় অভিজ্ঞতায় জীবন্ত।''১৮ এই অভিমতই অমরেন্দ্রর মনে সৃষ্টি করল এক নব দিগন্তের নিশানা। তাই অধ্যাপক চৌধুরীর নির্দেশে সামান্য অদল বদল করে তৃতীয় বার লেখা হল 'দক্ষিণের বিল'। তারপর পার্টিশান ও স্বাধীনতার পরে কলকাতায় এসে অমরেন্দ্রর অকৃত্রিম সুহৃদ রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে 'দক্ষিণের বিল' চতুর্থবার লেখা হল আমাদের আলোচ্য এই চতুর্থবারে রচিত 'দক্ষিণের বিল' এর প্রকাশিত দুটি ও অপ্রকাশিত খণ্ডটি।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অমরেন্দ্র লিখেছেন,

"এ উপন্যাসখানা ক-খণ্ডে যে সমাপ্ত হবে, তা আজ আমি বলতে পারছিনে। তবে এটুকু বলতে পারি যে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তারপর প্রতি খণ্ড স্বয়ং পূর্ণ হবে। বিগত একশত বছর ধরে পূর্ববাঙলার গ্রামিন সভ্যতা কি ভাবে যে ব্যষ্টির থেকে গোষ্ঠীর দিকে ধীরে ধীরে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তারই চিত্র এ উপন্যাস। উলঙ্গ একটা কাঠামোকে সুন্দর, নয়নাভিরাম, জনমনের পূজার উপযোগী করে তুলতে আমি কেবলমাত্র সত্য তথ্যেরই প্রলেপ দিয়েছি—এঁকেছি একেবারে হুবহু ছবি। এই তথ্য ও চিত্রের অন্তরালে একটা সুবৃহৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব রয়েছে।"

পূর্ব-বাঙলার গ্রামিন সভ্যতার একশ বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে এ উপন্যাসের মধ্যে দেখানোই লেখকের সজ্ঞান অভিপ্রায় বলা যেতে পারে।

'দক্ষিণের বিল'এর প্রথয খণ্ডে—'মৃত্তিকা ও ফসলের জন্য সংগ্রাম পিতাও পিতামহের জীবন-ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ডে 'মৃত্তিকা ও ফসলের জন্য সংগ্রাম, পিতা-পুত্র ও পৌত্রের জীবন-ইতিহাস 'এবং অপ্রকাশিত খণ্ডটিতে-' মৃত্তিকা ও ফসলের জন্য সংগ্রাম, পিতা ও পিতামহের জীবন ইতিহাস' ব্যক্ত করেছেন।

তিনটি খণ্ডের মধ্যেই পারম্পর্য ও যোগ-সূত্র যথাযথভাবে বজায় থাকায় 'দক্ষিণের বিল' এক সুবৃহৎ উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

উপন্যাসের সুরু হয়েছে এইভাবে—

"আজ সময় বদলে গেছে—তবু মনে হয়, এ যেন সে দিনের কথা— যে দিন খুব প্রাচীন হয়নি শক্তি গড়ের স্মৃতি ফলকে। এখনও অনেকেই চোখ বুজলেই দেখতে পায়, বিপ্রপদ বিয়ে করে আনল কমলকামিনীকে রূপ তার অতি সাধারণ —কিন্তু আলাপ যারা করল, তারা বুঝল, বুদ্ধি তার অসাধারণ।"

এই বিপ্রপদর পরিবার একান্নবর্তী। বিপ্রপদ জ্যেষ্ঠ, মধ্যম শিবপদ এবং কনিষ্ঠ দেবপদ। খুড়তুতো ভাইবোন পাঁচ-ছয় জন। আছে তাদের ছেলে-মেয়ে। বিপ্রপদর নয়টি সন্তান। পুত্র সন্তানের নাম অমরেশ। সংসার প্রতিপালনে অক্ষম বিপ্রপদ বুদ্ধিমতী স্ত্রী কমলকামিনীর পরামর্শে "এক বস্ত্রে, ট্যাঁকে মাত্র চার আনার পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাওয়ার সময় পথে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে একখানা চাদর নিয়ে যায়"—তারপর সহরে গিয়ে জমিদারের সুনজরে পড়ে মুহুরীর চাকরী পান। তারপর মুহরী থেকে নায়েব, নায়েব থেকে ম্যানেজার। অবস্থার পরিবর্তন হয় দ্রুততালে। বিপ্রপদ কর্মস্থলেও যেমন থাকেন, তেমনি কিছুদিন শক্তিগড়েও এসে থাকেন। শক্তিগড়ে থাকার সময় জমি জায়গা দেখাশুনা করেন, নিজের হাতে চাষবাসও করেন। গ্রামের লোকেদের মধ্যে নিতাই সর্দার তাঁর অনুগত এবং শুভাকাঙ্খী, কিন্তু দীনু ঠাকুর পরশ্রীকাতর গ্রাম্যকুচক্রী। সেন মশাইয়ের এদেশী তালুক বিক্রী হবে। সম্ভাব্য ক্রেতা পাইকপাড়ার ঘোষালরা এবং টাকার কুমীর কৃপণ

এস্তেজাদ্দি। এস্তেজাদ্দির বৈবাহিক ইমাম। ইমামের কন্যা নুরবানুকে এস্তেজাদ্দি বিনাচিকিৎসায় হত্যা করেছে। বিপ্রপদর অনুগত ইমাম চায়, বিপ্রপদই সেনের তালুক কিনুক। দীনু ঠাকুরও ঘোষালদের বিরুদ্ধে বিপ্রপদকে উত্তেজিত করে। বিপ্রপদর সংসারে সকলেই পরিশ্রম করে, কমলকামিনীও। সংসারে সুখ আসে। বিপ্রপদ এখন সম্পন্ন গৃহস্থ। গ্রামের লোকজন সুবিচার প্রার্থনা করতে আসে তাঁর কাছে। ঘোষালদের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবল ঘৃণা রয়েছে। তাই গ্রামের গরীব নিচুজাতেরা তাদের হৃদয়রাজ্যে বিপ্রপদর জন্য আসন করে দেয়। দক্ষিণের বিলের বিস্তীর্ণ জমির একমাত্র ওয়ারিশ সুখী ধোপার বৌ মেয়েকে প্রতারণা করে জমির স্বত্ব ভোগ করছে ঘোষালরা। তাই সুখী কিছু ধানের বিনিময়ে এ জমির সমস্ত স্বত্ব বিপ্রপদর হাতে তুলে দিতে চায়। দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশংকা থাকা সত্ত্বেও, নিতাই এবং ইমামের ভরসা এবং সহায়তায় বিপ্রপদ দক্ষিণের বিলের তিন চারশ বিঘা উর্বর জমি কিনে নেয়। বিপ্রপদর অনুগত ইমামের ছেলের কলেরা হয়, বিপ্রপদ ও কমলকামিনী সমস্ত সামাজিক বাধানিষেধ উপেক্ষা করে ইমামের ছেলেকে সুস্থ করে তোলেন এবং এ ঘটনা তোলপাড় ঘটায় মুসলমান গ্রামে। ইতিমধ্যে সেনদের তালুকও কিনে ফেলেন বিপ্রপদ। তারপর নিতাই ও ইমামের উপর তালুক দেখাশুনার ভার দিয়ে বিপ্রপদ কাজে ফিরে যান। ফেরার পথে স্টীমারে একদল গুন্ডার হাত থেকে মালা নামে এক যুবতীকে রক্ষা করার পর বিপ্রপদই তাকে আশ্রয় দেন।

বিপ্রপদ দক্ষিণের বিল কবলা রেজিস্ট্রী করেছেন সুখীর মার কাছ থেকে। প্রতিপক্ষ ঘোষালদের অর্থ এবং লোকবল প্রভূত—তাই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বিপ্রপদ ইমামের বাড়িতে গোপন বৈঠকে বসেন। নিতাই এবং ইমাম চাষীদের পক্ষ থেকে বিপ্রপদকে আশ্বাস দেয়। ঘোষালদের অত্যাচারে চাষীরা প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে ওঠে। চাষীরা এবং বিপ্রপদ কে, কিভাবে দক্ষিণের বিলের জমি ভোগ করবে তার পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। চাষের জন্য হাল-বলদ দিয়ে সাহায্য করবেন বিপ্রপদ এবং চাষীরা ফসল তোলার পর এই টাকা কিস্তিতে শোধ করবে। বলদ কেনার জন্য কমলকামিনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসে নিতাই। এদিকে রমণী ঘোষালের চক্রান্তে বিপ্রপদর চাকরী যায়। বিনা বাধায় দখল হয়ে যায় দক্ষিণের বিল। ছোট কুটিরে অতিবাহিত হয় বিপ্রপদর দিন সঙ্গে থাকে মালা। মনের আনন্দে সৃষ্টিকান্ডে মাতে কৃষক বর্গাদার এবং প্রজাদের সম্মিলিত শ্রম। বিপ্রপদ নিজেও চাষের কাজে নিজেকে যুক্ত করে। কিন্তু হঠাৎ নেমে আসে দুর্যোগ। এক অজানা রোগে হালের তেজী বলদগুলো মারা যেতে আরম্ভ করে। এই বিপদের দিনে সংসারের লক্ষ্মী কমলকামিনীকে বড় বেশী করে মনে পড়ে বিপ্রপদর। আবার কমলকামিনীর কাছ থেকে টাকা আনবার ব্যবস্থা করে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, দৈবের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের জন্য তিনি মাঠে এসে দাঁড়ান। নিঠুর আদেশ যতক্ষণ বলদগুলো বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ এক মুহূর্তের বিশ্রামও নেই। কৃষকরাও মরিয়া হয়ে ওঠে সারা দক্ষিণের বিলে অবসরহীন কাজে। টাকা জোগাড় হলে, ইমাম সঙ্গী-সাথী নিয়ে যশোহর জেলায় যায় বলদ কিনতে। কিন্তু ইমাম ফেরে না—বিপ্রপদর মন ভেঙে পড়তে চায়। বলদের সংখ্যা নিঃশেষ, কৃষকদের আবার দাদন দিতে হবে। কিনতে হবে বলদ। নিতাইকে আবার তিনি পাঠান শান্তিপড়ে—বিপ্রপদর একমাত্র চিন্তা—ফসল তুলতেই হবে। কমলকামিনীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, নিতাই যায় বলদ কিনতে। দুর্যোগ আর দুর্ঘটনার মধ্যে বিপ্রপদ বিল পাহারা দেন। হতাশার কালো অন্ধকার তাঁর শেষ আশাটুকুও গ্রাস করে নিতে চায়। দীর্ঘদিন বাদে ইমাম ফিরে আসে বসন্ত রোগ নিয়ে। পথে ঐ রোগেই একে একে নিঃশেষ হয়ে গেছে কেনা বলদগুলো। সারা দক্ষিণের বিলে হাহাকার ওঠে। হাল বন্ধ হয়ে থাকে, চাষীরা সব ফিরে যেতে চায়। প্রকৃতি আর দুর্দৈবের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিপ্রপদ বুঝতে পারেন, মানুষ যখন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়, ধ্বংসের মোকাবিলা করতে চায়—তখন আর একা একা নয়, বাঁচতে হয় সম্মিলিতভাবে। উদারকণ্ঠে তাই তিনি ঘোষণা করেন, দক্ষিণের বিলে প্রজা জমিদার সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, প্রতিষ্ঠিত হবে যৌথ স্বত্ব। ফসল ভাগ হবে যার যার প্রয়োজন মত। নিঃস্ব বিপ্রপদ আবেগে অধীর হয়ে চাষীদের কাছে, প্রজাদের কাছে সহকর্মীর মর্যাদা চান। কৃষকেরা ফিরে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে। নিতাই ফিরে আসে একপাল বলদ-মোষ নিয়ে। আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় ভগ্ন মানুষগুলোর মনে। চাষের কাজ শুরু হয়, বিপ্রপদর মনে আশা জাগে। দক্ষিণের বিল তাঁকে শোনায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিজয়গাথা। নতুন মজুর এনে তিনি অতিদ্রুত শেষ করেন চাষের কাজ। আউশ ধান কাটার আগেই খবর আসে এস্তেজাদ্দি আসছে দলবল নিয়ে ফসল দখল করতে। জ্বলে ওঠে ইমাম। খবরের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে ইমাম ও তার সহকর্মীরা ফিরে আসে চিরশত্রুর কাটা মাথা নিয়ে। এদিকে কমলকামিনী নিজেই আসেন দক্ষিণের বিলে এবং গর্ভবতী দেহাতী মালাকে দেখে তিনি বিমূঢ় হয়ে যান। তাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি দেশে ফেরেন। বিপ্রপদ দেশে আউশ ধান পাঠিয়ে নিজে সকলের বন্ধু এবং সহকর্মী হয়েই দক্ষিণের বিলে থাকতে যান। এদিকে শিবপদর ছেলে বিনু ভারতবর্ষ কেন পরাধীন সে জানতে চায়, শুনতে চায়, বুঝতে চায়,। পরাধীনতার গ্লানিতে জ্বলে ওঠে তার মন। আর মৃত্তিকা ও ফসলের জন্য যিনি সারা জীবন ঘোষালদের বিরুদ্ধে, নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন—সেই বিপ্রপদ তার উত্তরপুরুষের চোখে দেখতে পান দিন বদলের স্বপ্ন। ঊষার রক্তিম আলোতে সেই স্বপ্নকে তিনি স্বাগত জানান।

"সমস্ত পৃথিবীব্যাপী একটা আলোড়ন এসেছে—সে আলোড়নে টনক নড়েছে পরাধীন ভারতের। সে জেগে উঠেছে অনেকদিন কিন্তু এগিয়ে যেতে পারেনি আশানুরূপ। আজ সে এগিয়ে চলেছে ঘূর্ণিবাত্যার মহাশক্তিতে। সমস্ত আধুনিক সভ্যতার সংবাদ থেকে বঞ্চিত শক্তিগড় তা জানল না—এমন যে বিপ্রপদ, সেও দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু একটা অপূর্ব কম্পন এনে দিল সেবা, সেলিম, বিনু ও অমরেশ।"

ওরা দেশকে স্বাধীন করার সংকল্প গ্রহণ করে। এদিকে দিনে দিনে ধান চালের দাম বাড়তে থাকে। মানুষের খাদ্য মহাজনের গুদামে লুকানো থাকে—দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। রাজরোষ থেকে নিজের গোলার ধান বাঁচানো যাবে না জেনে—বিপ্রপদ তা গরীব গ্রামবাসীদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন।

"অভাবে অভিযোগে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অশন বসনের লাঞ্ছনায় দেখা দেয় গণজীবনে মহা বিক্ষোভ। টগবগ করে ফুটতে থাকে অসন্তোষের লাভাস্রোত, স্বৈর শাসনের প্রাণকেন্দ্রে, প্রতি রন্ধ্রে হানতে থাকে দুর্বার আঘাত। ভয় পায় ইংরাজ। "আবার রসিদ আলীর মুক্তি আন্দোলন নিয়ে গড়ে তোলে শান্ত ধীর সংযত বিপ্লব। হাতে হাতিয়ার নেই, বোমা বেয়নেট নেই, শুধুমাত্র পতাকা সম্বল। প্রতিধ্বনি বোম্বাই থেকে ভেসে আসে বাংলায়। ক্ষেপেছে নৌ সৈনিক, ছিঁড়েছে ইউনিয়ন জ্যাক—তুলেছে ভারতের বিপ্লবী পতাকা ইংরাজের যুদ্ধ জাহাজের ওপরে। থামে না পোস্টাল স্ট্রাইক—ঐতিহাসিক স্ট্রাইক।" করাল কালবৈশাখীর সঞ্চার দেখে কেঁপে ওঠে ইংলন্ডের অধীশ্বর। ফের আসে মন্ত্রী মিশন। কিন্তু ঐতিহাসিক কলংকের গ্লানি রেখে যায় ভারতের বুকে এই মন্ত্রী মিশন। নেমে আসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। চলে অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ, বালিকা বৃদ্ধার ওপর নির্বিচারে পাশবিক অত্যাচার। এমন সময় অমরেশ কলকাতা থেকে ছুটে আসে সবাইকে নিয়ে যেতে। তারপর নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে বিনু বলে ওঠে—

"জ্যাঠামশাই, তুমি কাঁদছো, কাঁদো—ইমাম তুমি দুঃখ করছ, করো। কিন্তু সেদিন আসছে, আগত ঐ—যেদিন তাপী দুঃখী মানুষ সব হবো এক জাতি। সে এক মহান জাতি। পুরানো সমাজ এবং শোষণ ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছে—ভাঙন লেগেছে, ধ্বসে পড়তে আর দেরী নেই। তারপর গড়ে উঠবে এমন এক সমাজ যেখানে আবদুল নেই ইস্পাহানী নেই, শেঠ নেই ভিখারী নেই —না আছে ক্ষুধার তাড়না, না আছে সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা। শুধু আছে সমাজসেবী দুনিয়াজোড়া এক সুখী মানুষের দল।"

—এই হল 'দক্ষিণের বিল'-এর কাহিনী।

বাংলা সাহিত্যে অমরেন্দ্র সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও উপেক্ষিত লেখক। তাই তাঁর উপন্যাসের বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ আলোচনা তো হয়নি, এমন কি উপন্যাস ও

সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নামটিও অনেকে উল্লেখ করেন নি। দু একটি ব্যতিক্রম বাদে আলোচনা যিনিই করেছেন, সে আলোচনা হয় দায়সারা গোছের ভাসা ভাসা নতুবা মূল্যায়ণের প্রশ্নে কৌশলে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। এমনই একজন সমালোচকের বক্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা আলোচনা সুরু করবো। একালের একজন উপন্যাস সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক 'দক্ষিণের বিল' এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

"দক্ষিণের বিল' (এখন পর্যন্ত দুই খন্ড লেখা হয়েছে)- এর কাহিনীতেও এমনি একটি দ্বীপে কৃষি এবং উপনিবেশ পত্তনের কাহিনী আছে। এ কাহিনীর নায়ক একজন উচ্চাকাঙ্খী উন্নতিশীল ভূমিপতি। উন্নতি করার জন্যে যা দরকার, তার লোভ আছে এবং লোভকে কার্যে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক বুদ্ধি এবং সঞ্চয় প্রবৃত্তি তার আছে। বইটি নুট হ্যামসুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল' নামক গ্রন্থটি দ্বারা অনুপ্রাণিত।''১৯

সমালোচক মূল্যায়ণের প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে চলে গেছেন। তবে দু একটি ব্যতিক্রমের কথাও বলেছি। আসলে 'দক্ষিণের বিল' এর মূল্যায়ণ করে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অনেকেই কুন্ঠা বোধ করেন—এর কারণ কি? কল্লোল যুগের শক্তিমান লেখক হয়েও আজ তিনি যে কারণে বিস্মৃত, সেই কারণই সমালোচকদের কুন্ঠাবোধের কারণ। অথচ এ উপন্যাসের ভূমিকাতেই অমরেন্দ্র লিখেছেন,

"বিগত একশ বছর ধরে পূর্ব বাঙলার গ্রামিন সভ্যতা কিভাবে যে ব্যস্টির থেকে গোষ্ঠীর দিকে ধীরে ধীরে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তারই চিত্র এ উপন্যাস।''

অথচ সে কথা বিস্মৃত হয়েই সমালোচক-উপন্যাসের নায়ক বিপ্রপদকে ব্যক্তি লোভ ও সঞ্চয়ের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করে উপন্যাসের গুরুত্ব ও মূল্যায়ণের বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। অথচ এরই পাশাপাশি ব্যতিক্রম হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি 'দক্ষিণের বিল' এর বিশাল পটভূমিতে এপিক সুলভ মহিমা' প্রত্যক্ষ করেছেন।২০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগে আরও একজন সমালোচক প্রায় একই সুরে বলেছেন "it can confidently be said that this first volume holds out the promise of an epic, in prose."২১

'দক্ষিণের বিল' (একত্রে) কে কেবল একটি বিলের ইতিকথা হিসেবে মনে করলে ভুল করা হবে। এই বিলের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একটি মধ্যবিত্ত পরিবার আর গৌণভাবে জড়িত এমন একটি বঙ্গীয় অঞ্চল, যাকে গন্ডীবদ্ধভাবে গোটা বঙ্গদেশ হিসাবেই গ্রহণ করা যায়। নায়ক বিপ্রপদ দীন-হীন অবস্থা হতে যে কি করে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে উঠতে লাগলেন এবং এই উত্থান ফাটকাবাজী বা কালোবাজারী প্রচেষ্টার ক্রিয়াফল নয়। বিপ্রপদর জীবনের

সার্থকতার পশ্চাতে রয়েছে তিতিক্ষা, ও কর্মতৎপরতা, সাধুতা ও নিষ্ঠা, নির্ভতা ও চরিত্রের বলিষ্টতা। বলাবাহুল্য বিপ্রপদকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণের বিলের কাহিনী অঞ্চলের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটি গোটা প্রদেশই যেন আবর্তিত হয়ে এক বিশাল মহাকাব্যিক পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এক শতাব্দী ধরে একটি প্রদেশের, একটি জাতির জীবনে পরাধীনতার গ্লানি, শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ইত্যাদির জন্য জনজীবনের বিক্ষোভ, মহাযুদ্ধের তাণ্ডব, মানুষের সৃষ্ট আকাল, ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহ, পোন্টাল ধর্মঘধ, রসিদ আলি দিবসের মিছিল—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—কিভাবে একটা জাতির জীবনকে অনুপ্রাণিত ও বিপর্যস্ত করে তোলে—সেই চিত্রের পাশাপাশি এসেছে স্বাধীনতা ও শোষণহীম সমাজ প্রতিষ্ঠার বলিষ্ট প্রত্যয়। এ নিছক দক্ষিণের বিল কিংবা তার নায়ক বিপ্রপদর ব্যক্তিগত লোভ ও সঞ্চয়ের কাহিনী নয়। একশ বছরের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক বলিষ্ট দলিল।

'দক্ষিণের বিল'—বিগত একশ বছরের পূর্ব-বাঙলার গ্রামীন সভ্যতার উলঙ্গ কাঠামকে সুন্দর, নয়নাভিরাম এবং জনমনের পূজার উপযোগী করে তুলতে অমরেন্দ্র যে সত্য তথ্যের প্রলেপ দিয়েছেন—অমরেশ, বিনু পর্যন্ত সেই একশ বছরের গ্রামীন সভ্যতার ইতিহাসের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে।

প্রথমত, সম্ভোগতৃষ্ণা। বিপ্রপদর পূর্বতন জমিদার শ্রেণীর সকলেই ছিলেন ভোগী পুরুষ। তাঁদের সম্ভোগপরায়ণতা কখনো কখনো নীতির অনুশাসন করেছে, নির্বিচারে চালিয়েছে অত্যাচার। শোষণের মাত্রা ছিল বল্গাহীন। বিশেষ করে ঘোষাল পরিবার ও এন্তেজাদ তার জ্বলন্ত নিদর্শন। মনুষ্যত্ববোধের কোন বালাই ছিল না। বিপ্রপদ কিন্তু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

দ্বিতীয়ত, উদার ও অপক্ষপাত ন্যায় বিচার। বিপ্রপদ নিজের চেষ্টা, নিষ্ঠা ও সততার জোরে সম্পন্ন গৃহস্থে রূপান্তরিত হলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম দরদ। তিনি প্রতিবেশী হিসাবে যেমন স্মরণীয় তেমনি সমাজপতি হিসেবেও অনুকরণীয়। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত জীবন ও ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার রাখী বন্ধন ঘটিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন ঘটিয়েছেন।

তৃতীয়ত, বিপ্রপদর উত্তর পুরুষ বিনু, অমরেশ—দেশকে পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বলিষ্ট আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হয়ে সকলকে আশ্বস্ত করেছে। বিনু, অমরেশের জবানবন্দীতেই যেন এদেশের মানুষের চিরন্তন আকাংখ্যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

তৎকালীন পূর্ব-বাঙলার গ্রামীন সমাজ জমিদার তন্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। এই জমিদারদের ইতিবৃত্তে বহু সহস্র অত্যাচার, লালসা ও অর্থলোভের কলংক চিহ্ন আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের অনিবার্য আঘাতে জীর্ণ জমিদারী প্রথাদেশের বুক থেকে অন্তর্হিত হয়েছে।

কিন্তু জমিদারির বিলুপ্তির সংগে সংগে আর একটি মহৎ বস্তুর অন্তর্ধানের আশংকা দেখা দেয়—তা হচ্ছে ব্যক্তি-চরিত্রের আভিজাত্য। জাতির সামগ্রিক চরিত্র এই আভিজাত্যের অভাবে দীন হয়ে পড়ে, জমিদারী দূর হলেও অভিজাত ব্যক্তি চরিত্রের সমাদর অন্য ভাবে জেগে ওঠে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মযজ্ঞের নেতাদের মধ্য দিয়ে। অমরেন্দ্র নিজে সম্পন্ন কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলেন। নিজে তাঁর বিরাট পরিবারের ভাঙন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বুঝে-ছিলেন জমিদারী রাখা যাবে না, বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করতে হলে চাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। তাই তিনি বিপ্রপদকে যৌথস্বত্ব ঘোষনা করিয়েছিলেন বিদায় দিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানাকে। দক্ষিণের বিলে যখন বলদের মড়ক লাগে. কৃষকরা যখন দক্ষিণের বিল ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, তখন বিপ্রপদ দীপ্ত কন্ঠে বলেন—

"শোন তোমরা. জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, ফসল ছাড়া তেমনি মানুষ বাঁচে না। যে মড়ক দেখে আজ ভয় পাচ্ছ, সে মড়ক তোমাদের ঘরে ঢুকবে, যদি শুধু হাতে বাড়ী ফেরো। মন্বন্তরের কথা শোন নি? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা জোড়া আকাল? আজ আমি শপথ করছি, এ জমিতে নতুন স্বত্ব হবে —যৌথস্বত্ব, খামারও হবে যৌথ। প্রজা মনিবের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।"

—অমরেন্দ্র নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। বিপ্রপদর এই উক্তি কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা থাকল না—একটা সর্বজনীন রূপ নিয়ে দেশ কালের গন্ডী অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ল বিশাল পটভূমিতে। এই প্রসংগে নিম্ন লিখিত উদ্ধৃতিটিতে উক্ত বক্তব্যের সমর্থন মিলবে ঃ

"দক্ষিণের বিল—পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক কাহিনী, কিন্তু লেখকের রচনা কৌশলে অঞ্চলের কাহিনী প্রদেশের সমগ্রতা লইয়া আমাদের কাছে সমুপস্থিত। লেখকের সর্বাপেক্ষা বাহাদুরী উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের পরিবেশকে রূপদান করা। পূর্ববঙ্গকে বিষয় করিয়া পূর্বে বহু উপন্যাস, গল্প রচিত হইয়াছে কিন্তু সে সব ও অমরেন্দ্রবাবুর উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য ইহাই—তাঁহাদের রচনায় পূর্ব-বঙ্গীয় পরিবেশ আকার লাভ করে নাই। 'দক্ষিণের বিল'-এ অমরেন্দ্রবাবু যে বিরাটত্বের আভাস দিয়াছেন তাহার সহিত তুলনীয় রচনা আধুনিক সাহিত্যে আপাতত ঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।"২২

পূর্ব বাঙলার গ্রামীন সভ্যতার গূঢ় রূপ কথা কাহিনীর আকারে ফুটিয়ে তুলতে অমরেন্দ্রর চাইতে যোগ্য ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ নেই বলেই আমার ধারণা। তিনি নিজে পূর্ব বাঙলার পল্লীর সন্তান। পল্লীর সংগে তাঁর যোগ বাহ্য যোগ নয়, প্রাণের টানের যোগ। পল্লীর সুখ দুঃখের সংগে একীভূত হয়ে দীর্ঘদিন তিনি পল্লীজীবন যাপন করেছেন। তাঁর পক্ষে এ অভিজ্ঞতা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে এইজন্য যে, তিনি সহজাত শিল্পদৃষ্টি নিয়ে জন্মেছেন। এই শিল্পদৃষ্টির প্রসাদে পল্লীজীবনের আপাত বৈশিষ্ট্য বর্জিত

ঘটনাসমূহও তাঁর চোখে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গ্রামবাসী মাত্রের কাছেই গ্রামজীবন খোলা পুঁথির মতো প্রত্যক্ষ, কিন্তু সেটা গ্রামজীবনের বহিরঙ্গ বৈ নয়। গ্রামের অন্তর্গূঢ় রূপ প্রত্যক্ষ করতে হলে আলাদা চোখ চাই এবং সে চোখ সকলের থাকে না। আনন্দের বিষয়, অমরেন্দ্রর রচনায় সেই চক্ষুষ্মানতার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর চক্ষুও আছে, হৃদয়ও আছে। দৃষ্টি ক্ষমতার সংগে হৃদয়বত্তা যুক্ত হলে লেখকের আর মার নেই। উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে অমরেন্দ্র তাই অসাধারণ।

পূর্ব বাঙলার পরিবেশকে যথাযথ রূপদান করার সংগে সংগে এ উপন্যাসে অমরেন্দ্রর আর একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম হল চরিত্র সৃষ্টি। 'দক্ষিণের বিল'-এর বিশাল মহাকাব্যিক পটভূমিতে এক শতাব্দীর বিবর্তনের সংগে এসেছে অসংখ্য চরিত্র। চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না—যত ক্ষুদ্র চরিত্রেই হোক না কেন—সেই ক্ষুদ্রও একটি অখণ্ড মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কবি মণীন্দ্র নাথ রায় বলেছেন,

"Those, neverthless, are living beings, men and women from all walks of life whom in flesh—and blood, we all have seen, admired and loved, some rising the fleming fire-work to turn into ashes in the mid-air and others rising from the mud and filth into the position of power and authority."২৩

এখানে প্রধান চরিত্র বিপ্রপদর সঙ্গে দক্ষিণের বিলের প্রকৃতিও যেন আর একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দপুর। বিপ্রপদ ও দক্ষিণের বিলের প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাঙলার গ্রামীণ সভ্যতা ও চরিত্রগুলি দ্রুত আবর্তিত হয়ে এর বিশাল মহাকাব্যিক পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই এ মহাকাব্যের নায়ক বিপ্রপদ এবং দক্ষিণের বিলের প্রকৃতি যুগ্মভাবে।

মহাকাব্যের নায়কের বলিষ্ঠতা, বিশালতা, গাম্ভীর্য, ঐশ্বর্য—দুই-ই সমপরিমাণে বর্তমান। বিপ্রপদ যেমন দরিদ্র অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হাতে উঠে এসেছেন। গ্রামের দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান প্রজার প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন, অত্যাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করে অত্যাচারিতকে রক্ষা করেছেন, সমস্ত পুরানো সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের বেড়া ভেঙে নতুন যুগের আবাহনী গেয়েছেন—ঠিক তেমনি দক্ষিণের বিলও তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ঐশ্বর্যের চরে দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান জানিয়েছে, তার বিশাল ও উদার চরে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের পরেও দিয়েছে অফুরন্ত সবুজ সোনালী ফসল। বিপ্রপদ যেন পূর্ব বাঙলার গ্রামীণ সভ্যতার জীবন্ত বিগ্রহ। তাকে কেন্দ্র করেই যেন সেকাল ও একালের সমাজ

আদর্শের পার্থক্যটা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিপ্রপদকে সামনে রেখেই অমরেন্দ্র বলতে চেয়েছেন,

"তখন মানুষ ছিল আদর্শবাদে বিশ্বাসী। এখন জীবনবাদে। তখন সমস্ত শ্রেয় বোধ ছিল ঈশ্বরে নির্ভরশীল। এখন মানুষে। তখন সব কথার শেষ কথা ছিল ত্যাগ, আজ দেখতে পাচ্ছি ভোগ। তখন জীবনটাই ছিল বাণী। এখন বাণীর সঙ্গে জীবনাদর্শের কোন সঙ্গীত নেই।"২৪

বিপ্রপদর জীবন সংগ্রামের এক একটি স্তর যেন এক একটি যুগের ইতিবৃত্ত বহন করে এনেছে আমাদের সাননে। সংসার প্রতিপালনে অক্ষম বিপ্রপদ চার আনা পয়সা সম্বল করে স্ত্রী কমলকামিনীর পরামর্শে শহরে যাত্রা করল। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বিপ্রপদ যখন এক মুসলমান বাড়িতে ওঠে, তার আতিথেয়তা দেখে মনে মনে ঠিক করে নেয়—

"দরিদ্রের চেয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনবোধে কেড়ে নিতে হবে, সময়তে ছিনিয়ে আনা চাই। নইলে কে তার মুখে তুলে দেবে ?"

শহরে গিয়ে জমিদারের নজরে পড়ে মুহুরী থেকে নায়েব, নায়েব থেকে ম্যানেজার হলেন। তারপর ধীরে ধীরে বিষয় সম্পত্তি করেন, দক্ষিণেব বিল এবং সেনেদের তালুক কিনে গ্রামেব দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ করেন। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন, প্রয়োজনে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সে যুগে বসেই বিপ্রপদ অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই—ব্যক্তিগত মালিকানা রদ করে—জমিতে যৌথ খামার গড়েছেন। বিপ্রপদ বুঝেছিলেন, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে জমিদাবতন্ত্র ভাঙবেই, পৃথিবী-ব্যাপী শোষিত, নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষেব সংগ্রামের জয় একদিন হবে —তাই নিজেই তার বিজয় ঘোষণা করেছেন। এ উপন্যাসে তিনিই যেন এই সমস্ত মানুষেব অবিসংবাদিত নেতারূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

গ্রাম্য কৃষক নিতাইয়ের সংগে কথা বলতে বলতে বিপ্রপদ যখন বলেন,

"দক্ষিণেব বিলের সমতল ক্ষেত্রে যে মহামিলনের সুযোগ দিয়েছেন বিধাতা, সে সুযোগ শুধু ধনের না, মানেব না অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ার সুযোগ। তাই গৌরবেব খোলস ত্যাগ করে হাতে হাত মিলিয়ে যেতে চাই সকলে। প্রভু বলে, মনিব বলে আজ আমাকে সে সুযোগ থেকে কেউ বঞ্চিত করো না।"

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষালদের চক্রান্তে বিপ্রপদর ম্যানেজারীর চাকরী চলে যাবার পরই তার চরিত্রের আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। অমরেন্দ্র দেখিয়েছেন,

"দুঃখে তিনি থামবেন না, সুখের আশায় এগিয়ে যাবেন সম্মুখের দিকে। ম্যানেজারীর রঙ মশাল তাঁর নিভে গেল, যদি নিভেই থাকে, ভালই হল—ঐ স্বাধীনতার আলো জ্বলছে, একটু গ্রীব উঁচু করলেই দেখা যাবে সে আলো।"

বিপ্রপদর জীবনের এই বাঁকই হল দক্ষিণের বিলে ফসল ফলানোর সংগ্রাম। দক্ষিণের বিলে বিপ্রপদ-নিতাই, ইমাম ও সমবেত সকলকে নিয়ে যে হাল ধরেন, সে হাল যেন দৈবের বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহের হাল। বিপ্রপদর চরিত্রের তেজস্বিতা দৃঢ়তা ও প্রত্যয় আমাদের নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবনের কোন পরিস্থিতিতেই—কি মানুষের শক্তির কাছে, কি প্রকৃতির নির্মম রোষের কাছে- কোথাও যেন বিপ্রপদ আত্মসমর্পণ করতে শেখেন নি। তাঁর জীবনের অভিধানেও 'না' কথাটি নেই।

বিপ্রপদর যাবতীয় ঐশ্বর্য এবং শক্তির মূল উৎস স্ত্রী কমলকামিনী। কমলকামিনী বাংলাদেশের পরিচিত জমিদার গৃহিনীর মত এ উপন্যাসে আবির্ভূতা হননি। বাংলার নিভৃত, নিস্তরঙ্গ পল্লীকোণের এক স্নেহশীলা পল্লীজননী রূপে—এ উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। একদিকে অসাধারণ প্রখর বিষয়বুদ্ধি, অন্য দিকে কঠোর ব্যক্তিত্ব, শান্ত বাৎসল্য, সংসারের প্রতি অসীম মমত্ব বোধ, সমস্ত পুরোনো প্রথা ও কুসংস্কারের গন্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসে—অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি শক্তিগড় থেকে দক্ষিণের বিল পর্যন্ত দাপটে বিচরণ করেছেন। বিপ্রপদ বিষয় সম্পত্তি গড়েছেন আর কমলকামিনী তাকে পুত্রস্নেহে লালন পালন করে রক্ষা করেছেন। তিনি শুধু তাঁর সন্তানদের জননী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমগ্র শক্তিগড় ও দক্ষিণের বিলের জননী। বিপ্রপদ কর্মস্থলে ফিরে যাবার পথে স্টীমারে গুন্ডাদের আক্রমণ থেকে দেহাতী যুবতী মালাকে উদ্ধার করে বিবেকের তাগিদে তাকে আশ্রয় দিলে, সে খবর কমলকামিনীর কানে গেলে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তাঁর আচরণ অমরেন্দ্র অল্প কথায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করে বলেছেন—

"এতদিন তিনি যা ভোগ করেছেন, নিজের একান্ত বলে জেনেছেন, তা এত সহজেই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবে কেউ? তাঁর জিনিষ তিনি সংগ্রাম করে ছিনিয়ে আনবেন। অবুঝ হলে শাসন করবেন, প্রয়োজন হলে তিরস্কার করবেন—তা বলে কি বিলিয়ে দেবেন একটা অপরিচিতা মেয়ে মানুষের কাছে? এ স্বত্ব তাঁর সংরক্ষিত স্বত্ব—অপরের পক্ষে দাবী করা নিষ্ফল।"

অথচ এই কমলকামিনীই 'দক্ষিণের বিল' থেকে মালাকে শক্তিগড়ে এনে আশ্রয় দিয়েছেন। তার গুণের পরিচয় পেয়ে, তার জীবনের ইতিহাস শুনে—তার প্রতি জননীর মমত্ব দেখিয়েছেন। আবার দক্ষিণের বিলে যখন বলদের মড়ক লেগেছে, বিপ্রপদ যখন বিপর্যস্ত, কমলকামিনীর সঞ্চিত অর্থের ভান্ডার যখন প্রায় নিঃশেষ— ঠিক তখন তিনি মালাকে বলেছেন,

"কালনাগিনী, তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়ে ভুল করেছি। তুমি এক্ষুনি বিদায় হও একদিকে। আমার সোনার সংসার বিষে বিষে আর জর্জরিত করে দিও না। তোমার পায়ে পড়ি।"

কমলকামিনীর এই উক্তির কেন্দ্রে আছে যত না মালার প্রতি বিদ্বেষ, তার চেয়ে অনেক বেশী স্বামী এবং সংসারের প্রতি মমত্ববোধ।

দীনু ঠাকুরের চরিত্রটি ক্ষুদ্র। তবু ঐ ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে পাওয়া গেছে এক অখণ্ডতাকে। সে একদিকে অত্যন্ত কুচক্রী, অন্যদিকে পরশ্রীকাতর। নিঃসন্তান এই দীনু ঠাকুর স্ত্রীকে নিয়ে অত্যন্ত কায়ক্লেশে দিন যাপন করে। পরিশ্রম করতে পারে না, টাকা পয়সা ক্ষেত খামারও তার নেই। তাকেও তো বাঁচতে হবে। তারও তো সমাদর চাই। মানুষ হয়ে জন্মেছে সে, গরীব বলে কি তার উচ্চাকাংখা, উচ্চাভিলাষ থাকবে না? যতদিন তার পিতা বেঁচে ছিল, সেও এইভাবে চালিয়ে গেছে— কত ভেদনীতি চালিয়ে গেছে ঘরে ঘরে। দীনু বেশি কিছু আশা করে না—শুধু যোগ্যপুত্রের মত পিতার পদাংক অনুসরণ করে যেতে চায়। তাকে বহুরূপী হতে হবে। জীবন সংগ্রামে সকলের এক নীতি হলে চলবে কী করে? মানুষ চাষ করে বলদ দিয়ে, সে চাষ করবে মানুষ দিয়ে। তাই সে সেনেদের তালুক কেনার ব্যাপারে ঘোষালদের উত্তেজিত করে বিপ্রপদর বিরুদ্ধে, আবার বিপ্রপদকে উত্তেজিত করে ঘোষালদের বিরুদ্ধে। আর এ সবের মূলে আছে আড়াইটা টাকা। কেন না এই টাকা পেলেই তার এক সপ্তাহ চলে যাবে। কিন্তু দীনুর সমস্ত কূটকৌশল ও পরশ্রীকাতরতার অন্তরালে আরও একটি জিনিষ চাপা পড়ে থাকে—তা হোল এক চিরন্তন পিতৃস্নেহ। তারই নোনা ফলের গাছের ডালে বিপ্রপদর পুত্র অমরেশ ও গ্রামের বাল্যবধূ সোনালীকে দেখে দীনু তার স্ত্রীকে বলে,

"তোমার পেটের দুটো থাকলেও তো অত বড়ই হোত—অমনি সুন্দর দেখাত। আমি তুমি নোনা ফল দিয়ে করব কি, ওরা খাক, ওরা পেড়ে নিয়ে যাক। আহা আবার পড়ে না যায়। বলতে বলতে নিঃসন্তান দীনুর মন নরম হয়ে ওঠে।"

তারপর একদিন স্ত্রীর মৃত্যু হলে দীনু ঠাকুর নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে গ্রাম ত্যাগ করে যায়। দীনুর এই নিঃশব্দ প্রস্থান সকলের হৃদয়ে এক মর্মান্তিক হাহাকার তোলে।

আসমানতারা, মালা, সোনালী— এরা শুধু চরিত্র নয়। এরা প্রত্যেকেই এখানে স্বস্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অত্যাচার, শোষণ, সামাজিক নিপীড়ন ও অবক্ষয়ের বলি হয়েছে প্রত্যেকেই। বিশেষ করে আসমানতারার কিশোর বয়স থেকে অত্যাচার ও ব্যাভিচারে ওর হৃদয় মন জর্জরিত হয়েছে। ওর নারী জীবনের কোন কামনাই সার্থক হয় নি। বছরের পর বছর ও যাদের সন্তান ধারণ করেছে, তারা ওকে শুধু কামনার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার ওর অঙ্গে অঙ্গে দাগ পড়ে গেছে লাঞ্ছনায়। তাই ওর দাম্পত্য এত দুর্মর এবং সেই কারণেই স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করে যেতে পেরেছে।

মালা নিঃশব্দে নীরবে ভক্তিভরে ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তার আশ্রয়দাতা বাবুজী বিপ্রপদর সেবা যত্ন করেছে। চাষের কাজে এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে এবং বিপ্রপদর সংকটের দিনে গলার হার খুলে নিতাইয়ের হাতে দিয়েছে—বলদ কেনার জন্য। আবার শাঁকচড়ে এসে কমলকামিনীর সংসারের অনেক ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

পূর্ব বাঙলার গ্রামীন সমাজ মূলতঃ দুটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে—হিন্দু ও মুসলমান। নিতাই ও ইমামের মধ্য দিয়েই যেন উভয় সম্প্রদায় প্রতিফলিত হয়েছে। উভয়ের সম্প্রীতির মধ্য দিয়েই হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আলাদা করে আর উভয়ের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ও সম্প্রীতিই অমরেন্দ্রর জীবন ও সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য।

অমরেন্দ্রর রচনা পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক তারাশংকরের কথা বলেছেন।

"তারাশংকর এবং অমরেন্দ্র ঘোষের রচনার মধ্যে সাযুজ্য হয়তো কিছু কিছু আছে, কিন্তু প্রভেদও বড়ো কম নয়। খতিয়ে দেখলে প্রভেদটাই বড়ো বলে মনে হবে। পূর্ব বাঙলার শ্যামল আর্দ্র মাটির কোলে যে মানুষের জন্ম, তার মানসিকতায় ভাবালুতার অনেকখানি মিশাল থাকবেই। রাঢ় বাঙলার ঊষর কঠোর মৃত্তিকার কোলে বর্ধিত মানুষের মনে ভাবালুতার পরিমাণ অনেক কম। তা ছাড়া দুই বাঙলার মধ্যে ভৌগোলিক তথা অর্থনৈতিক সংস্থিতিগত পার্থক্যও বড়ো কম নয়। কয়লাকুঠি বংকরিত বীরভূম আর নদীমেখলা বরিশাল—দুয়ের চেহারাই আলাদা। এই পার্থক্য যদি মনে থাকে তবে তারাশংকর আর অমরেন্দ্র ঘোষের রচনা পদ্ধতির পার্থক্যও মনে থাকবে। সর্বোপরি রচনাকুশলতার তারতম্যঘটিত মূল পার্থক্য তো আছেই। অমরেন্দ্র ঘোষের লিখনভঙ্গী স্বচ্ছ, স্পষ্ট, স্বচ্ছন্দ। ভাষা অনাড়ম্বর এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তারাশংকরের মতো সনাতনপন্থী ভাষায় তিনি লেখেন না এটা আশার কথা।"২৫

আজ আমরা এক সংকটময় মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন—এই অবস্থায় অমরেন্দ্রর 'দক্ষিণের বিল' জাতির জীবনে শক্তি সঞ্চার করবে, কারণ এতে আছে নতুন দর্শনের ইংগিত। সমগ্র জাতিকে সঞ্জীবিত করতে হলে জীবনে নতুন দৃষ্টিভংগী অনুসরণীয়—অমরেন্দ্র সুনিশ্চিত সেই দৃষ্টির অধিকারী। তাছাড়া লেখক গ্রামের হিন্দু—মুসলমানের মিলিত জীবনের যে চিত্র অংকিত করেছেন তা মর্মস্পর্শী। সাম্প্রদায়িকতার বিষেবাষ্পে আজকের দিনের তিক্ত আবহাওয়ায় এই চিত্র যিনি পরিবেশন করবার দুঃসাহস রাখেন তাঁর হৃদয়বত্তা অসীম। লেখকের এই সুস্থ সুন্দর উদার মনোবৃত্তির জন্য জাতির কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

পূর্ব বাঙলার গ্রামীন পটভূমিতে শ্রেণী সংঘাতের এক অপূর্ব কাহিনী হল 'কনকপুরের কবি'।

ছোড়াদি জয়ন্তী রানীর সেরেস্তার সামান্য খাতা লেখার মুহুরী কবি অজয়। সংসারের দুঃখ, কষ্ট, অনটন তার নিত্য সঙ্গী। স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে তার ছোট সংসার। অজয় "দারিদ্রের অসহায় জ্বালার তাড়নায় বাধ্য হয়ে রসুলের টাকার থলে চুরি করে—একদিকে নিজের উঞ্ছবৃত্তির পরিচয় রাখে, অন্য দিকে নিজের চরিত্রকে করে কলঙ্কিত।" পল্লীর চারদিকে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা। এই পরিবেশের মধ্যেই প্রকৃতির রূপ এবং রং অজয়ের কবি মন স্বপ্নের জাল রচনা করে। কিন্তু সে সার্থকতার পথ, স্বীকৃতির পথ খুঁজে পায় না। তবুও চেষ্টা চলতে থাকে। অজয় স্বপ্ন দেখে—চারণ কবি মুকুন্দ দাসের মত পালা গেঁথে পল্লী জীবনকে উজ্জীবিত করবে—গ্রামীন সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তুলবে বিদ্রোহের ধ্বজা। কিন্তু বাধ সাধেন ছোড়াদি জয়ন্তী রাণী।

"কবির চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে, জয়ন্তীব মত কোটি কোটি বঞ্চিতা নারীর মুখ—যুগ যুগান্তরের সাক্ষী যারা। কবি পরিস্কার দেখছে—অর্থ ও স্বার্থের জালখানি ফেলা হয়েছে চমৎকার করে ছড়িয়ে। এই মুহূর্তেই জালের ফাঁস ছেঁড়া উচিত, নইলে মৃত্যু অনিবার্য। এ ভাগ্য নয়, অদৃষ্টও নয়, শিকারীর চক্রান্ত। জাল ছিঁড়তেই হবে, ভাঙতে হবে যত মান্ধাতার আমলের জীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো।"

ছোড়াদি জোটের মহলের প্রজাদের জোট ভাঙতে বদ্ধ পরিকর। অজয় ছোড়াদিকে বলে,

"ছোটদি, জনতা ক্ষুধাত সে আইন, আদালত ডিগ্রী, নিলাম বোঝেনা—অন্ন চায়, চায় বস্ত্র। এমনি চায় না, চায় পরিশ্রমের বিনিময়ে।"

অজয়ের এ কথায় জয়ন্তীরাণী বিরত হয়। কিন্তু হঠাৎ ব্রজদাস একখানি কুঠার নিয়ে কনকপুরের মাটিতে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করে।

"ব্রজদাস আর জেলখানা থেকে ফিরবে না, কিন্তু তার পরম কীর্তি ভুললে তো চলবে না। যদি ভুলে যাও পূর্ববর্তী নিষ্ঠা, যদি ভুলে যাও কীর্তিমানের ইতি কথা, তবে তোমরা মানুষ নয়, পদলেহনেরই যোগ্য। একখানা হাতিয়ারে যে ঝলক দেখিয়েছে, সহস্রখানা হাতিয়ারে তার সহস্রগুণ ঝলক দেখান চাই। এ ছাড়া বাঁচার আর কোনও গত্যন্তর নেই।"

কনকপুরের মাটিতে দলে দলে ছুটে আসে পুলিশ—লাঠি, ব্যাটন চার্জ হয় অবিশ্রাম। তারপর অজয় কনকপুরের গ্রামবাসীদের একত্র করে বলে,

"আমার উদ্দেশ্য কি তোমরা হয়ত বুঝেছ। এ কিন্তু সখের যাত্রা, টপ্পা কিংবা কীর্তন গান নয়। মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে হবে ঢেঁকির কু-কীর্তি। যে ঢেঁকিতে ব্রজদাসের সংসার ভাঙে, বাপ মাকে

ফাঁকি দিয়ে মেয়ের ওপর জুলুম করে, যে ঢোঁকিতে মানুষের আমরা জরুদগ্‌ গিলে খায় তার বিরুদ্ধে লড়াই।”

কলকাতা থেকে কুসুম কবির জন্য দুখানা ছবি বহন করে এনেছে। কবি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইনি তোমাদের সংগ্রামী দর্শনের জন্মদাতা আর উনি তাঁর প্রধান মন্ত্রশিষ্য, জগতের সর্বহারার মহান বন্ধু। “কবি এগিয়ে চলে। বুকে তার সংগ্রামী শপথ।” এই ভাবেই 'কনকপুরের কবি'র কাহিনী শেষ হয়েছে।

'কনকপুরের কবি'র মূল বক্তব্য কৃষক অভ্যুত্থান—যার মধ্যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি আছে, পীড়িত মানবাত্মার প্রতি বেদনাবোধ আছে। 'চরকাশেম' থেকে 'দক্ষিণের বিল' পর্যন্ত একটা জিনিস লক্ষণীয় তা হোল—এই দুই উপন্যাসেই নায়কেরা কৃষক সমাজকে নিয়ে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং তা সার্থকও হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হুসেন মিঞাও কৃষকদের নিয়ে ময়নাদ্বীপে নতুন উপনিবেশ গড়তে চেয়েছে, কিন্তু হুসেন মিঞার উপনিবেশের সংগে অমরেন্দ্রর উপনিবেশ গড়ার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নিঃসন্দেহে ভিন্ন রকমের। ময়না দ্বীপের কৃষকরাও সংগ্রাম করেছে, কিন্তু কনকপুরের কবি তে সংগ্রাম এসেছে একটু ভিন্ন স্বাদের এবং ব্যাপকতর পথের সম্ভাবনা নিয়ে। প্রথম দুটি উপন্যাসে গড়ে উঠেছে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে নতুন বসতি, নতুন যুগের বার্তাবহ হয়ে। 'কনকপুরের কবি'তে সংগ্রাম এসেছে আরও ব্যাপকতর রূপে, পৃথিবীর সংগ্রামী দর্শনের জন্মদাতা এবং তার প্রধান মন্ত্রশিষ্য—জগতের সর্বহারার মহান বন্ধুব বার্তাবহ হয়ে, হুসেন মিঞার ময়নাদ্বীপে যা অনুপস্থিত। জনৈক সমালোচক 'কনকপুরের কবি পড়ে মন্তব্য করেছেন, 'কনকপুরের কবি'র নায়ক অমরেন্দ্রর সৃষ্ট অত্যন্ত ভাল মানুষ।

“অপদার্থ ভালো মানুষেরা না পারে সংসার করতে না পারে সমাজের কাজ করতে। তারা তাই সংসারে বা সমাজে যাযাবর। এই যাযাবরত্ব অবিশ্যি অমরেন্দ্রবাবুর ভালো মানুষদেরও আছে। কিন্তু এমন একজন মানুষকে কৃষক অভ্যুত্থানের নায়ক হিসাবে কল্পনা করে লেখক অবাস্তবতার মধ্যে পা দিয়েছেন। যাদের মনে সদিচ্ছা এবং সহানুভূতির অভাব নেই তারা অপরের দুঃখ দেখে অভিভূত হবে এবং ক্ষমতা থাকলে তা নিয়ে কবিতা লিখবে, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষক অভ্যুত্থানের নায়ক খুব কদাচিৎ-ই কবি হয়ে থাকেন। কারণ কৃষক অভ্যুত্থানের নায়কের মধ্যে যে সংগঠন ক্ষমতা, বাস্তববোধ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দরকার, ভাবাবেগ প্রধান কবি মানসে তা দুর্লভ। কনকপুরের কবি এমনি এক ভাবাবেগ প্রধান কবি।”২৬

সমালোচকের প্রথম মতের সংগে আমরা একমত হতে পারি না। কেন না 'সংসার করতে না পারলে', 'যাযাবর হলে' কিংবা 'কবিতা লিখলে' কৃষক

অভ্যুত্থানের নায়ক হতে পারবে না—বোধহয় এটা ঠিক নয়। তার কারণ কনকপুরের কবি অজয়ের আচরণের মধ্যে অন্ততঃ আমরা তা দেখিনি। আর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্ধ বিক্ষুব্ধ ভাবাবেগ আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও ছিল আজও আছে। পালাগানের মধ্য দিয়ে কনকপুরের কৃষকদের সংগঠিত করার যে পদ্ধতি কবি গ্রহণ করেছে—তা একেবারে অযৌক্তিক কিংবা অবাস্তব এটা মেনে নেওয়া যায় না। সে যুগে বৃহৎ জগতের সংগে বিচ্ছিন্ন, অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষকদের যদি সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্যের দ্বারা সংগঠিত করার চেষ্টা হোত—তাহলে তার ফল বোধহয় ভাল হোত না। তাই পালাগানের মধ্য দিয়েই কবি পৃথিবীর সংগ্রামী দর্শনের জন্মদাতা এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রশিষ্য, জগতের সর্বহারার মহান বন্ধুর বার্তা তাদের কাছে এনে হাজির করে দিয়েছে। আর সাংগঠনিক অক্ষমতার যে কথা সমালোচক বলেছেন তাও সঠিক নয়। উপন্যাসে যে যুগের কথা বলা হয়েছে—সে যুগে একমাত্র রাশিয়া ও চীন ছাড়া আর কোথাও সংগ্রামী দর্শন প্রয়োগ করা হয়নি। ভারতবর্ষের কৃষকরা তো কেবলমাত্র অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে বলি হত। তীতুমীর, সিধু কানহু-বিরশা মুণ্ডা—এদের বীরত্ব ও সংগ্রামের কথা সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেখার মত সংগঠন তখনও পর্যন্ত এ দেশে গড়ে ওঠে নি। তা সত্ত্বেও কবি যখন কনকপুরের নিরক্ষর, দরিদ্র, শোষিত ও নিপীড়িত কৃষকদের একত্রিত করে বলে,

'আমার উদ্দেশ্য কি তোমরা হয়ত বুঝেছ। কিন্তু এ সখের যাত্রা, টপ্পা, কিংবা কীর্তন গান নয়। মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ফাঁস করে দিতে হবে ঢেঁকির কুকীর্তি। যে ঢেঁকিতে ব্রজদাসের সংসার ভাঙে, বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে তার মেয়ের ওপর জুলুম করে, যে ঢেঁকিতে মানুষের জমি জমা ভদ্রাসন গিলে খায়, তার বিরুদ্ধে লড়াই।''

কলকাতা থেকে কুসুম কবির জন্য দুখানা ছবি বহন করে আনে। কবি বলে,

"ইনি তোমাদের সংগ্রামী দর্শনের জন্মদাতা—আর উনি তাঁর প্রধান মন্ত্র শিষ্য, জগতের সর্বহারার মহান বন্ধু।''

জনমনে এরই প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে অমরেন্দ্র লিখেছেন—

"মুখর জনতা স্তব্ধ হয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকে। তার ব্যাখ্যা দাবী করে না, অনুভবে সব যেন বোঝে। প্রতি বুকে ছবি দুটি যেন রক্ত মাংস অনুরাগে মূর্ত হয়ে ওঠে।''

এমনি ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষক অভ্যুত্থানই একদিন যোগ্য নেতা ও সংগঠনের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং অমরেন্দ্রর প্রচেষ্টা অবাস্তব এ কথা মেনে নিতে মন চায় না। তা ছাড়া আরও একটি বড় কথা হল, শিল্প সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন সামগ্রিকভাবে

তাকে শিল্প হয়ে উঠতেই হবে এ কথা মার্কসবাদের প্রবক্তারাও স্বীকার করে নিয়েছেন। মাও সেতুঙ বলেছেন—

"আমরা দাবী করি: শিল্পের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করতে হবে, বিষয়বস্তুকে রূপরীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যথাসম্ভব উচ্চস্তরের শিল্পগুণের সঙ্গে বিপ্লবী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিষয়বস্তু রাজনীতির দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, শিল্পমূল্যের বিচারে উত্তীর্ণ না হলে তা ব্যর্থ হবে। সেইজন্যই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু সম্পন্ন শিল্প-কর্মের যেমন নিন্দা করি, তেমনি নিন্দা করি প্রাচীরপত্র বা স্লোগানের ভঙ্গিতে রচিত শিল্পকর্মের, যাতে কেবল বিষয়বস্তু রয়েছে কিন্তু নাই রূপ রীতি।"২৭

কনকপুরের কবির নায়ক রাজনীতি করলেও শিল্পমূল্যের বিচারে সসম্মানে উত্তীর্ণ। তবে সমালোচকের দ্বিতীয় অভিযোগ ভাবাবেগ প্রবণতার সংগে আমাদেরও কোন বিরোধ নেই। তবে লেখকের এই ভাবাবেগ প্রবণতা কোন কোন স্থানে নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হলেও, উপন্যাসের বিষয়বস্তুর উৎকর্ষে তা চাপা পড়ে গেছে।

কনকপুরের কবির আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল—এর চরিত্রসৃষ্টি ও শিল্পী সংযম। কবি প্রসংগ আমরা আগের অনুচ্ছেদেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা ছোড়দি জয়ন্তীরাণী, ডালিমজান, কুসুম, পাখী, কুচক্রী জনার্দন বক্রবর্তীর কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করবো—কারণ এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র।

ছোড়দি জয়ন্তীরাণীর কাছারিতেই কবি মুহুরীর কাজ করেন। জয়ন্তীই তার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জিউয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী। জয়ন্তীর পরিচয় দিতে গিয়ে অমরেন্দ্র বলেছেন,

"তিনি বিধবা হয়েছেন অকালে। কি না ছিল জয়ন্তীর। নীলোৎপলের মত চাহনি, সর্পিল চুল ক্ষুরধার বুদ্ধি, অংগ ভরা রূপ। কোন কাজেই তো লাগল না। একটা সহজ স্রোত ধারাকে যেন পাথরের দুর্গ প্রাচীরে বন্ধ করে সৃষ্টি করা হয়েছে শাস্ত্রের আদর্শ -হিন্দু নারীর সতীত্ব। বিবেকের বন্ধজাল। ছোটদি নিষ্পাপ -তিনি গহন অরণ্যের গম্ভীর সরোবরের শ্বেত শতদল।"

বৈষয়িক সমস্ত কাজেই ছোটদি কবির ওপর একটু বেশী নির্ভরশীল। মনে একটা আকর্ষণও অনুভব করেন—কিন্তু তা থাকে সম্পূর্ণ নিরুচ্চার। তার এই নিরুচ্চার মনের বেদনা ও বঞ্চনা কবিরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তার মধ্যে যেমন দয়ামায়া, স্নেহ-মমতাও আছে, তেমনি আছে কঠোরতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। কুচক্রী ভাই জনার্দনের আচরণে সর্বনাশের ইংগিত পেয়ে ছোটদি একদিকে যেমন সতর্ক করেন অন্যদিকে কবির কথায় তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়ে। জোতের মহলে তাকে যেতেই হবে। সেখানকার খাজনা আদায়

করতেই হবে। কবিকে সংগে নিয়ে ছোটদি যাত্রা করেন। পথে কবি যখন ছোটদিকে বলেন, "সত্যই হচ্ছে ধর্ম এবং শাশ্বত। এর ক্ষয় ক্ষতি নেই।" জবাবে ছোটদি বলেন, "জীবনভর যা বুঝলাম, যা শাস্ত্র পুরাণে পড়লাম, তেমনি যদি তোমার কথা জট পাকান হয়, তবে আর জোটের মহলে ছুটে এসে লাভ হল কি?" কবির কথার সারবত্তা বুঝে নিতে বুদ্ধিমতী ছোটদির কোন অসুবিধে হয় না। ছোটদি যখন হাহাকারে মুখরিতা হয়ে উঠেছিলেন, তখন নায়ক কবি মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং দৃঢ়তা দেখিয়ে মোহমুক্ত করেছিল এই বালবিধবাকে। তাই বনকপুরের অসংখ্য বঞ্চিতা নারী জনতার ভিড়ে ছোটদিকেও একদিন দেখা গেল।

ডালিমজানের চরিত্রটি ছোট, তবুও আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়। অল্প কয়েকটি তুলির আঁচড়েই অমরেন্দ্র একটি অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

"এই দলিতা বঞ্চিতা মুসলিম নারীর মধ্যে রয়েছে কেমন একটা অনমনীয় দৃঢ়তা। শত লালসার সুযোগ থাকলেও ও রেখেছে নিজেকে একান্ত করে দূরে সরিয়ে। অন্নবস্ত্রের অভাব হলেও ও রয়েছে নিজের সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে বেঁচে। ও সাধু নয়, দেওয়ানাও নয়, তবুও পেীছে গেছে যেন জীবন তপস্যাব একটা কেমন সিদ্ধিব কোঠায়।"

কুসুম এখানে বিপ্লবেব অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। কবিব বিপ্লবের স্বপ্ন সফলের সার্থক প্রেবণাদাত্রী। পাখী ধর্ষিতা নির্যাতিতা নাবীব জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। আর জনার্দন চক্রবর্তীর মত কুচক্রী নারী মাংসলোভী মানুষ তো আজও আমাদেব সমাজে বর্তমান।

অমরেন্দ্রর অসাধারণ শিল্পী সংযম তাঁর শিল্প নির্মাণ কৌশলকে অনেকখানি ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। এ উপন্যাস থেকে কয়েকটা উদাহরণ দিলেই আমাদের অভিমতের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ক) "জয়ন্তী গোঁসাই মণ্ডপেব দুয়াব ঠেলে বের হলেন। গায় কোন শীত বস্ত্র নেই, শুধু দুধে গরদের আঁচল খানা। সুমুখে একটা আলো থাকা সত্ত্বেও কেউ তার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। বয়স হলেও যে এত চোখ ধাঁধান রূপ থাকে তার নিদর্শন জয়ন্তী। আতপ চাল, উপবাস, কঠোর ব্রহ্মচর্য—তাঁর বয়সের দুধকে ক্ষীরে পরিণত করেছে। জলীয় অংশ যেমন তাঁর শ্রীতে নেই, তেমনি নেই স্বভাবে।"

খ) 'পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে যেন চুঁয়িয়ে চুঁয়িয়ে পড়তে লাগল পুকুরের স্বচ্ছ জলে, পদ্মপাতার ওপর, ছোটদির মুখে ও চোখে। তার আর উঠতে ইচ্ছা করছে না জল ছেড়ে। মনের জ্বালার সংগে দেহের জ্বালার কি যেন একটা বিস্ময়কর সংহতি আছে। সেই জ্বালার জ্বলুনিই ঠাণ্ডা করতে চাইছেন আজ ছোটদি। নিষ্কাম জীবনের কামনা শুধু দাহ নির্বাণ।"

গ) "বড় পাখীটার খোপে প্রায় সেই মুহূর্তে পাখীও বুঝি অজ্ঞান হয়ে -

পড়ল। সে প্রতিরোধ করেছে যতদূর সম্ভব।" জনার্দন চক্রবর্তী কর্তৃক পার্শীকে ভোগের এই দৃশ্যটি অমরেন্দ্রর সংযমী শিল্পী মনের ছোট্ট তুলির টানে যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি অর্থবহ হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ প্রায় সর্বত্রই আছে তার প্রধান কারণ, অমরেন্দ্র নিজেই ব্যক্ত করেছেন। "উপন্যাসে সমগ্র সমাজের আদ্যোপান্ত কাঠামো আমি মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছি। এক ফোঁটা চোখের জলও। প্রেম এখানে গৌণ—বঞ্চনা এবং বৈষম্য হচ্ছে মুখ্য।"২৮

'কনকপুরের কবিতে যে জোটের মহলের সূচনা হয়েছিল, তারই পরিপূর্ণ রূপ হল 'জোটের মহল' উপন্যাসটি।

বেশিদিনের কথা নয়—ইংরেজ আমলে পূর্ববঙ্গের বিল অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহের কাহিনী। এ একখানা হাসি-কান্না, বিয়োগ-বেদনা, স্মৃতি ও বিস্মৃতি জড়ানো জেলে-জোলা কৈবর্ত-চাষী নমঃশূদ্রেব গ্রাম। শহর থেকে বহু-দূরে নদী-নালা বিল-ঝিল বিছিন্ন এই পল্লী। দুরন্ত এর অনেক-সভ্যতা এর অভিনব। জলবায়ু ও মৃত্তিকার সংমিশ্রণে শুধু কয়েকখানি লক্ষ্মীর পাঁচালী, মনসা মংগল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, সত্যপীরের পাঁচালী অথবা মানিকপীরের গান সম্বল করে গড়ে উঠেছে এই পল্লী সভ্যতা। গরীব গৃহস্থেরা কি ভাবে কেমন করে একে একে এসেই বিলাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে তা হয়ত অনেকেরই আজ স্মরণ নেই। কিন্তু বড সুখে কেটে যাচ্ছিল দিন। ঝিলেরজলে মাছে ধানে গৃহস্থের ঘর। হয়ত অভাব ছিল অনেকেরই কিন্তু তাদের মনটা অন্তত ভরা ছিল। আশা ছিল, ভরসা ছিল—ছিল আদান-প্রদানের প্রাচুর্য। কিছু মুসলমান কৃষাণও আছে—এসেছে এই বিলান জল ও জমির স্বার্থে। মিত্র হয়েছে হিন্দুর, তাই মমতা জন্মেছে প্রচুর। একই সংগে চাষ আবাদ করে, হাটে বন্দরে যায়, মাছ ধরে, বড় নদীতে তুফান এলে পাড়ি জমায়। ব্রাহ্মণের ছেলে দিবাকর জলেব খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গ্রামের সমস্ত প্রজাকে নিয়ে রাজা সাহেবেব বিরুদ্ধে জোটের মহল তৈরী করে। সমাজে দিবাকরের প্রভাব আছে। সে তার বিধবা বোন কনককে এক জেলের সংগে বিবাহ দেয়। মুক্তা এবং রাজা সাহেবের মেয়ে কুন্তলা দুজনেই দিবাকরকে ভালবাসে। রাজ রোষে পতিত দিবাকরকে ভালবাসার জন্য মুক্তাকে অনেক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। অপর দিকে কুন্তলার দিবাকরের প্রতি আকর্ষণ আদর্শের জন্য নয়, রূপের জন্য। তাবপর একদিন নতুন জীবনের ডাক পৌঁছয় শহর থেকে বহুদূরের সেই মানুষগুলির কানে। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে লড়াই বাঁধে খাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কনকপুরের কবিতে কবি বুকে যে সংগ্রামের শপথ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, 'জোটের মহলে' দিবাকর সেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। কনকপুরের কবিতে যা ছিল অস্পষ্ট, অসমাপ্ত জোটের মহলে তা স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ। তাই

জোটের মহল' কনকপুরের কবির পরিপূরক উপন্যাস বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইংরেজ শাসনের আমলে পূর্ববঙ্গের বিল অঞ্চলের প্রজা বিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা। কেন না,

"পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের পরাধীন দশার সূচনা। সেই সময় হইতেই বঙ্গদেশের কৃষক জনসাধারণের আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামেরও আরম্ভ। তাহার পর হইতে কৃষক জনসাধারণের সেই আপসহীন স্বাধীনতা-সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। সেই সংগ্রামে পরাজয় ছিল, কিন্তু আপস ছিল না। পরাধীন ভারতের কৃষক-জনসাধারণ তাহাদের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা ভারতের নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ সেই ইতিহাসকে স্বীকৃতি না দিলেও তাহাই শ্রমিক শ্রেনীর আবির্ভাবের পূর্ব সময় পর্যন্ত জনসাধারণের একমাত্র ইতিহাস এবং তাহাই ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসেরও মূলভিত্তি। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহগুলি প্রথমে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হইলেও তাহা ক্রমশ সংগঠিত ও সংঘবদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কোন কোনটি এমন কি সমগ্র দেশময় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইংরেজ শাসন প্রাচীন ভারতের গ্রাম-সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া কৃষকদিগকে বাহিরে আনিয়া তাহাদিগকে অভূতপূর্ব শোষণ-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত করিলে তাহারা প্রথমে দিশাহারা হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার পর অল্পকালের মধ্যেই আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসাবে তাহারা সংঘবদ্ধ ও সংগঠিতভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করে। প্রত্যেকটি বিদ্রোহই পূর্ববর্তী বিদ্রোহ হইতে অধিকতর সংগঠিত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং বিদ্রোহের অঞ্চলের অধিকতর বিস্তার ঘটিয়াছিল। প্রত্যেকটি বিদ্রোহই যেন উহার বহুমুখী অভিজ্ঞতা পরবর্তী বিদ্রোহের সংগ্রামী কৃষকের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছে।''২৯

সুতরাং ইতিহাসের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করেই অমরেন্দ্র এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। তা ছাড়া "পূর্ববঙ্গের যে সমাজ আজও বাংলা সাহিত্যে পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব পায় নাই, সেই সমাজের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের তাহার জীবন সংগ্রামের রূপটি আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণতা পাইয়াছে।''৩০ বাংলা সাহিত্যে অমরেন্দ্রর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও নির্মাণে। শরৎচন্দ্রের পর তারাশঙ্কর ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অন্ত্যজ শ্রেনী মানুষের কথা বললেও অমরেন্দ্র বোধহয় দুজনকেই অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে আরও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের কথা বলেছেন। তাই জনৈক সমালোচক বলেছেন।

"কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে কয়টি উপন্যাস বাংলায় রচিত হয়েছে সে গুলির মধ্যে 'জোটের মহল' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করবে।" ৩১

আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

"পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান পরিবেষ্টিত গ্রাম জীবন ও পরিবেশের সুস্পষ্ট চিত্র 'জোটের মহল'। ঘটনার মধ্যে একটি খাস মহল নিয়ে রাজার সংগে প্রজার বিরোধ, তার মধ্যে গ্রাম্য দলাদলি, বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রেম-ভালবাসা, সব কিছুই আশ্চর্যভাবে চিত্রিত হয়েছে।"৩২

বিষয়বস্তু নির্বাচন যে অমরেন্দ্রর একটি বড় কৃতিত্ব তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরও একটি বৃহৎ সাহিত্য পত্রের সমালোচনায়।

"প্রাক্-বিভাগ বঙ্গের পূর্ববঙ্গকে পটভূমিকা করে বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু রচনা পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু নদী মাতৃক পূর্ববঙ্গের যে দিকটার পরিচয় বহন করে আনছে অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য, সেটা নতুন এবং অভিনব। রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গ আজ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বাঙালীর মনের দিক দিয়ে পদ্মা-মেঘনা প্লাবিত পূর্ববঙ্গ কখনো হারিয়ে যাবার নয়। পূর্ববঙ্গের বেদে-জেলে প্রভৃতিদের বিচিত্র জীবনালেখ্যই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে দেখা দিচ্ছে।"৩৩

বিষয়বস্তুর পাশাপাশি চরিত্রসৃষ্টি ও ভাষাশৈলীও এ উপন্যাসের শিল্পগুণকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষ করে দিবাকর, মুক্তা এবং বনকের চরিত্র অমরেন্দ্রর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি বলা যেতে পারে।

দিবাকর এ উপন্যাসের শুধু কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়—সে প্রজা বিদ্রোহেরও নায়ক। অথচ এই দিবাকর তেমন লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। কিন্তু বুদ্ধি ছিল তার প্রখর-সাহস ছিল দুর্জয়। অথচ মনটা ছিল মাটির মত নরম—ঠিক বিলদেশের মাটির মতই। জাতিতে সে ছিল ব্রাহ্মণ। কি একটা সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তার বাবা জাতি ত্যাগ করেছিল। সেই থেকেই দিবাকর বিল অঞ্চলের জেলে, জোলা, কৈবর্ত, চাষী ও নমঃশূদ্র সমাজকেই নিজের সমাজ বলে গ্রহণ করে। পনের দিন হাজত খেটে আসার কারণ সবাই যখন জানতে চাইল, তখন দিবাকর জবাব দিল,

"মহাভারত আর রামায়ণের যুগ নাইরে ভাই, গুহক নাই, রাম নাই, না আছে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আর দাতা কর্ণ—তাই দিলাম একটু উস্‌কাইয়া, যেমন নেকড় পিদিমের পইলতা উস্‌কায়। আর কি! ঠার দাউ দাউ কইরা ওঠল—আইল পুলিশ, ধরল আমারে। খাইটা আইলাম করডা দিন হাজত।"

খাসমহলের রাজা দীনেশ সেন যখন জলকর বৃদ্ধির ঘোষণা করল, তখন দিবাকর জেগে উঠল। কিন্তু কি করে চুপ করে থাকবে দিবাকর? যার বাপু সামান্য সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবাদে জাতি ত্যাগ করেছে, তার ধমনীতে এতটুকু রক্ত থাকতে কি করে সইবে এ নিষ্ঠুরতা? এই খাজনা বৃদ্ধির কাছে সে কিছুতেই মাথা নোয়াতে পরামর্শ দিতে পারে না। "তাই জুলা মাঠে

সভা ডাকা হয়, যে সভায় দীনেশ সেনের কন্যা কুন্তলাও এসেছে—সেই সভায় দিবাকরের বজ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"শোনেন দেবী, আইছেন যখন অনুগ্রহ কইরা, শুইন্যা যান—আপনার পিতায় আমাগো নাম উঠাইছে পুলিশের খাতায়। আমরা নাকি চোর ডাকু এগেরদের শয়তান। উঠাউক নাম, ধরুক, মারুক দুঃখ নাই—কিন্তু বলন দিমু না খাজনা। কেন দিমু বলনা—আমাগো কি আর বাড়ছে ভদ্রাসন গাছ-গাছালির ফলের, না ফলন বাড়ছে জমির? নিলাম, নিলাম, কয়ডি নিলাম করাইবে - সর্বহারা দুঃখাদল মাড়াইলেও যে ক্ষণে ক্ষণে গড়াইবে। ও ভাইরা, তোমরা কি বলন দিবা - মাথা পাইত্যা লইবে বজ্রাঘাত।"

সংগে সংগে অস্বীকৃতির ধ্বনি ওঠে সহস্র কণ্ঠের—না, না, না। তারপর দিবাকর শুধু এ দেশের নয়—পৃথিবীর সমস্ত শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত কৃষক সমাজের পথ প্রদর্শক।

মুক্তা ভালবাসে দিবাকরকে। কিন্তু সেই নিরুচ্চার ভালবাসা বুকে করেই তাকে যেতে হয়েছে অন্যের ঘরে। কিন্তু মুক্তা তো করুণার পাত্রী নয়। সামান্যাও নয় অন্যের তুলনায়। সে দিবাকরের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্টা হয়নি-সে সত্যি সত্যিই তার এই নিতান্ত সাধারণ প্রতিবেশী দিবাকরকে মনে প্রাণেই ভালোবেসেছিল। গৌরব খ্যাতি পর্ব সে চায়নি, চেয়েছিল শুধু একটু খানি প্রেম—নিষ্কলংক কামনা। তার প্রশ্ন জেগেছে, যে যাকে চায়, সে তাকে কেন পাবে না? ভুলের বিয়ে কি ভোলা যায় না, মোছা যায় না অসত্য সিঁদুরের রক্তটিকা? লেখক বলেছেন—"ওর রূপ, রূপ নয়—জ্বলন্ত আগুন, পুরুষের পাখনা পোড়ায়-হরণ করে বিবেক বুদ্ধি সমস্ত শক্তি। ওর জীবনে দিবাকর না এসে ভালই করেছে।" এর পরেই আমরা যে মুক্তাকে দেখি—সে একেবারে বিদ্রোহিনী মূর্তিতে সকলের সংগে মিশে গেছে।

জেলের ছেলে জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে দিবাকরের বিধবা বোন কনক। চোখে তার রঙিন স্বপ্ন। ও মেয়ে মানুষ—জীবনের জন্য ও বুকে করে সামলে রাখবে ওর লায়িত ফেনায়িত উগ্র যৌবন। কিসের সমাজ, কিসের শাসন—ও কিছু মানবে না। তারপর বিদ্রোহিনী মুক্তার সাহায্যে কনক জীবনকে নিয়ে ঘর বাঁধে।

খাসমহলের রাজা দীনেশ সেনের কন্যা কুন্তলা। কলকাতা থেকে উচ্চ-শিক্ষিতা হয়ে গ্রামে এসেছে। কিন্তু আধুনিক সাজ সজ্জা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। দিবাকরের নেতৃত্বে জোটের মহলের মানুষদের প্রতি তার সহানুভূতি জাগে। স্বয়ং রাজা সাহেবের বিরুদ্ধাচারণ করে বললে—"এ সব অস্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক কাল ফুরিয়ে এসেছে।" মনে মনে সে দিবাকরের রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। গ্রামের জনসভায় কুন্তলা যোগ দেয়। উদ্দেশ্য দিবাকরের সংগে আলাপ করা। দিবাকরের বক্তৃতায় কুন্তলা,

মুগ্ধ হয় এবং দিবাকরের সংগে মিলিত হবার জন্য ছোটে। কিন্তু ফিরে আসে রাস্তার কাদা এবং তার পায়ে দামী জুতা আছে বলে। অমরেন্দ্রর এই বিদ্রূপ নির্মম, কিন্তু সার্থক।

আরও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের চরিত্র এ উপন্যাসে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে। এরা হল পূর্ববাঙলার নেয়ে মাঝি। সচরাচর তারা দলবদ্ধ হয়ে চলা চলতি করে। দেশে দেশে নাও রাখে। যতদিন এরা বিদেশে থাকে, ঘাটে প্রয়োজন মাফিক—দিনরাত্রির হিসেব নেই, ঘড়ির ঘণ্টা মেপে এরা দাঁড় মারে না। আর তা মারলেও এদের চলে না। কখনও গায়ের ওপর দিয়ে যায় পৌষের সুদীর্ঘ রাত্রির কনকনে হিম, কখন বা চৈত্রের চড়া রোদ্দুর। চামড়া এদের বার বার ঝলসে গেছে, প্রতিটি মুখে পড়েছে কঠিন জীবন সংগ্রামের কালির পোঁচ। প্রায় প্রত্যেকের চোখ দুটো রক্তবর্ণ, হাত পায়ে হাজা। তবু এরা তাজা, সজীব এদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। এরা জল ঝড়ের যোদ্ধা—বাঙলা দেশের বিলাঞ্চলের নেয়ে মাঝি। সারা জীবন এরা হয়ত নিয়ম মত পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। এদের স্ত্রী-পুত্র পায়না ঠিক মত পরণের কাপড়। দুর্বার রোগে চিকিৎসা হয় না সময় মত। তবু এরা বন্য ঝাড় জংগলের মত বাড়ে। সভ্যতা এদের পোষণ না করে বরঞ্চ শোষণ করে নানাভাবে। তবু আশ্চর্য, এরা মরে না—দিন দিন বাড়ে, গড়ে দরিদ্রের সংহতি। ওরা হয়ত সব সময় বুঝে-সুজে কিছু গড়ে না—ওদের হয়ে গড়ে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, মঙ্গলময় শুভ এক ভবিষ্যৎ। ভাষাশৈলী বিশেষ করে পূর্ববঙ্গীয় সংলাপ রচনায় অমরেন্দ্রর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য

'একটি সংগীতের জন্মকাহিনী' পূর্ব বাঙলার গ্রামীন পটভূমিতে রচিত একখানি চমৎকার রোমাণ্টিক উপন্যাস। বাঙলা দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ করে নাম ও পালা গায়কদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতই উপন্যাসখানির প্রাণকথা। রোমাণ্টিক বিন্যাস থাকলেও লেখক সহানুভূতির চোখে তাদের বাস্তব জীবনের যে ক্ষয়িষ্ণু দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একান্তই প্রশংসার যোগ্য। বৃন্দার সখের ঢপের দলে যে কয়টি চরিত্র ভিড় জমিয়েছে, তারা সকলেই বেশ জীবন্ত। গদাইয়ের প্রেমের নামে যে ত্যাগ ও উদারতা, তা একান্তই বৈষ্ণব সম্ভব। অমরেন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসের 'ট্র্যাডিশান' না রাখলেও এই উপন্যাসটিতে খাঁটি শিল্পী-সুলভ পরিবেশনের অভাব নেই। বৈষ্ণবভাব বাংলার জাতীয় জীবনের চিরকালীন ও কালজয়ী মর্মকথা। যে কোনও যুগেই হোক না কেন তাকে সাহিত্যে ধরে রাখার একটা আন্তরিক প্রেরণা বাঙালী মাত্রেরই আছে। সে দিক দিয়ে রোমান্স ও রিয়্যালিজমের সুন্দর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে 'একটি সংগীতের জন্মকাহিনী' বাংলা সাহিত্যে এক নতুন আস্বাদন। ভাষাও অনাড়ম্বর অথচ অত্যন্ত মধুর।

খ) উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম ॥

সাহিত্যে পুনরাবির্ভাবের পর থেকেই অমরেন্দ্র ঘোষের লেখক ধর্মের ভিতর একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পুনরাবির্ভাবের পর তিনি আরম্ভ করেছিলেন অনেকটা রোমান্টিক ভঙ্গি নিয়ে, যদিও সেই রোমান্টিক ভঙ্গির ভিতরেও তাঁর যুগানুগত্যের ছাপ রয়েছে। অমরেন্দ্র মূলত কবি। তাই রোমান্টিক প্রেম কাহিনীই তাঁর একেবারে প্রথম দিকের রচনাগুলির উপজীব্য হলেও তার ভিতর দিয়ে ধর্মাবস্থার সর্বস্তরের মানুষের জীবনকে বিস্ময়-শ্রদ্ধা-প্রীতির দৃষ্টিতে গ্রহণ করার প্রবণতা প্রথম থেকেই পরিস্ফুট। একে আমরা বলতে পারি অমরেন্দ্রর যুগ-চেতনা। সহরকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম চিত্রিত করার মধ্য দিয়ে তাঁর এই যুগ চেতনার বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' উপন্যাসে অমরেন্দ্রর এই বিশেষ যুগচেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

বঙ্গভঙ্গ এবং তৎপ্রসূত সাম্প্রদায়িক নরক লীলার পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত।

"ভাঙছে শুধু ভাঙছে। ভেঙে উজাড় হয়ে যাচ্ছে হাট, বাট, গঞ্জ, সহর, গ্রাম। পদ্মা কিম্বা মেঘনার ভাঙন নয়—পাহাড়ীঢল কখনও নেমে আসেনি এদেশে, দেখা যায় নি কখনও আগ্নেয়গিরির প্রলংকর গলিত লাভাস্রোত, দুর্দান্ত তুষার ঝঞ্জাও নয় হিমালয়ের, তবু বাঙলা ভাঙছে। টলমল করছে নাকি সমগ্র পাঞ্জাবও। পূর্ব বাঙলার সহরগুলো ভাঙতে ভাঙতেই, ভাঙন সুরু হল গ্রামে। ছড়িয়ে পড়ল মারাত্মক রোগের বীজানুর বিভীষিকা। জনসাধারণ চিরদিনই শান্তিকামী। চায় সুখে দুঃখে সমব্যথী হয়ে দিন কাটাতে। কিন্তু জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে যে ঃবিজ্ঞ ক'জন অসাধারণ রাজশক্তি অধিকার করে বসেছে, তারা চায় না হিন্দুর বিদ্যা বুদ্ধি মস্তিষ্ক এদেশে থাক, তাহলে আর পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল কি? শিক্ষিত সমাজটাই বিষাক্ত হয়েছে। তারা চায় ক্ষমতা অধিকার করতে। তাই নীরব থেকে প্রকারান্তরে অনুমোদন করছে নৃশংস বর্বরতা। ধর্মের নামে ভাগ করতে চাচ্ছে বাঙালীর ধর্ম। অথচ এই অত্যাচারিত অংশই একদিন অগ্রণী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে—লুঠ করেছিল ইংরেজের অস্ত্রাগার, ত্রাসে কেঁপে উঠেছিল সাগরপারের সিংহাসন।"

কুসুমপুর পূর্ববঙ্গের ছোট একখানি গ্রাম। পুরুষানুক্রমে এই গ্রামে হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি আত্মীয়ের মত বাস করে এসেছে, কিন্তু দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে ভ্রাতৃ-বিরোধের যে আগুন জ্বলল, কুসুমপুরের বুকেও তার ঢেউ এসে লাগল। কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশ—যার খ্যাতি

বহুপুরুষ ধরে ছড়িয়ে আছে সপ্তগ্রামে—সেই বংশের শশিশেখর দেশের এই দুর্দিনে সংঘবদ্ধ করবেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ নমঃশূদ্র মুচি চামারদের। কিন্তু ফণা বিস্তার করে উঠল মুসলিম কায়েমী স্বার্থ। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মুসলমানেরা প্রতিরোধে রুখে দাঁড়াল, কিন্তু পারল না হেরে গেল। শশিশেখরের কন্যা মাধবী এবং পুত্রবধূ ঊর্মিলাকে রক্ষা করতেই মুচির মেয়ে উর্বশী আত্মাহুতি দেয় জালাল আর তার দলবলের পাশবিক ক্ষুধার বলি হয়ে। সংখ্যালঘুদের ঘর জ্বলল, পুরুষেরা হল খুন। সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল, ঊর্মিলা ধর্ষিতা হল আর মাধবী ও তার বোন কুমারীর আত্মসম্মান বাঁচাতে আত্মহত্যা করল—সহৃদয় মুসলমান প্রতিবেশীর সহযোগিতায় অনেকে চলে এল হিন্দুস্থানে। উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এক নতুন অধ্যায় সুরু হল এখানে—হিন্দুস্থানে।

সমসাময়িক ঘটনাকে কথাসাহিত্যের উপজীব্য ও আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করার একটি বিপদ আছে এবং হুঁসিয়ার ও সুদক্ষ শিল্পী ভিন্ন সাময়িক ঘটনাকে কেউ-ই সর্বজনীন ও কাল নিরপেক্ষ করে তুলতে পারেন না। পার্টিশনের অব্যবহিত কাল পরেই পূর্ববঙ্গের যে মর্মন্তুদ ঘটনা, তার মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান যথেষ্টই ছিল এবং কোনো কোনো লেখক সেই উপাদান অবলম্বন করে ইতিপূর্বে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু সেই সব রচনার মধ্যে সাময়িকতা এতই স্পষ্ট যে, এরই মধ্যে সে গুলি বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। সুখের বিষয় আলোচ্য উপন্যাসটি বিবরণ না হয়ে যথার্থ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, লেখক নিজে এই ভাঙনের গ্রাসে কবলিত এবং এই কারণেই এই জাতীয় রচনায় একটা এক তরফা দৃষ্টির বিষাক্ত তীব্রতা রচনাকে তার উপন্যাস ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে উগ্র প্রচারধর্মী করে ফেলতে পারত। অথচ এখানে তা হয়নি বরং "সমস্ত বর্ণনার ভিতরে লেখক তাঁহার একটি দুর্লভ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। এই ভাঙন যে শুধু মাত্র ব্যক্তির ভাঙন নয়, পরিবারের ভাঙন নয়, দেশের ভাঙন নয়, ইহাতে যে মহাকালের একটি বিরাট ভাঙন যাত্রারই বিশিষ্টরূপ—এ কথার আভাস লেখকের লেখার ভিতরে ছড়াইয়া আছে।"৩৪ ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ও এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

"রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত ও দেশত্যাগের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও প্রীতি মধুর জীবনযাত্রা রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ সাই (প্রাণগঙ্গা) প্রমুখ পরিণত বয়স্ক লেখকদের রচনার উপজীব্য বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে।"৩৫

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে রমেশচন্দ্র সেনের কথা বলেছেন, তিনিও অমরেন্দ্রর মত বিস্মৃত সংগ্রামী লেখক। তিনি অমরেন্দ্রর মত গ্রাম বাঙলার

মানুষের সংগে একাত্ম হওয়ার সুযোগ না পেয়েও তাদের কথা বলতে পেরেছিলেন পরম সহানুভূতির সংগে। দুজনেই ছিলেন পূর্ববাংলার বরিশাল ও ফরিদপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ, সেখানকার ভূপ্রকৃতির সংগে তাঁদের গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু অমরেন্দ্রর অধিকাংশ কাল এই অঞ্চলে ব্যয়িত হলেও, রমেশচন্দ্রকে থাকতে হয়েছিল জীবনের অনেকটা সময় নগর কলকাতার রুক্ষ কঠিন ইটের প্রাচীরের আড়ালে। অথচ আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি ও সমবেদনা নিয়ে তিমি পূর্ব বাঙলার মানুষদের, তাদের জীবন সংগ্রামকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কুঁরপালা' উপন্যাসখানি। আঞ্চলিকতাবাদ উভয় লেখকের মধ্যেই এসেছে। অঞ্চল বিশেষের মানুষের সুখ দুঃখকে গভীরভাবে অনুভব করার তাগিদ থেকে, তাদের সংগে এক হয়ে যাওয়ার প্রেরণা থেকে। আঞ্চলিকতাবাদ কোন তত্ত্ব হিসেবে অনুপ্রবেশ করেনি এঁদের সাহিত্যে, যদিও দুজনের রচনাশৈলী সম্পূর্ন ভিন্ন ধর্মীয়। অবশ্য রমেশচন্দ্র রচনাশৈলীর দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে শরৎপন্থী—তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী। প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় সাধারণ ও প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি পাঠক হৃদয়ে প্রবেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু অমরেন্দ্র অন্য পথ অনুসরণ করেছেন রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে। গণসাহিত্যিক হিসেবে সেই ভিন্ন পথই তাঁর পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক।

রচনাশৈলীর দিক থেকে অমরেন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ভিন্ন ধর্মীয় হলেও নিসর্গ বা প্রকৃতি প্রেমিক হিসেবে দুজনের মধ্যে রয়েছে একটা নিকট আত্মীয়তা যাকে বলে দুজনে kindred souls প্রকৃতি ও মানুষ দুই-ই ছিল তাঁদের কাছে ভালবাসার সামগ্রী। তাই প্রকৃতি তাঁদের কাছে নিতান্ত পটভূমিকা হয়ে ওঠেনি —প্রকৃতির সংগে তাঁরা হয়েছেন একাত্মীভুত—প্রকৃতি তাঁদের কাছে নির্জীব বস্তু মাত্র নয়, প্রাণ চঞ্চল প্রবাহ—যা সামগ্রিকভাবে গ্রাম্য মানব সমাজের সংগে ওতঃপ্রোতভাবে প্লাবিত করেছে। উভয় সাহিত্যিকই জীবনকে শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভংগী নিয়ে দেখেন নি। দেখেছেন দরদী ও সংবেদনশীল মানসিকতা নিয়ে। রক্তমাংসের মানুষগুলির মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন মানবিক সত্ত্বা আর এই জন্যই তাঁদের রচনায় দলে দলে মানবিকতাবাদের স্পর্শ। সমকালীন একজন লেখকের সংগে তুলনায় অমরেন্দ্রর যুগচেতনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশলের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আমাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও অমরেন্দ্র অনেক ক্ষেত্রেই রমেশচন্দ্রকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছেন। আর এই যেতে পারাটাই অমরেন্দ্রর অসাধারণ শিল্পকীর্তির নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বাংলা সাহিত্যে।

'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'র কাহিনী অতি পরিচিত, প্রত্যক্ষ এবং গতানুগতিক। কিন্তু অমরেন্দ্রর দরদী লেখনীর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি নিজে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী, এই মর্মান্তিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয়

আছে—সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তবুও অতিরিক্ত আর যা আছে তা হচ্ছে ইতিহাস চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধ। মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বরূপ যেমন তিনি নিষ্করুণভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তেমনি সংগে সংগে দেখিয়েছেন সাধারণ মুসলমান কত মহৎ কত উদার। অমরেন্দ্র এ কথা স্পষ্ট করেই জানেন, মানুষের ভিতরে যে শয়তান বাস করে সে হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—সে বাঙালীও নয়, অবাঙালীও নয়—সে নিত্যকালের শয়তান। সমাজ জীবনে যখন থাকে স্বাস্থ্য-যখন থাকে সজীব সরল প্রাণপ্রবাহ ওখন তার কাছে এই শয়তান থাকে মাথা নত করে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতিকে উপলক্ষ্য করে কেউ যখন মানুষের ভিতরকার এই শয়তানটাকে উস্কিয়ে দেয় তখন সে তার বিষদন্তের দংশনে সমাজজীবন এবং রাষ্ট্র জীবনকে বিষাক্ত করে—দেখা যায় একটা সর্বগ্রাসী ভাঙন যার বিষময় পরিণতি অতিসুদূরপ্রসারী। রাষ্ট্রীয় কূটচক্র শুধু বাঙলার নয়—শুধু পাঞ্জাবের নয়—সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের সেই শয়তানটাকে উস্কিয়ে দিয়েছে—তারই ফলে দেখা দিয়েছে দিকে দিকে এই ভাঙন। উপন্যাসের মধ্যে এই বড় সত্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

চরিত্র চিত্রণ এ উপন্যাসের একটি বড় সম্পদ। কুসুমপুর গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশের শেষ পুরুষ—শশিশেখর। বয়সের ভারে, শারীরিক অক্ষমতা আর অসহনীয় দারিদ্রের জ্বালাতেও তিনি হারাননি মনুষ্যত্ববোধ এবং মনের শক্তি। তাই তিনি দেশের চরম দুর্দিনে কুসুমপুরের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-মুসলমান-নমঃশূদ্র মুচি-চামার—সকলকে সংঘবদ্ধ করতে চান। শশিশেখর সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেন—"মানুষের কারসাজি অতি লোভ ও লাভের জন্য পঙ্গু হয়েছে জীবনযাত্রা। কাপড় নেই, নুন নেই উগ্রমূল্য হয়েছে চাল ডাল। দুর্ভিক্ষে কৃষাণ-কৃষাণী মরেছে। ক্ষয়িষ্ণু একটা সমাজের হাড়ের পাঁজর গুঁড়িয়ে ভিত্তি গেঁথেছে বর্ধিষ্ণু আর একটা সমাজ ব্যসনের গগনস্পর্শী ইমারৎ। স্বাধীনতা এলো তবু এ ক্রন্দন হাহাকার ফুরাল না। কাঁদছে বাঙলা ও পাঞ্জাব।" কিন্তু শশিশেখরের এই প্রচেষ্টা পরাজিত হল পশুশক্তি মন্নসরিফ-জালাল প্রভৃতির নারকীয় আক্রমণের কাছে। শশিশেখর নিহত হলেন।

কুসুমপুরের এই ব্রাহ্মণ বংশের কুল মানের মর্যাদা বহুপুরুষ ধরে ছড়িয়ে আছে সপ্তগ্রামে। সেইবংশের মেয়ে মাধবী—চাঁপা, পুত্রবধূ ঊর্মিলা—জালাল আর মন্নসরিফের মত নরপশুর করাল গ্রাস থেকে তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এল মুচির বিধবা কন্যা উর্বশী। উর্বশী পরাণকে ভালবাসে। পরাণ তাকে বিয়েও করতে চায়। কিন্তু উর্বশীর একটাই শর্ত—তাকে বিয়ে করলে তার এই পৈতৃক ভিটেতেই তাকে থাকতে হবে। কেন না এ ভিটে ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না। ছোট একটি চিত্র—কিন্তু ত্যাগের আদর্শে উর্বশী আর সমস্ত চরিত্রকে অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। জালাল তার দলবল নিয়ে

যখন মাধবী এবং ঊর্মিলার দিকে লোলুপ থাবা বাড়াতে অগ্রসর হয়েছে, উর্বশীই তখন তার জীবন ও যৌবন দিয়ে তাদের রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করেছে। সে আত্মাহুতি দিয়েছে জালাল আর তার দলবলের পাশবিক ক্ষুধার বলি হয়ে।

"পরদিন উর্বশীর লাস পাওয়া যায় খালের চরে। এতদিন কেউ মাথা ঘামিয়ে চিন্তা করে দেখেনি—উর্বশী হিন্দু না মুসলমান। জেনেছে এবং ঘৃণা করেছে বেশ্যা বলেই। আজ তার মৃত্যুতে টনক নড়ল হিন্দু বাসিন্দাদের।"

উর্বশীর পাশাপাশি পরাণ চরিত্রও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরাণ দুশ্চরিত্র লম্পট। কিন্তু কেমন করে হল এই লম্পট যাদুকর আত্মভোলা বিশ্বপ্রেমিক? দুঃস্থ, অন্ধ, আতুর, বিসুচিকাগ্রস্ত রোগীর পরম প্রিয় ডাক্তার, নইলে এমন করে কেউ নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে না। পরাণ মুখে যাই বলুক কেউ এসে ডাক দিলে অসময় হিন্দু মুসলমানের বিচার করে না, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায়। সে প্রাণের টানেই যেন ছোটে। দিন নেই, রাত নেই, সকাল সন্ধ্যার বিরাম নেই, না আছে জল কাদার জন্য বিরক্তি—যেখানেই মানুষ জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বে অসহায়, হাবুডুবু খাচ্ছে ঝোড়ো নদীর উত্তাল তরঙ্গে সেখানেই খেয়ার নাও নিয়ে যেন পরাণ ডাক্তার হাজির। ও মানুষকে ভালবেসেছে বলেই যত মুমূর্ষুর বন্ধু। "এ দেশের শিশু, বৃদ্ধা, যুবা, জায়া, প্রৌঢ়া—যত দুর্বল মুমূর্ষু যেন ওর সন্তান সন্ততি। ও যেন জটায়ু, ওর পক্ষ পুটে অসংখ্য ভীরু রুগ্ন শাবক ঝড়ে জলে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের ফেলে ও যাবে কি করে।?" পরাণ উর্বশীকে ভালবাসে। লম্পট পরাণ মুখে যা বলে বলুক; প্রেমিক পরাণ মধুপাত্র নিয়ে তার কাছে আসে। মদ সে খায় বটে, মাতাল সে হয় বটে, কিন্তু এ মাদকতা কার জন্য? মুচির বিধবা মেয়ে উর্বশীকে এত শুদ্ধসূচী করে, স্নেহ প্রেমে কেউ তো কখনও গ্রহণ করেনি। পরাণের শঠতা সাধুতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। উর্বশীর আত্মাহুতির পর পরাণ গ্রামে এসে উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনই শোনে পন্ডিত মশাইয়ের পুত্রবধু ঊর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না—পরাণ তখন অসম্ভব বেপরোয়া ও সাহসিকতার সংগে ছোটে মন্নসরিফের বাড়ি। সেখানে মহৎপ্রাণা ফতেমা বিবির উদারতা ও মহত্বে ঊর্মিলাকে উদ্ধার করে কলকাতার পথে পাঠিয়ে দেয়। পরাণের এ আচরণ আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

নিজেদের আত্মসম্মান বাঁচাতে মাধবী ও চাঁপার আত্মহত্যা, পশুশক্তির বিরুদ্ধে কিশোর রকমানের অসাধারণ সংগ্রাম এবং মন্নসরিফের দ্বারা ধর্ষিতা ঊর্মিলার কলকাতায় আত্মহত্যা—তৎকালীন পশুশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধ জাগ্রত করে। সাম্প্রদায়িক পান্ডা পশু চরিত্র মন্নসরিফ-জালাল প্রভৃতির হীন চরিত্রও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসে কাছের সমাজের ছায়া পড়বেই। সেটা না ঘটাই তো অস্বাভাবিক কিন্তু নিকট দেশ কাল ভাবনার কথা তাতে যতোই প্রতিফলিত হোক, মানব-

সত্যের অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর, স্থায়িতর উপলব্ধি ব্যক্ত করার দিকেই কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের আগ্রহ দেখা যায়। অমরেন্দ্র সেই দলের লেখক এবং একথা শুধু যে উপন্যাস সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তা নয়। বোধহয়, কোনো কোনো গল্পকারের মধ্যেও এ সত্য সমান সত্য। অন্ততঃ অমরেন্দ্রর ক্ষেত্রে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, গল্প এবং উপন্যাস দুই বাহনের মধ্যদিয়েই গভীর এবং সুদূরব্যাপী মানব সত্যের কথা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। নিজের কালের খণ্ড সত্যটুকু কোনো ভাবেই উপেক্ষা করেননি তিনি। তবে বক্তব্যের দিক থেকে তাঁর যদি কিছু বিশিষ্টতা থাকে, তাহলে সেটা এই যে, তাঁর নিজের দেশকালে ব্যক্ত মানব-সত্যের ভবিষৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি অকুণ্ঠ ভাবে আশাবাদী। শুধু তাই নয়, সাহিত্যিক আজ আর শূন্যচারী স্বপ্নবিহঙ্গম হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিকব্রত গ্রহণ করবেন। এ দাবী যুগের; এ দাবী স্বাধীনতার। আলোচ্য উপন্যাসে অমরেন্দ্র সে দাবী এবং প্রত্যাশা পূরণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এমন কি, ভাঙছে শুধু ভাঙছে 'উপন্যাসে একটা অসাম্প্রদায়িক শুভ সমাজবোধ নিপীড়িত মানবতার প্রতি দরদ পাঠকের চিত্তকে শেষ পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ হতেই প্রেরণা দেয়। আর সেই কারণেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন, "তোমার এ বই একটা মহান কীর্তি। পূর্ববঙ্গের উরুভঙ্গের ইতিহাস। এ বই সাহিত্যে শাশ্বত হয়ে থাকবে।"৩৬

উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের আর একটি বলিষ্ট জীবন দলিল হল 'বে-আইনী জনতা' উপন্যাস। অমরেন্দ্র তাঁর নিজের জবানবন্দীতে এই উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের উল্লেখ করেছেন। উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসার পর অমরেন্দ্র যখন গভীর সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তখন এক শুভাকাঙ্খীর চেষ্টায় একটি চাকরীর আশায় এক মাড়োয়ারী ফার্মে আসেন। সেখানে চাকরী হবে কিনা জানার জন্য তাঁকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

"দেখলাম তেতলায় বসে, বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে একটা জীর্ন পরিত্যক্ত বাড়ির আঙিনায় 'বে-আইনী জনতা' প্রবেশ করছে। অন্ধখঞ্জ, জুতোপালিশ-ভিখারী-বেকার। আছে সুন্দরী যাযাবর, রয়েছে বলিষ্ঠ জোয়ান। শিল্পী আছে, গায়ক আছে, আছে রঙিন কিন্তু ছেঁড়া ঘাগরা পরা মধুয়ালী। এরা সব জড়িয়ে সমাজের একটা শক্তির উৎস। মাথা গোঁজার ঠাঁই চায়। তন্ন তন্ন করে আরো অনেক আস্তানা দেখলাম। একখানা উপন্যাসের কাঠামো খাড়া হল। আমি 'কসাই' নাম দিয়ে একটা ছোটগল্প লিখে নিজেকে প্রস্তুতি পথে নিয়ে এলাম। কিন্তু যাচাই করব কী দিয়ে? ……'কসাই' গল্পটা পড়লাম, মোহিতলাল শুনলেন স্থির গম্ভীর হয়ে। বললেন, এমন গল্প কী কেউ লেখে? ছিঃ ছিঃ। ধন্য হয়ে ফিরে এলাম। ঠিক করে নিলাম, মোহিতলালের তিরস্কার প্রগতিশীল চিন্তাধারার পুরস্কার।"৩৭

আবার অন্যত্র এই প্রসংগেই লিখেছেন, "কিন্তু মোহিতলাল হয়েছিলেন বে-আইনী জনতা' উপন্যাসখানা লেখার হেতু। তাঁর আঘাত ব্যতীত বোধহয় অত বক্তব্যে বলিষ্ঠ হত না রচনা।"৩৮

উপন্যাসের সুরুটি বড় চমৎকার, "ভোর হয়ে গেল·· কবরখানার মত কতকগুলো কুঁড়ে ঘর স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক জোড়া যাযাবর দোয়েল এসেছিল যেন কোথেকে-শিষ টানল নিকটের একটা গাছের মগডালে বসে। একটা মিশ্র জীবন কল্লোল শোনা গেল বস্তিতে—মানুষ, পশু ও পাখীর।" ইংরেজ আমলের রায় সাহেবের জমিতে বে-আইনী জনতা প্রবেশ করে দখল নিয়েছে। গড়ে তুলেছে এই বস্তি। এসেছে আমিরণ, মিস্ত্রী সাহেব, নন্দী, মধুওয়ালী, মেনকা, বাঁদী, কুলসম, বেওয়ারিশ ছেলে নিতাই ও গৌর আর আমিরণের মোরগ শের সাহেব—আরও অসংখ্য নরনারী। যারা জীবনে কোনও দিনই তাদের ন্যায়সঙ্গত বাঁচার অধিকার পায়নি, দুবেলা খুঁটে খাবার দুটি কদর্যতম দানাও পায়নি, শীতাতপে আত্মরক্ষা করার গাত্রাবাস পায়নি—কোনও রকমে মাথা গোঁজার মতও আশ্রয় আচ্ছাদন পায়নি, তারাই বাস করে রায়সাহেবের দখল করা জমিতে—ছেঁড়া চট, পিচবোর্ড, ভাঙা জং পড়া পরিত্যক্ত টিন, টুটা, ফুটা ত্রিপলের খন্ডাংশ বানানো, কবরখানার মত কুঁড়ে ঘর। আমিরণ কালোবাজারে কিছু-চাল বিক্রী করে দুচার পয়সা আয় করে। বেওয়ারিশ ছেলে গৌর-নিতাই নন্দী—এদের অন্ন জোগায়। নন্দীকে নিজের বাপের মতই দেখে। আবার তার আশ্রয়েই এসে জোটে বাঁদী কুলসম। তারপর রাতের অন্ধকারে ওদের বস্তিতে এসে পড়ে, ইট, কাঠ, পাথর। অন্য আস্তানার উদ্দেশ্যে চলে যায় ওরা। সঙ্গে যায় নন্দী, কুলসম, কুট্টি, সখিনা, অন্ধ আর খঞ্জ দম্পতি। আসন্ন প্রসবা যুঁই, বেওয়ারিশ ছেলে গৌর ও নিতাই। এদের এই লাঞ্ছিত জীবনের জন্য দায়ী মানুষের গড়া শ্রেণী-বৈষম্য। তাই সমাজের চোখে এরা বে-আইনী জনতা। শেষে এই বে-আইনী জনতাই সংগ্রামের দীপ্ত প্রত্যয়ে বারবণিতাদের বস্তিতে আমিরণ ও কুলসমের প্রাঙ্গনে এসে সমবেত হয়।

বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান লেখক ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি অমরেন্দ্রর এই উপন্যাস সম্পর্কে আমাকে একটি চিঠি লিখে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, বর্তমান আলোচনার সূত্রে তা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।

"বাস থেকে প্রায়ই নজর পড়ত আমার। মেডিকেল কলেজের একটু আগে, ইডেন হসপিট্যাল রোডের ঠিক মুখটায়, লোহার রেলিং দেয়া একটা চৌকোমত জায়গা পড়েছিল মুখ থুবড়ে। লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, সেখানে কি করে যেন একদল আশ্রয়হীন গর-ঠিকানার মানুষের আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল। ছেঁড়া চট, পীচবোর্ড আর ভাঙ্গা কেরোসিন টিনের আশ্চর্য

সমাহার। মাঝে মাঝে ভাবতাম, পিঁজরাপোলের মতো ঐ সব খুপরীর-তে সতেরো জাতের এক দঙ্গল মেয়ে মরদ কাচ্চাবাচ্চা যারা থাকে, তাদের জীবনযাত্রাটা বুঝি কতই না বিচিত্র ; ভাবতাম, সাহিত্যের আয়নায় এদের জীবনের ছবি আঁকতে পারেন এমন কেউ জীবন শিল্পী নেই, নেই কোন দরদী কলম ? চমক লাগালেন অমরেন্দ্র ঘোষ, কলমের বলিষ্ঠ রেখায় রেখায় তিনি উজ্জ্বল করে আঁকলেন এই সব হত দরিদ্র মানুষগুলোকে, সতেরো কালোচ্ছ্বাসকে যুক্ত করলেন সংঘশক্তির চেতন মোহনায়, উদ্বেলিত জনতার ঐক্যতানে মিশিয়ে দিলেন ছুটকো একদল স্ফুলিঙ্গ। দেশের এ প্রান্ত আর ও প্রান্ত থেকে এসে জোর দখলী ঠাঁই নিয়েছে, স্পর্ধিত ধনিক শ্রেষ্ঠীর জমিতে মৃত অগ্নিগিরির অভ্যন্তরে গলিত ক্রমোষ্ণ লাভার মতো। 'বে-আইনী জনতা' সেই ছন্নছাড়া জন থেকে ঐক্যবদ্ধ জনতার কাহিনী, এক থেকে একতার ইতিহাস।''৩৯

দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু জীবন যেমন সাহিত্যের বিষয়বস্তু তেমনি "দেশবিভাগ নামক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাটি উপন্যাস সাহিত্যের একদিক দিয়ে বড়ো উপকার করেছে। উদ্বাস্তু জীবন বাঙালিদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অভিনব নতুন এক মানুষের সৃষ্টি করেছে।''৪০ আলোচ্য উপন্যাসটি হল এই সম্পূর্ণ অভিনব নতুন মানুষের ছন্নছাড়া জীবনের 'এক থেকে একতার ইতিহাস'। একটি দৈনিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, "বে-আইনী জনতা'র কাহিনী বাস্তুহারা জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত এবং ইহার চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত, লেখকের সহানুভূতি ও কল্পনার মায়াবী আলোতে উজ্জ্বল।''৪১ আমরা উপন্যাসটির বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে আরও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের অভিমতের কথা এখানে উল্লেখ করবো। মূল আলোচনার ভাবনাসূত্রে তা অত্যন্ত মূল্যবান বলেই বিবেচিত হবে।

"শহর কলকাতার বস্তি জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাস। কিন্তু একটা তথাকথিত বস্তি সাহিত্য নয়, বা গল্পের বকলাস কোন থিয়োরীও প্রচার এখানে লেখক করেন নি। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার অক্টোপাশে আটক পড়া একদল সর্বহারা নর নারী শিশুর জীবন সংগ্রাম—নতুন জীবনে উত্তরণের আশাবাদী বলিষ্ঠ সংগ্রামই—এই উপন্যাসের মূলকথা।''৪২

কলকাতা সহরের একদিকে ইঁটের বনিয়াদ, ইঁটের অহমিকা, আর একদিকে ছেঁড়া চট, পিচবোর্ড, ভাঙ্গা জং পড়া পরিত্যক্ত টিন, টুটা ফুটা ত্রিপলের খন্ডাংশ বানানো, 'গোরস্থানের মত কুঁড়ে ঘর'। এবং ঐ সব ! বঞ্চিত, নিরাশ্রয়, পরিচয়হীন মানুষজনের আশ্রয়ের অন্বেষণই এ উপন্যানের ব্যাক বোন। এই অর্থে ঐ সব ছিন্নমূল মানুষের জীবনকাব্য বলা যেতে পারে। বিখ্যাত রুশ লেখক নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির অনুসরণে বলা যেতে পারে, সমাজের যারা বঞ্চিত, অবহেলিত, সব চেয়ে বেশি খেটেও যারা পায় না কিছুই সেই সব

সর্বহারাই হল এ যুগের বল, এ যুগের সবচেয়ে বড় রূপান্তর কামী শক্তি। এদের নিয়ে সাহিত্য করা যে কোন লেখকের পক্ষেই খুবই সম্মানের ব্যাপার। এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে অমরেন্দ্র সেই দুর্লভ সম্মানে নিজেকে সম্মানিত করেছেন।

এই জীবন কাব্যের মুখ্য চরিত্র আমিরণ। তাকে ঘিরেই আরো অসংখ্য চরিত্র এসে হাজির হয়। আমিরণ আর পাঁচজনের থেকে পৃথক নয়, তবু যেন তাদের চেয়ে অনেক বেশী সম্পূর্ণ। আমিরণ এক কৃষকের মেয়ে। বয়স তার বড় জোর ত্রিশ কি বত্রিশ। কিন্তু সে এই বয়সে কত কি দেখল। বন্যা, মহামারী, দাঙ্গা। এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সঙ্গে ওর সাদী হয়েছিল সাত বছরে পা দিয়ে। আমিরণের স্পষ্ট মনে আছে, বরপক্ষ কবুল করল সকলের সমক্ষে যে, আজ থেকে আমিরণের খোরাক ; পোষাক ও আব্রুর ভার নিল তারা ধর্ম সাক্ষী করে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর পরে তার ঘরে এল এক নতুন সতীন আর তার পরামর্শেই আমিরণের ওপর চলে অকথ্য নির্যাতন— বাধ্য হয়ে সে ঘর ছাড়ে। আজ যে আমিরণকে অমরেন্দ্র আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন—তা হোল, অভাবের চাবুকে ক্ষত বিক্ষত হয়েও যে কোনো নারীর মতই কোমল হৃদয়, পুরুষের লোভের শিকার হয়েও লেলিহ যার মর্যাদাবোধ, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী না হয়েও শোষণ বঞ্চনা অন্যায় অবিচারের হেতু পরম্পরা প্রসঙ্গে যে কিনা রীতিমত হুঁশিয়ার, নিজের জীবনে তুচ্ছতম নিরাপত্তা সত্ত্বেও যে নিজে আর পাঁচজনের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা হয়ে অন্য সকলের সুখ দুঃখের প্রতি স্বভাবতই স্পর্শকাতর—তেমন একটি চরিত্র এ জীবন কাব্যের নায়িকা হতে পেরেছে—এর কৃতিত্ব আমিরণ এবং লেখক সমভাবেই দাবী করতে পারে। কালো বাজারে সামান্য কিছু চাল বিক্রী করে দু চার পয়সা আয় করে আমিরণ। "এই দানবীর সভ্যতা আমিরণের সমস্ত কেড়ে, নিংড়ে, চুষে নিয়েছে, তবু তার মর্মকোষে যেটুকু মাতৃত্বের মধু লুক্কায়িত আছে তার টানেই নিজের ভাতের সঙ্গে হয় বা কখন যেন বেওয়ারিশ ছেলে দুটো এবং নন্দীর জন্যও দুমুঠো চাল ধরে নেয়।"

নন্দী মারা গেছে, তার মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। আমিরণের সঞ্চয় দিয়ে সংকুলান হয় না। একটু সাজসজ্জা বদলে বেরিয়ে যায় আমিরণ। কয়েক ঘণ্টা বাদে ফিরে আসে। "চোখ জোড়া একটু বসে গেছে, শাড়ীখানা একটু শিথিল হয়েছে—সারামুখে একটা পরিশ্রমের ছাপ।" সৎকারের টাকা হিন্দু বাসিন্দাদের হাতে তুলে দিয়ে বলে, "হুঁশিয়ার যেন অযত্তন না হয় নন্দীর। ও আমার আইবুড়ো বাপ।" আমিরণের চরিত্রের এই দিকটি প্রসংগে কবি শতদ্রু চাকী বলেছেন,

"বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও আছে কি অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত অনাত্মীয় কোন মানুষের প্রতি এমনিতরো আত্মলোপী কোনো হৃদয়াবেগের দৃষ্টান্ত?

যা আমাদের মর্মই ভেদ করে না শুধু গলার কাছে ও ঠেলে আনে অমনি কোন ধরা ধরা ভাব। অথচ এক চুলের জন্যেও অবিশ্বাস্য মনে হয় না তা, চরিত্রের ভারসাম্যটিও নষ্ট হয় না এতটুকুর জন্য। একটু বাদেই কুলসম বলে যা হোক কিছু মুখে দিয়ে নিতে। জবাব দেয় আমিরণ—না। তোরা গিয়ে খা। আমার কেমন গা বমি করছে।"

দুর্যোগের পর দুর্যোগ এসে ঝাপটা মেরেছে আমিরণকে। সেজানে—"খোদা পয়দা করেনি এ দুনিয়া। মানুষই যেন করেছে মানুষের সর্বনাশ—বাইরে পীর পয়গম্বর, ভিতরে শয়তান।"

অথচ গভীর রাতে শুয়ে শুয়ে মনে পড়ে ঐক্যবদ্ধ ঐ সব দুঃখী মানুষের কথা। "ভাঙতে ভাঙতে আমিরণ যেখানেই এসে দাঁড়াক সমাজ তার গায় মতই পংক নিক্ষেপ করুক, আসলে সে এক মাটির ঘরের মেয়ে তো? মরমী দরদী মন তার শত উপবাসের আঁচেও দগ্ধে পুড়ে যায় নি।"

এই আমিরণকে ঘিরেই আরও একাধিক মুখ—কুলসম, কুটি, সখিনা, অন্ধ আর খঞ্জ দম্পতি, আসন্ন প্রসবা যুঁই, বেওয়ারিশ ছেলে দুটি গৌর নিতাই, কড়া ইস্পাতের মত ধারাল মীর্জা, বন্ধনহীন অথচ স্নেহের কাঙাল নন্দী এবং এমনি আরো অনেকেই। এইসব মানুষের হাহাকার এবং অন্নাভাবের কথা বলতে গিয়ে অমরেন্দ্র বলেছেন, "অন্নাভাবও তো একটা সংগীত, কিন্তু সে গান গাইতে হবে দীপক রাগিণীতে তানসেনের মত আগুণ জ্বালিয়ে দিতে হবে লেলিহান শিখায়। তখন তানসেন একা সেগান গেয়েছিল, তাতেই যে কাণ্ড হয়েছিল তা আজ ও স্মরণ আছে সকলের মনের কোণায়। কিন্তু ওরা যদি আজ সেই দীপক রাগিণী গাইতে পারে সমবেত কণ্ঠে তবে নির্ঘাত হবে প্রলয়কাণ্ড।" আমিরণের চারদিকে যারা বৃত্তাকারে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই একটি করে অতীত আছে। আত্মরক্ষার তাগিদেই যেন তারা বিদ্রোহ করে। বাঁদী কুলসমের শরীরের কোন মারাত্মক স্থানে লংকার গোলা ঢেলে দেওয়া হবে মনিবানীর আদেশে। কুলসম নির্দোষ—তাই হঠাৎ মরীয়া হয়ে সেই লংকাগোলাটুকু মনিবানীর চোখে মুখে ছুঁড়ে মেরে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচে কোনমতে। বন্ধনহীন স্নেহের কাঙাল নন্দী শিল্পী, গুণী কারিগরও বটে। কিন্তু কিছুতেই গাঁয়ে থাকতে পারে না। অভাব অনটনে তার শরীরের হাল এমনই হয়েছে যে, গাঁয়ে গেলেই রোগে পড়ে। ছুটে আসে শহরে, নাম লেখায় বেআইনী জনতার ভিড়ে। সে মনের সমস্ত অনুরাগ মিশিয়ে একটা তারের যন্ত্র তৈরী করে। একদল সেটি কিনে নেয়, কিন্তু বলে সেক্রেটারি এসে দাম দেবে। একটা প্রাপ্তির আশায় যখন নন্দী উদ্বেল হয়ে ওঠে—হঠাৎ একদিন আমিরণের ডেরায় আসেন সেক্রেটারীবাবু। তারের যন্ত্রের সব কটি তার ছিঁড়ে গেছে। তার হুকুম ছাড়াই এটা রাখা হয়েছিল। সেইচ্ছা করলে যন্ত্রটা রেখে দিতে পারে, ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ দশ টাকা তাকে

দেওয়া হবে। রুখে ওঠে নন্দী। একবার যে জিনিষ বিক্রি হয়ে গেছে বলে জানে, তা আর ফেরত নেবে না কিছুতেই। সেক্রেটারীর মুখের ওপরেই ভেঙ্গে ফেলে যন্ত্রটা এবং সেই রাতেই মারা যায় নন্দী।

আর এক বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি মীর্জা। সুদূর সঞ্চারী লোক-জীবনের মাটি কাদা ছেনে তৈরী ক্ষ্যাপা ভোলানাথের সংগে তুলনীয় "মূর্তিমান ঝঞ্ঝার" মতই একটি চরিত্র। অতীতের দেহাতী কিষাণ, রুগ্ন, শীর্ণ দীর্ঘদেহী একটি মানুষ।" অন্তর থেকেই সে যেন ঘৃণা করে এই মুখোস পরা দুনিয়াটাকে। তাই হয়ত থুথু ফেলে বারম্বার।" অনির্দিষ্ট বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে এই যে একপাল মনুষ শহরের সর্বত্র পথচারী কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়, আজ এখানে কাল ওখানে করে, মীর্জাকে দেখলে মনে হয় যেন সে তাদের পিতামহ। সে ডেরা বাঁধতে জানে না, ভিক্ষা করতে পারে না। ক্ষুধায় ও সাধারণ মানুষের মত সে পাগল হয় না। অদ্ভূত তার চাল চলন। সময় সময় তাকেউন্মাদ বলেই ভ্রম হয়। বিপুল অভিজ্ঞতার আগুণে সেঁকা উদ্যত চাবুকের মতই একটি আগ্নেয় ব্যক্তিত্ব। রক্ত নিংড়ানো এই শঠচক্রী সভ্যতা। তারই বিরুদ্ধে মীর্জার যুদ্ধ। অনমনীয় মনোবল নিয়ে অভাবনীয় পশুবলের মুখোমুখি হওয়া— এই তার জীবনবেদ।

ক্রমশ ঘটনা ধাবিত হয় সংঘর্ষের দিকে। রায় সাহেবরা জোট বাঁধে। পুরনো আস্তানা থেকে ওরা যাত্রা করে নতুন আস্তানার দিকে। নেতৃত্ব দেয় ছাঁটাই হওয়া কলের বুড়ো মিস্ত্রী। অমরেন্দ্র বলেছেন,

"এ পরাজিত সৈনিকের ঘাঁটি ত্যাগ নয়। বিশেষ আবহাওয়ায় দুর্যোগে মাত্র বিশেষ ব্যবস্থা। এই ময়দানেই যে সমগ্র জনতার আজ জয়-পরাজয় একেবারে কৃত নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তা তো নয়। আরও আছে বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাই দূরদর্শী নেতা বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রতিটি সৈনিকের মূল্যবান প্রাণ।" তারপর বারবিলাসিনীদের বস্তিতে আমিরণ ও কুলসমের ডেরায় এসে জড় হয়— কুট্টি, মীর্জা, ও বেওয়ারিশ ছেলে দুটির মত পরীক্ষিত যোদ্ধার দল। অমরেন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন, "পাঁকের পথে এদের জীবন বৈচিত্র্য ফোটাতে চাইনি, পূর্ণ আশাবাদের পথে আমার গতি। আমি জানি এই প্রগতি। জনসাধারণ হচ্ছে চিরন্তর মার্গ সঙ্গীত। বাকি যা কিছু গজল ঠুংরি।"৪৩

এই বিষয়বস্তু, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদির জন্য অমরেন্দ্রর বে-আইনী জনতার জন্য কেউ কেউ বিরূপ সমালোচনাও করে থাকেন, কিংবা তাকে নস্যাৎ করে দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্রের কথা,

"পূর্বের মত রাজারাজড়া জমিদারের দুঃখ-দৈন্য দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের

দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।"৪৪

আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে অমরেন্দ্র সেই গুরুকৃত্য পালনের সাহসিক প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেই কারণেই তাঁর 'বে-আইনী জনতা' বাংলা সাহিত্যে শোষণ ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠ দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

অমরেন্দ্রর এ পর্যায়ের শেষের দিকের উপন্যাসগুলি 'মন্থন', 'অহল্যাকন্যা', 'ঠিকানাবদল' ও 'রোদনভরা এ বসন্ত'তে শিল্প সৃষ্টির সমুদ্র সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা হতে পারে নি। এর কারণ সম্ভবত দুটিঃ এক, অমরেন্দ্রর সময়ের অভাব। দুই, সময়ের অভাবের প্রত্যক্ষ কারণ তাঁর দারিদ্র। দারিদ্র এবং সংসারের প্রয়োজনের জন্য কখনই তিনি উপন্যাসগুলি ধীরে সুস্থে সম্পূর্ণ করে প্রকাশকের হাতে দিতে পারেন নি। তবুও উপন্যাসগুলি তাঁর জীবন সাধনা এবং যুগচেতনার সম্যক পরিচয় বহন করে।

'মন্থন' উপন্যাসের বিষয়বস্তু সহরকেন্দ্রিক উদ্বাস্তু ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম। অমরেন্দ্র চেয়েছিলেন, "এই স্বাধীনতায় হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ পেল কী" ৪৫ তাকে এখানে চিত্রিত করবেন। চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের জন্য মাত্র এক মাস দশ দিনে উপন্যাসটি তাঁকে শেষ করতে হয়েছিল ফলে অসম্পূর্ণ থাকাটাই স্বাভাবিক। অর্থের তাগিদে সেই পাণ্ডুলিপিই প্রকাশকের কাছে সমর্পণ করতে হয়েছে।

দেশ ভাগাভাগি করে স্বাধীনতা পেয়ে কতটুকু সুখ শান্তি, নিরাপত্তা পেয়েছে সাধারণ মানুষ, আলোচ্য উপন্যাসে সে গল্প অতি সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দরদ দিয়ে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেকার জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রভাব কারখানার হেড মিস্ত্রীর মনে কি ভাবে কাজ করেছে তা লক্ষ্য করার মত। ছোটসাহেবের কারখানার শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাসের জন্য আন্দোলন করেছে। মন্মথ দেখেছে অর্থের অভিজাত্য কিভাবে ছোট সাহেবের মত নারী-মাংস-লোভী মুখোস পরে ভদ্রলোক সেজে থাকে, মল্লিকা, সন্ধ্যা ও মৃদুলার মত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু যুবতী ছোট সাহেবের পাশবিক ভোগের শিকারে পরিণত হয়ে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যায়। তাই উপন্যাসের শেষে মন্মথ বলেঃ "এ স্বাধীনতা নয়, এ একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি।" মন্মথর শেষ কথার মধ্যেই যেন অমরেন্দ্রর জীবন সাধনা ও যুগ চেতনার পরিচয় বহন করে আনে আমাদের সামনে।

বিষয়বস্তু ও বক্তব্যে উপন্যাসটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। প্রাক, স্বাধীনতা যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে মন্মথ বলেছে "কংগ্রেস বলছে আমরা স্বাধীন হলে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে চালাবার ক্ষমতা পাব। এই ভারত জোড়া দুঃখী

ভাই বোনেদের অভাব ঘুচবে…ঘুচবে যত দুঃখ দৈন্য।'' কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মন্মথ বলেছে, "এ স্বাধীনতা নয়, এ একটা বিরাধ ধাপ্পাবাজি।'' এটাই হোল স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি—লেখক নিজেই এই ট্র্যাজেডির করুণ শিকার।

সংগ্রামী, দরিদ্র, উপেক্ষিত, বঞ্চিত ও শোষিত জনতার চরিত্র চিত্রনে অমরেন্দ্রর মত দক্ষ শিল্পী দুর্লভ। মন্মথ, যতীন, আব্বাস, নসাইর মা, মল্লিকা, সন্ধ্যা, মৃদুলা, অবনী প্রভৃতির চরিত্র চিত্রণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। অল্প তুলির আঁচড়েই তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন এমন এমন চরিত্র, – যা আগামী দিনের সংগ্রামী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা জোগাবে। প্রধান চরিত্র মন্মথ ধূর্ত নয়, ধাঁড়িবাজ নয়, সরল সাধারণ মানুষ। এই রকম একটি মানুষের ছোট বুকে জমেছে এ দেশের যত দুঃখী মানুষের জন্য সমবেদনা। মল্লিকা, সন্ধ্যা, মৃদুলা—ছোট সাহেবের পাশবিক লোভের শিকার হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। তবু তারাও সমবেত হয়েছে প্রতিবাদের মিছিলে।

'ঠিকানা বদল' উপন্যাসে অমরেন্দ্র উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের এক দরদ ভরা চিত্র এঁকেছেন। তার ফলে কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি মর্মগ্রাহীও হয়েছে। নানান সংঘাতের মধ্য দিয়ে অসুস্থ পঙ্গুপ্রায় স্বামীকে রেখে গ্রাম ছেড়ে সর্বশ্রান্ত অবস্থায় ঝকঝকে কলকাতায় অহল্যা নামে একটি মেয়ের পদার্পণে কাহিনীর সুরু কিন্তু সহর কলকাতায় রূপের জৌলুষ থাকলে সর্বশ্রান্ত তাকে বলবে কে? বরং সে সম্পদ রক্ষণের দায় কম দুর্বহ নয়। কিন্তু রূপ বিকোতে অহল্যা আসেনি, শেখেওনি। বিভিন্ন অবস্থা বৈচিত্র্য, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন মনোজটিলতায় এই অহল্যার মত মেয়েটির দৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাহিনীর গতি। এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই পাঁচ মিশালী এক বস্তি ব্যারাকের যে সব চরিত্র সমাবেশ লেখক ঘটিয়েছেন—তা মনকে ভরিয়ে তোলে। অহল্যাই মূল চরিত্র -তাকে ঘিরেই ফুলদি, মিঃ ডাস ও পুষ্পি—আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। অহল্যার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সত্যবন্ধুর জীবন পরিক্রমা এবং পরিণতির মুখে তার অন্তর সৌন্দর্য অনবদ্য। 'অহল্যাকন্যা' ও 'রোদন ভরা এ বসন্ত'-এ মধ্যবিত্তের সংগ্রাম চিত্রিত হলেও এ ধরণের রোমান্টিক আবেগ উপন্যাস দুটির বক্তব্যকে বড্ড বেশি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে!

শেষ পর্বের চারটি উপন্যাস—'মন্থন', 'অহল্যা কন্যা', 'ঠিকানা বদল' ও 'রোদন ভরা এ বসন্ত'তে কিছু কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকার কারণ ব্যাখ্যা প্রসংগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন,

"রুশ লেখক দস্তয়ভস্কির মতোই চিন্তা করার সময় পেলেন না, পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সুযোগ মিলল না, নিরবচ্ছিন্ন অভাবের যন্ত্রণা অপূর্ব সম্ভাবনাদীপ্ত উপন্যাসগুলোকে অর্ধবিকশিত অবস্থায় খণ্ডিত করে দিল। তাঁর অপূর্ণতার অপরাধ আমাদেরই। তবুও হয়তো তাঁর উপায় ছিল। যৌন-প্রবৃত্তিকে

সুড়-সুড়ি দিয়ে, ডিটেক্‌টিভ মার্কা সিচুয়েসন তৈরী করে। বস্তু বৈচিত্রের চমকে তিনি বেস্ট সেলারদের দলে মিশতে পারতেন। সাহিত্য না-ই হোক, অন্নচিন্তা তাঁর থাকত না। কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষের তাতে প্রবৃত্তি ছিল না। জীবননিষ্ঠ জাত-সাহিত্যিকের দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্বক্ষণ তিনি পালন করে গেছেন। পরাভূত হয়েছেন, কিন্তু সে পরাভব মহত্বে সমুজ্জ্বল।"৪৬

শেষ পর্বের উপন্যাসগুলিতে অপূর্ণতা থাকলেও সামগ্রিক ভাবে এই পর্বের উপন্যাসে অমরেন্দ্রর কীর্তি অনস্বীকার্য। "মধ্যবিত্তের পরিচিত জগৎ ও জীবনের সীমানা ছাড়ানো দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আত্মীয়তার ভাব তারাশংকর, মাণিকের রচনায় আছে। তাকে আরও দূর দূর দেশে নিয়ে গেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ।"৪৭

(গ) স্যাটায়ার ধর্মী

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে 'স্যাটায়ার' বা বিদ্রূপ সাহিত্য বিরল। দীনবন্ধু মিত্র থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার পর্যন্ত হাস্যমুখরিত তীক্ষ্ন সমাজ বিদ্রূপের যে বলিষ্ঠ ধারাটি প্রায় একশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা ইদানীংকালে শোচনীয়ভাবে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কমিউনিষ্ট বিদ্বেষকে উপজীব্য করে কেউ কেউ এখনও এ চেষ্টা করে থাকেন বটে, কিন্তু মূলত বিষয়বস্তুর জন্যই রচনা এত দুর্বল হয় যে রচয়িতার জন্য করুণা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অমরেন্দ্রর 'কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু' উপন্যাসখানি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

বাংলাদেশে পুস্তক প্রকাশনার নেপথ্য জগতই এই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। এখানে প্রকাশক, লেখক ও সাহিত্যবাজারের টাউটদের চরিত্র, চলন বলন ও কাজ-কারবারের যে ছবি অমরেন্দ্র এঁকেছেন তা 'স্যাটায়ারের' অপরিহার্য দাবিতে অতিরঞ্জন হলেও, সত্য ও বাস্তব। দীন দরিদ্র লেখকের বহু বিড়ম্বিত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এই 'স্যাটায়ারের' জন্ম হয়েছে। মুনাফার লোভে সংস্কৃতির সূতিকাগারে বসে প্রতিদিন যারা নবজাতকদের বিকলাঙ্গ করে দিচ্ছে, কলকাঠি করায়ত্ত থাকায় সহজেই কাঁচকে হীরে ও হীরেকে কাঁচ করে দিচ্ছে, তাঁর ভাষায় ও তীক্ষ্ন তির্যক ভঙ্গীতে তাদের কাহিনীই লেখক আমাদের শুনিয়েছেণ। মূল কাহিনীকে পুষ্ট করায় জন্য পারিপার্শ্বিক কিছু চরিত্র ও ঘটনাও অমরেন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এবং স্যাটায়ারের তীব্রতা সেখানেও কম নয়। প্রবঞ্চিত, পঙ্গু সমাজের প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের অক্ষমতা ও কপটতার ছবি হিসাবে এই স্যাট্যায়ার ধর্মী উপন্যাসখানি নিশ্চয়ই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

"অমরেন্দ্র ঘোষের সাহিত্য ধারার আর একটি প্রকাশ হোল তাঁর ব্যঙ্গ রচনায়। লেখক নিজে যে ব্যাপারের ব্যাপারী, সেই লেখা জোখার কারবারের আড়ালের কাহিনী, 'কলেজ ষ্ট্রীটের অশ্রু'তে উগ্র স্যাটায়ার হয়ে উঠেছে। বাঁকা কথায় এখানেও তিনি আর এক শ্রেণীর শ্রমিক—কথার কমল ফলিয়ে যারা জীবন কাটায় সেই সাহিত্যিক শ্রমিকদের জীবনের ট্র্যাজেডীর ওপর আলোকপাতও করেছেন।"৪৮

(ঘ) সাংকেতিক উপন্যাস

যে যুগচেতনা অমরেন্দ্রর জীবন সাধনার বিশেষ রূপের অধিকারী হয়ে চলেছিল, তাঁর সাহিত্য একেবারে অন্তিম পর্বে .তার রীতিতে আরও অন্তর্মু-খীনতা আরও গভীরতার রঙ লেগেছে। তাঁর এই পর্বের উপন্যাস 'নাগিনী মুদ্রায়, এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। শুধুমাত্র মাটির কাছাকাছি মানুষের সুখ-দুঃখের ছবিতে তিনি আরোপ করেছেন সংকেতের মুদ্রা। এঁকেছেন মানুষের অন্তর্লোকের গূঢ় ভাবনা, কামনা প্রজ্ঞার প্রতীক। 'নাগিনী মুদ্রা' তাই নিছক উপন্যাস নয়—সাংকেতিক উপন্যাস।

"বিশ্বনাথ একজন সরকারে চাকুরে। শীতের এক ছুটিতে নেমেছিলেন প্রায় হাজার দেড়েক ফিট নীচে পাহাড়ের শৃংগ থেকে সমুদ্রের স্বাদ পেতে। দেখলেন একটা মরা হাঙর। এই দিগন্ত বিস্তারী থৈ থৈ নীলার পটভূমিতে একটা বে-পরোয়া অসংযম। শিকারের পিছনে ধাওয়া করে কোথায় এসে উঠেছে।......হাঙরটার চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথের যেন মনে হয় জন্তুটা বুঝি মরেনি। ......ওর দৈহিক মৃত্যু নিশ্চয় আত্মিক মৃত্যু নয়।"

এ নিছক একটা মরা হাঙরের গল্প নয়। মানুষের অদম্য কামনার পরিণতির রূপ। কালনাগিনী মতি বাঈয়ের কুহক মায়ার টানে বিলাস ব-দ্বীপ থেকে পর্বতের শীর্ষে উঠল, প্রজ্ঞার কাছাকাছি এসেও পাহাড়ের ধ্বসের সংগে নেমে গেল রসাতলে। এই মতিবাঈ হল মরুভূমির দেশের মেয়ে। "বয়স হলেও চোখের তারায় এখনো আগুন। শিথিল হলেও এখনো আংরাখার শক্ত বাঁধনে উঁচু বুক। নাচতে নাচতে ছোবল মারে। গাইতে গাইতে বিষ ঢালে। খেমটা তার পেশা নয়, মোহিনী ফণা। পায় মরুভূমির দাবদগ্ধ জ্বালা। এবার জুড়াতে এসেছে বিলাসের নয়া পত্তনে। পায়ে ঘুঙুর, তার হাতে নাগিনী মুদ্রা।" আর বিলাসের পরিচয় হল "বাঘের চোখে যেমন একটা আমেজ আছে, তেমনি রয়েছে বিলাসের। ওঁর দৃষ্টিপথে পড়লে কেউ আত্মসমর্পণ না করে রেহাই নেই। বিলাস অনেকের শ্রেষ্ঠ পরিশ্রম ভাঙিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ করেছেন। মতিকে নাচাতেই হবে। মতির গরব ভাঙা বিলাসের পরম দায়িত্ব।"

"বিলাস যেন একটা বল্লমের খোঁচা খেলেন। কিন্তু তিনি কামনার পিঞ্জরে আবদ্ধ।

পাঁক চন্দন হয় কি করে বাঈ?

সরাবে ধুয়ে ধুয়ে।

তা তো ধরেছি কানুর খাতিরে।

সব সোনা ভরিয়ে দাও, আমাকে নাচাও, তবে তো খুশবু খুলবে। বড় কষ্ট করেছি। তা আমি পারব না। আমার এত পরিশ্রমের সোনা।"

এরপরে আছে আর এক জায়গায়—

"তোমরা মতিকে দেখেছ?

কৃষকরা অবাক এ প্রশ্নে—কে মতি?

খেমটাউলি।

কৃষকরা উত্তপ্ত মেজাজে থামল এবার। মতিকে সকলেই চেনে কেউ দেখেছে, কেউ দেখেনি। কিন্তু শ্রম সেখানে শস্যের জন্য মরণপণ লড়ছে—সেখানে মতি কোথায়? শ্রম যেখানে গোলাজাত হয়ে সোনা প্রসব করছে মতি থাকবে তারই আশেপাশে। ····· বাইরে বেরিয়ে এলেন বিলাস। কৃষকরা এগিয়ে এসে সেলাম করল।

তোমরা কেউ মতির খোঁজ রাখো, নাম করা খেমটাউলি?

ওরা কথা বলে না।

বিলাস এক মুঠো গিনি বার করলেন। এবার গুঞ্জন উঠল ক্ষুধার্তদের মুখে। এ দেশে মতি থাকা অসম্ভব—তবু সবাই যেন তাঁর খোঁজ রাখে।" বিলাস, মতিবাঈ এখানে শুধু মাত্র মানুষ নয়। লোভ আর ছলনার প্রতীক।

শিকারের ছলনার পিছনে ধাওয়া করে শেষ অবধি ঐ হাঙরের মতই ঘটল বিলাসের অপমৃত্যু, লোভার্জিত পাপের ধ্বংস। প্রতীক ধর্মী এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবীর' কথা মনে আসে। রক্তকরবী মূলতঃ কাব্যধর্মী, চরিত্র মাধ্যমগুলিও কিছু অচেনা—'নাগিনী মুদ্রা'র বিলাস, মতিবাঈ, কানু—এরা সবাই বর্তমানের, তাই খুবই চেনা মনে হয়।

এই প্রসংগে আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এণ্ড দি সি' উপন্যাসের কথাও মনে আসে। প্রতিকূলতার নানান ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে জীবন যুদ্ধের যে মনোজ্ঞ চিত্র রূপায়িত করা হয়েছে সমুদ্রের পরিপ্রেক্ষিত বৃদ্ধ জেলে হাঙরের দল আর মৃত মাছের সংগ্রামের মধ্যে তা অনবদ্য। তবু তার মধ্যে আমাদের চারপাশের কোন কাহিনী দানাবাঁধতে পারেনি—কাব্যিক বর্ণনভঙ্গীই সেখানে মুখ্য। 'নাগিনী মুদ্রায়' অমরেন্দ্র ঘোষ নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম দেখিয়েছেন। আধুনিক জীবনযাত্রার কাহিনী প্রতীকের মাধ্যমে পরিবেশনে তিনি পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করে সার্থক উত্তর সাধকের কর্তব্য পালন করেছেন।

অপ্রকাশিত উপন্যাস

অমরেন্দ্রর প্রকাশিত উপন্যাসগুলির সৃষ্টি বৈচিত্র্য আমরা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা তাঁর অপ্রকাশিত উপন্যাস 'একটি স্মরণীয় রাত্রি' ও 'মৃগ সৌরভ' আলোচনা করবো। 'একটি স্মরণীয় রাত্রি'র মূল পাণ্ডুলিপি অমরেন্দ্রর স্ত্রী শ্রীমতী পংকজিনী ঘোষে কাছে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর কাছ থেকেই এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছি। কিন্তু 'মৃগসৌরভ-এর মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে গুঁড়ো কাগজের স্তূপে পরিণত হয়েছে। তবুও শ্রীমতী ঘোষ অমরেন্দ্রর জীবনদশাতেই নিজে একটি কপি করেছিলেন, যার মধ্যে লেখকের নিজের হস্তাক্ষরের পরিচয় সামান্য দু-এক জায়গায় পাওয়া গেছে। এই দুই পাণ্ডুলিপি আমাদের আলোচ্য বিষয়। অপ্রকাশিত হলেও সম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়েই অমরেন্দ্র এ পাণ্ডুলিপি ধীরে সুস্থে সংশোধন করে যেতে পেরেছেন। তার চেয়েও বড় কথা এ অমরেন্দ্রর একেবারে পরিণত মনীষার রচনা।

'একটি স্মরণীয় রাত্রি' উপন্যাসের কাহিনীর সুরুটা এই রকম,

"আজ আর অমিয়র ভাল লাগে না বইয়ের দোকানগুলোর দিকে তাকাতে। যদিও এতদিন অমিয় সশ্রদ্ধভাবে ওগুলিকে এড়িয়ে চলেছে। তবু আজ মনে হয় ওর ভিতর শুধুই মামুলী উপদেশের মোরব্বা। ভয় কিংবা চিত্ত জয় করার মত কিছুই নেই। নইলে জগৎ ভেঙ্গে-চুরে যাচ্ছে কি জন্যে? মিটিং ফেরতা একটা হৈ চৈ শোনা যায়। একি জীবন প্রব্যহ? যেতে পারছে না, তবু রুখে দাঁড়িয়েছে, কণ্ঠে আপসহীন ধ্বনি। ভাঙনের মুখে এক বলিষ্ঠ প্রতিরোধ। ভাঙন-দুরন্ত দুর্নিবার ভাঙন বৈকি! তার বুকটা হু হু করে ওঠে। স্মরণ হয় সমস্ত বিগত কথা। সত্যি সত্যি ভেঙে দিয়ে গেছে ত'র পাঁজরটা। অথচ কদিনেরই বা পরিচয়!"

এখান থেকেই সমস্ত অতীত কাহিনী টুকরো টুকরো অথচ মিছিল করে একে একে অমিয়র সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয় প্রধান চরিত্র, নায়কত্বও সেই দাবী করতে পারে—কিন্তু এ উপন্যাসের আরও একজন সমান্তরাল নায়ক আছে সে বিনয়। প্রত্যেকেরই অতীত আছে। আর অতীত বড় মর্মান্তিক অবক্ষয়ের স্মৃতি বিজড়িত। আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আর বৈষম্যে ভরা সামাজিক কাঠামোর বলি প্রত্যেকে।

অমিয় বাবা মায়ের আইন সম্মত ছেলে নয়—সমাজের চোখে সে জারজ। তাই অমিয় যখন বিনয়কে বলে,

"'তোদের মত বাপ মা ভাই-বোন নিয়ে যে সংসারের স্বাদ আমি কখনো পাইনি। দুঃখ থাকলেও তোদের জীবনের একটা অর্থ আছে। আমার কিছু

নেই বা ছিল না। সময় সময় আমি ভুলে যাই, পোস্ট কার্ডের দাম ক পয়সা; আজকাল খামের দামই বা কি! কারণ কারুর সংগে তো আমার নিয়মিত আদান প্রদান নেই। যদি একটা কানা অক্ষম পঙ্গু ভাইও থাকত। আমরা দু পুরুষ যে কোন কারণে ছন্নছাড়া—আমাদের সংসারে তাই কোনো পরিচয় নেই। এর বেশি আজ আর তোকে বলা যাচ্ছে না। বড় একা লাগে, তাই বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আমি থাকতে পারিনে এক মুহূর্ত।" তাই বিনয় শুধু অমিয়র পরম বন্ধু নয়, তার সহকর্মীও বটে। একই অফিসে ওরা কাজ করে। অমিয় বড় পোস্টে, আর বিনয় একজন সামান্য কেরানী। সংসারে পোষ্যও তার অনেক। মা, বাবা, ভাই-বোন। তাই মাঝে মাঝে অমিয়র কাছে তাকে হাতও পাততে হয়।

এই অমিয়কে নিয়ে বিনয় চেঞ্জে যায়। সেখানেই তাদের সংগে পরিচয় হয় একদল স্কুলের শিক্ষিকা—গৌরী, দীপা, শীলার সংগে। অমিয়, বিনয়ের সংগে একই সমান্তরালে এসে দাঁড়ায় দীপা এবং শ্যামলী। দীপারও বিড়ম্বিত জীবন—নানান বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অতীতের সুনন্দাই আজ দীপাতে রূপান্তরিতা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষিকা—স্কুল অনুমোদন পেলে তবেই স্থায়িত্ব আসবে। কিন্তু সহকর্মীনীকে ছাটাইয়ের প্রতিবাদে দীপাও চাকরীতে ইস্তফা দেয়। কিন্তু সে যে ভালবেসেছে অমিয়কে। তবু দীপা ভাবে মরা গাছেও ফুল ফোটে, মৃতা নদীতেও বন্যার ঢলক নামে—সারা জীবনে পেল না কোনো অভিনন্দন। ধু ধু করছে বালুকাময় তপ্ত ভবিষ্যৎ—সেখানেও নেই কোন বাহু বন্ধনের ছবি।

শীলা যেন বিনয়ের বহুকালের চেনা। এ শীলাকে বিনয় ভালবাসত কিন্তু সংসারের চাপে ওরা বহু দিন আগেই হারিয়ে গেছে। বহুকাল পরে এই চেঞ্জে এসেও বিনয় যেন সেই শীলাকে আবিস্কার করে। গৌরীর মত নির্যাতিতা বালিকাও ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর বাবা ওকে দিয়ে উপার্জন করিয়ে তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে।

মালতীর মত ছটুল রহস্যময়ী নারীর ভিতর অমিয় দেখতে পায় একখানা অশ্রু সজল মূর্তি। কত দুঃখ, কত বেদনায় সে যে খরগোস গিনি পিগের সংগে নিজেকে সমগোত্রীয় করেছে। মা বাবা ভাই-অভিভাবক বলতে সকলেই আছে, কিন্তু তবু যেন কেউ নেই।

এই সব মানুষগুলির কথা ভেবে লেখক নিজেই প্রশ্ন করেছেন, "ওরা কি অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে যাবে? ছেলেরা সময় মত নিজের পায় দাঁড়াতে পারবে না—মেয়েদের হবে না বয়স থাকতে বিয়ে? সংসার কি ভেঙে চুরে হোটেল রেঁস্তোরা হবে?" এক গভীর প্রত্যয়ে উপন্যাসটি শেষ করে বলেছেন, "নিকটের একটা পার্কের ভিতর বিনয় হন হন করে ঘুরছে। আর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছে, উষার আলো রাঙা হয়ে উঠেছে এই পাষাণ নগরীর চিমনি কল

কারখানার সেড। দিক বলয়ে কে যেন অগ্নিময়ী নারী! বেকারী দারিদ্র্যে সে ছিন্নবাস কৃশ তনু—তবু অগ্নিময়ী। বিনয়ের চিনতে কষ্ট হয় না এ নারীকে। সে মনে মনে বলে, তোমার সঙ্গে শুধু চেয়ে দেখা সত্য নয়—তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের জীবনের দাবীর আদায়। তুমি নিপীড়িতা হলেও অগ্নিময়ী। আমার নতুন কর্ম জীবনে ঠিক তোমাকে না দেখতে পেলেও তোমার প্রতিভূ অনেককে দেখতে পেয়েছি।" তারপর সন্ধ্যায় বিনয় সমস্ত বিগত স্মৃতি ভুলে গিয়ে ইউনিয়ন অফিসে গভীর আলোচনায় মগ্ন—"এরপর আমাদের কি করণীয় ?"

পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অমরেন্দ্র সরাসরি কিছু না বললেও, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সে পরিবর্তন হল—সামাজিক পরিবর্তন। আমরা জানি যে, সাহিত্যিক আজ আর শূন্যচারী স্বপ্নবিহঙ্গম হয়ে থাকবে না, মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিকব্রত গ্রহণ করবেন। এ দাবী যুগের, এ দাবী স্বাধীনতার। অমরেন্দ্র মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে সৈনিকের মতই থেকেছেন যুগের দাবী অনুযায়ী। এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে অমরেন্দ্রর দীর্ঘকালব্যাপী জীবন তাৎপর্য ও মূল্যানুসন্ধানের গৌরবময় পরিণাম।

আলোচ্য উপন্যাসে অমরেন্দ্র টুকরো ঘটনা ও চরিত্রকে নিপুণ সংগীত শিল্পীর মত আলাপ, ঝালা তারপর জোড়ে মিলিয়েছেন। তিনি এখানে জীবনের নিপুণ সংগীতকারের মতই—অনেককে মিলিয়ে এক প্রতিবাদের মহৎ সংগীতে পরিণত করে একটি সার্থক রচনা উপহার দিয়েছেন। কথা-সাহিত্যিকদের কাছে পাঠকদের দুটি প্রত্যাশা থাকে। প্রথমতঃ তাঁদের রচনায় গল্পের স্বাভাবিক টান যেন বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজরূপ তাদের রচনায় যেন যথার্থভাবে স্বীকৃত হয়। বলাবাহুল্য এই অপ্রকাশিত উপন্যাসে অমরেন্দ্র পাঠকের সে প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হয়েছেন।

'মৃগসৌরভ' অমরেন্দ্র ঘোষের একেবারে শেষ রচনা।

'মৃগসৌরভ' অপ্রকাশিত হলেও লেখকের পরিণত শিল্পকর্মের আশ্চর্য স্বাক্ষর। মননে ও চিত্রণে নতুনতর রস পরিবেশিত। বিচিত্র বাস্তবতার আড়াল থেকে এক সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়ে পাঠকের মনে অনির্বাচ্য অনুভূতি সৃষ্টি করে।

কাহিনীর সূত্রপাত পুরাণ দিল্লীর এক পুরাণ সড়কে এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে। "একটা সুগন্ধ আসছে। গোলাপ কিংবা চামেলীর নয়। ধূপ, গুগগুলও পুড়ছে না এখানে। উটের তাঞ্জাম থেকে কোনো বাদশাজাদী আতরও ছড়ায়নি এ পথে। আর সে যুগও নেই। শুধু একটা তীব্র সুবাস আসছে। চনমন করছে মন।"

উপন্যাসের ধারা বরাবর এই সুগন্ধকেই অনুসরণ করে চলেছে। কিন্তু এর কাহিনী গড়ে উঠেছে অতি বাস্তব এক যাযাবর সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে।

"ষাট সত্তর জনের একটা ভ্রাম্যমান দল। শুধু আইনের চোখে এরা স্বভাব-দুর্বৃত্তজাতি নয়, গুলগুল মোড়ল এদের চোখ খুলতে দেয় না। সর্দা ঠুলি পরিয়ে রক্তে নেশা জাগিয়ে রাখে রাহাজানি হত্যা লুণ্ঠনের।......... সভ্যতার চেতনায় সে বহুবার বহু দলের গদী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পিয়ারীকে সে কখনো ছাড়েনি।"

অদ্ভুত চরিত্র এই পিয়ারী-উপন্যাসের নায়িকা। শুধু উপন্যাসের নয়, "যত অনিষ্ট সাধনার নায়িকা"। এই পিয়ারীই প্রথম অনুভব করে সেই অজানা গোপন সুগন্ধ আর চঞ্চল হয়ে ওঠে তার উৎস সন্ধানে। জগতের ভাঙা চোরা সভ্যতার আর জীবনের ক্লেদ গ্লানির সঙ্গে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। পিয়ারীর কিছুই জানতে বাকী নেই। শুধু সে এমন গন্ধ পায়নি কোনদিন।"

এই সুগন্ধই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় পথ হতে পথে। ময়দান থেকে গাছতলায়, গাছ তলা থেকে হাটে বাজারে। তারপর এক সময় দেখা হয় কাশ্মীরী নওজোয়ান প্রেমরাজের সঙ্গে। ভারতে এসেছে কাবুলি হিং বিক্রী করতে। তারই কাছে লুকানো রয়েছে এই সুগন্ধের উৎস—মহামূল্য মৃগনাভি।

সেই মূল্যবান বস্তু কৌশলে হস্তগত করবার জন্যে তিন মুনাফা শিকারী প্রৌঢ় দালাল ষড়যন্ত্র আঁটে। কিন্তু চতুর যাযাবরী তাদের সব কৌশল ব্যর্থ করে দেয়। মিথ্যে অভিযোগে হল্লা ফাঁদে। বেগতিক দেখে গা ঢাকা দেয় দালালের দল। "কিন্তু সেই আমীর কোথায়? প্রাণমাতানো সুগন্ধই বা কোথায় হল অদৃশ্য?" পিয়ারী আবার খুঁজতে থাকে সেই নওজোয়ানকে—শুধু মহামূল্য মৃগনাভির লোভে নয়, আরো যেন কি এক আকর্ষণ দুর্বার হয়ে উঠেছে। প্রেম জন্ম নিচ্ছে যাযাবরীর হৃদয়ে।

তারপর অনেক ঘুরে যখন নকসিবাজারে আবার সেই কাশ্মীরী নওজোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়, "পিয়ারী হাত দু-খানা চেপে ধরে বলে, হাম বিলকুল কিনে লেবে জোয়ান।"

দুজনে বাজার ছাড়িয়ে আসে। পিয়ারী দেখতে চায় হিংয়ের নমুনা। থলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

যুবক থলে সরিয়ে নেয়। শুধু বলে, খাঁটি মাল। থলের মুঠি আরো শক্ত করে ধরে।

"পিয়ারী বেলওয়ারী চুড়ির মত হাসে। বুকটা নাচায় সগৌরবে। ঘাগরা ঘোরায় আগুনের চাকার মত। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। হামি সব কিনে লিব।"

দুজনে পথ চলে কথা বলতে বলতে। প্রগলভা-যাযাবরী অনভিজ্ঞ গ্রাম্য

তরুণকে অস্থির করে তোলে শাণিত কথায়—চটুল আচরণে, হয়তো খানিকটা আকৃষ্টও করে। সঙ্গে পয়সা নেই কারুরই, কিন্তু চা খেতে হবে। সুতরাং ঠগবাজী ছাড়া উপায় নেই। এ সব বিষয়ে পিয়ারীর অভ্যস্ত নিপুণতা। এক চা ওয়ালার কাছ থেকে দুজনে পেটভরে চা বিস্কুট খায়। ফরমাস করে পিয়ারী বার বার করে। তারপর পয়সা চুকাবার সময় আসে। "পিয়ারী বলে, ঘাবড়াও কেন পাঁড়েজী। ঘুমতি পথে হিং বেচে দিয়ে দেব।"

চা ওয়ালা রাজী হয় না। সে ভাল করে চিনেছে এই ছলনাময়ী যাযাবরীকে। পয়সা আদায় না করে সে ছাড়বে না পিয়ারীকে।

"পিয়ারী বলে, না ছাড়বে তো কি করবে হামার? বলে খিল খিল করে হেসে ওঠে। সে হাসি যেন ছুরির চেয়েও ধারালো।"

অবশেষে চাওয়ালাকে বাধ্য হয়ে হার মানতে হয়। পিয়ারী প্রেমকে নিয়ে বসে এক ফুল বাগিচায় লতাকুঞ্জের আড়ালে। সেখানেই প্রেমরাজের মুখ থেকে ধীরে ধীরে শুনে নেয় তার জীবনের কাহিনী। সে কাহিনীর জালও লেখক বুনেছেন অশ্রু-হাসি-কৌতুকে মিলিয়ে মিশিয়ে অতি নিপুণভাবে। এই কাহিনীর মধ্য দিয়েই পিয়ারী পায় সেই সুগন্ধের হদিস, যে সুগন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রেমরাজের সাথে সাথে। পিয়ারী ভাবে।

"উচু পাহাড় থেকে কি এই মহৎ ঐশ্বর্য বহন করে এনেছে প্রেম? তু দিবি হামাকে প্রেমরাজ? দিবি রতিভর? পিয়ারী প্রেমকে জড়িয়ে ধরে নিজেই গন্ধময় হয়ে ওঠে।"

সেই শ'রুপেয়া ভরির অমূল্য ঐশ্বর্য হস্তগত করতে চায় চতুরা পিয়ারী কিন্তু সেই সংগে তার হৃদয় পেতে চায় ঐশ্বর্যের মালিককেও। ছেনতাই করার কথা ভেবে পিয়ারী তাকায় প্রেমরাজের দেহের পানে। "বাঃ কি বলিষ্ঠ গঠন! শক্তির তুলাদন্ডে মাপতে গিয়ে আসক্তিতে অন্ধ হয়ে যায় পিয়ারী। ছিনিয়ে নেয়ার চাইতে এর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বুঝি অনেক বেশী মধুময়।"

তারপর কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে ষড়যন্ত্রকারী দালালদের দ্বারা চুরি হয়ে গেল প্রেমরাজের ঐশ্বর্যের আধার সেই হিং-এর থলি। বহুকষ্টে সে থলি উদ্ধার হল পিয়ারীরই আপ্রাণ চেষ্টায়। পিয়ারীর হাত থেকে প্রেম চকিতে ছোঁ মেরে থলি কেড়ে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

"অন্ধকারে মিলিয়ে গেল প্রেম। পিয়ারীর দেহে মনে রইল শুধু একরাশ সুগন্ধ ছড়ান।"

সেই সুগন্ধ বহন করে নিয়ে যাযাবরদের ডেরায় ফিরে আসে পিয়ারী। রাতে আর কিছুতেই ঘুম আসে না তার চোখে। এ জীবন যেন তার কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হয়। খুব ভোরে কাক ডাকার আগেই সে শয্যা ছেড়ে উঠে ময়দানের দিকে পা বাড়ায়। সারাদিন সুগন্ধের পিছু পিছু ধাওয়া করে সন্ধ্যেবেলায় পিয়ারী ক্লান্ত অবসন্ন।

"কিন্তু ডেরায় ফিরলেই কোড়া। ..... সে আইন ভঙ্গ করেছে এবং তার মাত্রাটা সাঙ্ঘাতিক অতএব পিয়ারী কোড়া খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে চলো।" ঘটেও ঠিক তাই। গুলগুল ঝুঁকে পড়ে অবস্থা দেখবার চেষ্টা করে।

"নুয়ে পড়ামাত্র গুলগুলের নাকে হিংয়ের গন্ধ ভেসে আসে। পিয়ারীর সংগে কিছু মাল আছে। আর একটু এগিয়ে আসতেই হিংয়ের গন্ধকে ছাপিয়ে ওঠে সুগন্ধ।

আরে এ যে শ' টাকা ভরি। পুরুষ মৃগের নাভি-কমলে জন্ম—কস্তুরী

কোথায় পেলি এ দৌলত নাতনী, উঠ।

পিয়ারী ওঠে না।

সংজ্ঞা ভাঙতে দেরী আছে। গুলগুলের আর ধৈর্য ধরা অসম্ভব।"

শেষ রাতে সংজ্ঞা ফিরে এলে সব শোনে গুলগুল। মনে মনে স্থির করে খুঁজে বের করতে হবে প্রেমরাজকে, যার কাছে আছে এই অমূল্য ঐশ্বর্য।

সকালে রোদ্দুর উঠতেই গুলগুল আর পিয়ারী তাদের সবচেয়ে ভাল পোষাকে সেজে নেয়। তারপর বেরিয়ে পড়ে 'যাদুকা খেল' দেখাতে। আসল উদ্দেশ্য ভিড় জমিয়ে প্রেমরাজকে খুঁজে বের করা।

ময়দানে এসে খেলা শুরু করে দেয় গুলগুল।

"একে একে নামাতে থাকে খেলার মালপত্র। প্রথমেই বীভৎস একটা মড়ার খুলি, তারপর যাদুদণ্ডটা। সেইটাকে ঘুরিয়ে খুলিটায় টোকা দিয়ে বলে, এ্যায়সা খেল হিন্দুস্থানমে কভি নেহি হুয়া। ......বাগদাদসে আয়া, আরব কি সুলতান পানি নেহি দিয়া, এক শালা উট মর গিয়া। হাম উসকে খুলি তোড়কে লে আয়া। দেখো ভাই, চিন লেও, চুন লেও, ইয়াদ রাখো।"

এইভাবে সুরু করে যাদুর খেলার একটি পরিপূর্ণ বিবরণ ছবির মত আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক। আর সেই খেলার অঙ্গ হিসেবে গুলগুল ও পিয়ারীর উত্তর-প্রত্যুত্তর যেমনি বাস্তব তেমনি কৌতুকাবহ।

কিন্তু এই খেলার ফাঁদে ধরা দেয় না আকাঙ্খিত মানুষটি। গুলগুল ক্রুদ্ধ হয় নিরাশায়। কিন্তু ততোধিক নিরাশ হয় পিয়ারী।

"এ সজ্জা মনে হয় নিস্ফল, নাচ আসে না পায়, লাস্য আসে না ঝলকায় ঝলকায়। ঘুঙুর মনে হয় বেড়ি।"

ব্যর্থ হয়ে তারা ডেরায় ফিরে আসে।

শিকারের সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায় পরদিন সকালেই। দূরের ময়দান থেকে শোনা যায় কাবলী হিং ফিরি করার আওয়াজ। গুলগুল আর পিয়ারী তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করে খেলার ঝুলি নিয়ে ময়দানে চলে আসে। সেখানে যাদুর খেলা দেখাতে ছল করে প্রেমরাজকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে তাদের তাঁবুতে। খাতির করে তাকে সরবৎ খেতে দেয় গুলগুল। প্রেমরাজ চুমুক দেয় না সরবতে। হাতের মুঠিতে হিংয়ের থলেটা শক্ত করে ধরে থাকে।

অবশেষে পিয়ারী অনুরোধ করে।

"প্রেমরাজ পিয়ো সরবৎ।

হাম না পিবে।

কেনে ?

কোন জানে বিষ না কি আছে !

হামি দেবে বিষ !

বিশ্বাস নেইছে, তু সব যাদু জানিস।"

পিয়ারী নিজে একটু সরবৎ হাতে ঢেলে নিয়ে খেয়ে ফেলে। বিশ্বাস জন্মায় প্রেমরাজের মনে। সরবৎটুকু এবারে সে নিঃশেষ করে।

চতুর খেলোয়াড় গুলগুল। সে প্রেমরাজকে অনেক সহানুভূতি দেখায়। অভিভাবক সেজে অনেক রকম আশা দেয়। তাকে মানুষ করে দেবে, বিয়ে সাদি দিয়ে দেবে। "অনেক কুলীন কন্যা তার হাতে আছে। পিয়ারীকে কি পছন্দ হয় ? প্রেম মাটির দিকে চেয়ে হাসে।"

প্রেমরাজের জন্য ভোজের আয়োজন হয়। গুলগুলের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটুখানি মদ খেতে বাধ্য হয় প্রেমরাজ।

"গুলগুল অদৃশ্য হয়। পিয়ারী দেখা দেয় নৃত্য পরা অপ্সরীর মত। তার হাতে এক গেলাস সফেন মদ। এবার প্রেম আর আপত্তি করে না।...... তার শরীরের শিরা-উপশিরা ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। সে পিয়ারীর হাতখানা জড়িয়ে ধরে বলে, আজ তেরা সাথ মেরা সাদি। কুমারী পণ কেয়া দিবি প্রেম ? সাজাবি কাপড়া ? রূপাকা চাঁদমালা ? হামার যা কিছু দৌলত আছে বিলকুল লিয়ে লে। প্রেম কস্তুরীর থলেটা পিয়ারীর হাতে তুলে দেয়।"

হঠাৎ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কেউ বাইরে 'খুন, পুলিশ' বলে চীৎকার করে ওঠে। তাবুর সমস্ত আলো নিভে যায়। অন্ধকারে পিয়ারীর হাত ধরে গুলগুল তাবু থেকে পালিয়ে যায়। বামাল সামলে রাখে নিজের পেটের তলায়। "তারপর কানপুর, এলাহাবাদ, মোগলসরাই, বর্দ্ধমান, হাওড়া।"

গুলগুল জানত সহজে রেহাই দেবে না পাহাড়ী শের প্রেমরাজ। তাই গা ঢাকা দিয়ে থাকবার জন্যে একেবারে কলকাতায় চলে এলো। এখানে তারা ভালুক নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে। কিন্তু সর্বদা ভয়ে ভয়ে গুলগুল। চপ্পলের শব্দ শুনলে চমকে ওঠে। রাত্রেও কান পেতে রাখে হুঁশিয়ার হয়ে। মহল্লা থেকে মহল্লায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ভীত গুলগুল কোথাও স্থির হতে সাহস পায় না। এমনি করে অনেকদিন কেটে যায়।

"গুলগুল বলে, শালা বুরবক মর গিয়া ?

পিয়ারী চমকে ওঠে। তার সেদিনের নর্ত্তকী বেশ শতধা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে যায় নি মনের একটা সূক্ষ্ম তার। গুলগুলের নিষ্ঠুর মন্তব্যে সেই তারটা ঝনঝনিয়ে ওঠে। না, না, প্রেম কখনো মরতে পারে না।"

এবারে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে শহরে এসে নতুন করে ডেরা বাঁধতে চায় থাকে গুলগুল। শীঘ্রই একটা নতুন দলের সাথে পরিচয় হয়। সে হয় তার অভিভাবক।

"হাত দেড়েক উঁচু, হাত পাঁচেক লম্বা, হাত তিনেক চওড়া, চটের চাঁদোয়া পড়েছে খান কুড়ি। তার ভিতর একপাল মেয়ে পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কিলবিল করে। এদের জন্ম-মৃত্যু বিয়ে সাদি নালিস সালিসের একমাত্র নিয়ামত গুলগুল সর্দার।"

একদিন অনেক রাতে মাতাল গুলগুল অচৈতন্য। পিয়ারী চুপচাপ পড়ে আছে। হঠাৎ কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে পিয়ারীর ঠুনকো ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারের আবছায়ায় তাকিয়ে দেখে, প্রেমরাজ। চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে। হাতে ঝকঝকে ছোরা। প্রতিশোধ নিতে এসেছে পাহাড়ী শের।

এক সময় প্রেম পিয়ারীর দেহের উপর চেপে বসে। নিরুপায় পিয়ারী তার হাতের কব্জিতে কামড় বসিয়ে দেয়। ছুরিটা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু প্রেমকে হত্যা করতে পারে না পিয়ারী। ছুরিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে প্রেমকে জড়িয়ে ধরে নিজের দেহের সংগে।

"সকাল বেলা সবাই উঠে দেখলো একটা বীভৎস লাস পড়ে রয়েছে, তাকে সনাক্ত করা দায়।

পিয়ারীকে নিয়ে প্রেম তখন অনেক দূরে।

দ্বৈত শক্তিতে আজ মহীয়ান সে—নারী অর্থ দুয়ে মিলে মহাসুরভি কস্তুরী।

আপন গন্ধে বিভোল হয়ে পথ চলে প্রেজরাজ।"

এই হল 'মৃগ-সৌরভ' এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর সংগে সংগে যাযাবর জীবনের নিখুঁত বাস্তব চিত্র অংকিত করেছেন লেখক। উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির এবং চরিত্র চিত্রণের জন্য খণ্ড খণ্ড বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ করেছেন তিনি। সে সব ঘটনা সর্বত্র মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য না হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবুও নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। যাযাবরদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও রীতি-নীতির সংগে লেখকের যে যথেষ্ট পরিচয় আছে এই সব ঘটনা তারই পরিচয় বহন করে। বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা কেমন করে যাযাবরদের আদিম জীবনযাত্রাকে ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলছে তাও দেখিয়েছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর এই সর্বশেষ অপ্রকাশিত উপন্যাসে। দলের যুবকেরা মোড়লের হুকুম না নিয়েই কারখানায় চাকরীর সন্ধান করে। সুবিধা হলে দল ছেড়ে দেবে তারা। গুলগুল খবর পেয়ে তাদের বিচার করে, শাসায়, কড়া শাস্তির ভয় দেখায়। কিন্তু নতুন জোয়ানেরা অবাধ্য। কলের কুলি হতে চায় তারা। এই চুরি ছেনতাই-এর বে-আইনী দারু-সরাপ লেনদেনের অনিশ্চিত জীবন তাদের আর পছন্দ নয়। বয়স্করা এখনও মোড়লকে মানে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারাও ক্ষুব্ধ। মোড়লকেও

হিমসিম খেতে হয় দল বজায় রাখতে। নিত্য নতুন ভেট জোগাতে হয় আইনের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। শুধু টাকা-পয়সা, মুরগী, ভেড়া হলে কথা ছিল না, সংগে সংগে নারী মাংসেরও যে প্রয়োজন। তাই ধীরে ধীরে ভাঙ্গনের পথে এগিয়ে চলে যাযাবরদের বেপরোয়া জীবনযাত্রা পদ্ধতি। এ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভংগী প্রশংসনীয়ভাবে বাস্তব ও যুক্তি সঙ্গত।

এই অপ্রকাশিত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তিনটি—পিয়ারী, গুলগুল ও প্রেমরাজ। তার মধ্যে সর্বপ্রধান পিয়ারী চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টিতে অমরেন্দ্র ঘোষের অপূর্ব দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে এখানে। অতি অদ্ভুত হয়েও পিয়ারী অতি স্বাভাবিক, অতি রোমান্টিক হয়েও বাস্তব। পাপ-পংকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রেখেও কি কৌশলে লেখক তাকে পংকজিনীর মত সৌন্দর্য-সুষমায় ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। পিয়ারীর কোন আদর্শ নেই—কোনো নীতির বালাই নেই, কোনো মমতা বা শুচিতার ধার ধারে না সে, এমন কি কোনো অপকর্মেই তার আপত্তি নেই, তবু তার অন্তরের স্বাভাবিক নারীত্ব তাকে যেন সব কিছুর ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছ। তার রৌদ্রদগ্ধ তামাটে মুখ আর মলিন-ছিন্ন আবরণের আড়ালে লেখক বার বার আভাসিত করেছেন তার অন্তরের উজ্জ্বলযৌবনশ্রীকে, অথচ কত সহজেই লেখক তা করতে পেরেছেন। দীর্ঘ অভ্যাস ও সাধনা ছাড়া এই সহজ দক্ষতা অসম্ভব।

অপরাধ-বিজ্ঞানের কোনো অধ্যায়ই অজানা নেই যে নারীর, তেমনি এক নারীর চিত্রই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন পিয়ারীর মধ্যে। "সার্কাসের বাঘিনীর মত তাকে চাবুকে চাবুকে তালিম দিয়েছে মোড়ল।" কিছুই ভয় করে না পিয়ারী, ভয় শুধু তার গুলগুল মোড়লকে, যার হাতে সে যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। তারই ইংগিতে সে শান্তির নীড়ে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়—নিপুণ গুপ্তচরের মত সকলের গোপন খবর সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, দরকার পড়লে নির্বিবাদে ছোরা ছুরি চালায়।

এই পিয়ারীর অন্তরাত্মাকেই লেখক জাগিয়ে তুলেছেন এক আকস্মিক সুরভির সহসা-স্পর্শে। ব্যাকুল পিয়ারী ছুটে বেড়ায় সেই মহার্ঘ সুবাস সন্ধানে।

"সে পারিজাতের গল্প শুনেছে, একি তারই সুবাস? না, কোনো দেবদূত যাচ্ছে অদৃশ্য পথে? এই শহরের ধুলো-ধোঁয়া নর্দমা পূতিগন্ধ থেকে খানিকের জন্য কল্পলোকে চলে যায় পিয়ারী।...পূবাকাশের পেঁজা তুলোর মত কখনও মেঘের ভিতর দৃষ্টি চালিয়ে দিতে চায়। এমন তীব্র অনুভূতিতে সে কখনো পাগল হয় নি।

বাইশটা বসন্তের দাহন তাকে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। আজ সে যেন পেয়েছে বসন্তের ছোঁয়া। তার পোড়া ডালে ডালে নতুন পাতা গজাতে চাইছে। সবুজ অবুঝ কিশলয়।"

যাযাবর পিয়ারীর অন্তর্নিহিত মহিমাকে লেখক যেমন করে ধীরে ধীরে

আভাসিত করেছেন, তাতে তাঁর নারীত্বের মর্যাদা ও সহানুভূতিই প্রকাশ পায়। এই একই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ইতিপূর্বে পেয়েছি তাঁর 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' উপন্যাসের উর্বশী চরিত্রে, 'বে-আইনী জনতায়' আমিরণের চরিত্রে, 'কনকপুরের কবি'র ডালিমজানের চরিত্রে, 'পদ্মাদীঘির বেদেনী' উপন্যাসের বেদেনীর চরিত্রে এবং আরো অনেক চরিত্রে। এর মূলে রয়েছে লেখকের গভীর মানবতাবোধ এবং সে দিক থেকে তিনি শরৎচন্দ্রের স্বগোত্র।

পিয়ারীর চরিত্রে জমাট নিষ্ঠুরতার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার কোমলতার ঈষৎ আলো ফুটিয়ে, তার লোভ আর বঞ্চনার পাশাপাশি অজানিত প্রেমের মাধুর্য জাগিয়ে তুলে আগাগোড়া এক দ্বৈত-ভাবের দোলায় দুলিয়ে দুলিয়ে একটি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় ছবি এঁকেছেন লেখক। পিয়ারী-চরিত্র ভাবশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তাই পিয়ারী প্রেমকে বলেছিল, "তু হামার আঁখির দিকে তাকা, দিল কি নজরে আসছে না? ওখানে কি কোনো ছুটা কারবার আছে?

প্রেম পিয়ারীর চোখে চোখ রেখে অতলে তলিয়ে উপলব্ধি করে, যা বলেছে পিয়ারী তা বুঝি একান্তই সত্য। মিথ্যা ওর ওপরের খোলস, তা বুঝি যখন তখন ত্যাগ করতে পারে এ রহস্যময়ী নারী। যায়, যায় একে বিশ্বাস করা যায় বুঝি।"

এখানেই লেখকের কলম উচ্চারণ করেছে পিয়ারী-চরিত্রের মর্মবাণী। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে খুঁজলে যে কটি প্রকৃত 'ভিলেন' চরিত্র পাওয়া যায়, তারমধ্যে অমরেন্দ্র ঘোষের গুলগুল মোড়ল একটি। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তার দোর্দণ্ড আধিপত্যের মধ্যেই লেখক তার জীবনের ব্যর্থতার ট্র্যাজেডিকে দেখাতে পেরেছেন। সে যেন এক ক্ষতমূল বিরাট বনস্পতি, যার সমস্ত মহিমা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কাছে উপহাস মাত্র। গুলগুলের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিটে ফোঁটাও নেই। সে লোভী, হিংস্র, দুর্ধর্ষ। নিজের পরিচয় সে নিজেই দিয়েছে অনেকবার। "জানিস্ নিজ হাতে খতম করেছি উনষাটটা। আজ ষাট পুরিয়ে কালীমাইকা পায়ে ভেট লাগাব। তারপর ক'বছর চুপচাপ। সে বীভৎস হাসি হাসে।"

গুলগুল মোড়লের সঙ্গে পিয়ারীর কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। পিয়ারীকে সে নাতনী বলে আদর করে। আবার একটু কিছু উনিশ-বিশ হলেই শংকর মাছের কোড়া। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে যেমন অনায়াসে পায়ে ধরতেও পারে তেমনি গর্দান নিতেও পারে। বাজিয়া দাঙ্গা ছেনতাই ঠকবাজীতে তার একান্ত উল্লাস। একজন পাকা অভিনেতাও বটে গুলগুল। প্রয়োজনে অসহ্য ক্রোধ চেপে রেখে সে শান্তভাবে স্নেহের সুরে কথা বলতে পারে—হেসে উঠতে পারে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। নিদারুণ অপমানও হজম করতে পারে অম্লানবদনে অন্য উপায় না থাকলে।

মাঝে মাঝে বিচার সভা ডেকে গুলগুল ধর্মাবতার সাজে। বিন্দুমাত্র দোষ-ত্রুটির জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে দলের সকলকে বশে রাখতে চায়। "গুলগুল শাস্ত্রজ্ঞও বটে। শাস্ত্রে পুরাণে যে-ভাবেই কাহিনী লেখা থাক গুলগুল ব্যবহার করে তা নিজের অস্ত্রের মত করে।"

এই গুলগুলের মনের অতল অন্ধকারের মধ্যেও লেখক দেখিয়েছেন একবিন্দু আলোর কণা। সে হচ্ছে তার দলের প্রতি ভালবাসা। কেমন করে দলকে টিকিয়ে রাখতে পারবে সেই তার সর্বক্ষণের চিন্তা। দল ভেঙে যাবে এ কথা ভাবতে তার বুক ভেঙে যায়। তাই গুলগুল বিদ্রোহী যুবকদের বলেছিল, "হামার কি আছে, ছেলে ঘরসংসার কুছভি নেই। তু লোক হামার সব, তু লোককে লিয়ে যেত্তা চিন্তা-ভাবনা, বিচার-আচার, থানা-পুলিশ কা ডান্ডা।"

কিন্তু অপরিমিত অর্থলোভই তার জীবনে চরম ট্রাজেডি ডেকে নিয়ে আসে। ছলে বলে কৌশলে প্রেমরাজের কাছ থেকে মহামূল্য কস্তুরী ছিনিয়ে দল ত্যাগ করে চলে যেতেও সে দ্বিধা করে না। এরই পরিণামে অবশেষে ঘটে তার আকস্মিক মৃত্যু। "সকালবেলা সবাই উঠে দেখলো একটা বীভৎস লাস পড়ে রয়েছে, তাকে সনাক্ত করা দায়।"

কাশ্মীরের নওজোয়ান প্রেমরাজ এই কাহিনীর নায়ক। তার সহজ সরল মনোভাব ও অনমনীয় কষ্টসহিষ্ণু চরিত্র লেখক দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু পিয়ারী ও গুলগুলের তুলনায় প্রেমরাজের চিত্র অনেকটা নিষ্প্রভ। পিয়ারীর প্রতি তার আকর্ষণে গভীরতার ছাপ অংকিত করতে পারেন নি লেখক। এই পাহাড়ী শের-এর চরিত্র চিত্রণ সুন্দর, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম জীবন্ত এবং কম ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়।

এই তিনটি প্রধান চরিত্রকে ঘিরে আরো ছোট-বড় বহু চরিত্রের সমাবেশ হয়েছে। বাস্তবে ও কল্পনায় এই চরিত্রগুলি প্রধান চরিত্র কটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করেছে এবং উপন্যাসের ঘটনাচক্রকে কাঙ্খিত পথে আবর্তিত করেছে। এইসব চরিত্র চিত্রণে সর্বদাই সজাগ দেখা যায় লেখকের মানবিক দৃষ্টিভংগী ও সহানুভূতিশীল হৃদয় জীবনধারণের কঠিন সংগ্রামে তারা সকলেই ক্ষত-বিক্ষত, তবু নিরস্ত নয়। এই অপরাজেয় সংগ্রামশীলতাই অমরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাসগুলিতে চরিত্র সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মনে হয় 'মৃগসৌরভ' অমরেন্দ্র ঘোষের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা ভাষায় একটি সার্থক প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। প্রতীকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের ইংগিত 'মৃগসৌরভ'-এর মতই সুরভিত করেছে এই গ্রন্থকে। এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্যতার মর্মবেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্প্রাণ এই সভ্যতার উন্মত্ততা ও উন্মাদনার মধ্যে মানুষ আজ মনে মনে সন্ধান করছে কোনো এক স্থায়ী ঐশ্বর্যের-চিরন্তন সত্যের। তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু পাওয়া যাচ্ছে তার সুরভির ইংগিত।

মানুষ ছুটে চলেছে সেই সুরভির পেছনে—ধরতে গিয়েও ধরতে পারছে না। তবু এই নিরাশ্বাস সভ্যতায়ও অবশিষ্ট আছে একটি আশ্বাস যা তাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সে আশ্বাস হচ্ছে মানুষের প্রেম। এই প্রেমই একদিন তাকে স্থায়ী ঐশ্বর্য-নিরঞ্জন সত্যের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

অমরেন্দ্রর উপন্যাসের সৃষ্টি বৈচিত্র্য পরিক্রমণের শেষে আমাদের মনে হয় তাঁর দরদী কলম একদিকে যেমন দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনের চিত্র, উদ্বাস্তু ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের সার্থক কথাশিল্পী, তেমনি খাঁটি স্যাটায়ার ও সাঙ্কেতিক উপন্যাস তাঁর আধুনিকতম অধ্যায়। তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মূল কথাই হল—মাটির মানুষের কাহিনী হৃদয়ের রসে জারিয়ে মানুষের জন্য লিখে যাওয়া। এই কারণেই নতুন প্রজন্ম তাঁকে জানাবে সংগ্রামী অভিনন্দন।

টীকা

1. ১. চরকাশেম—অতুল চন্দ্র গুপ্ত। মাসিক বসুমতী: আশ্বিন, ১৩৫৭
2. ২. Amarendra Ghosh —Smt, Lila Roy, The Iudian P. E. N , April, 1950
3. ৩. চরকাশেম: যুগান্তর। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৫৬
4. ৪. Amarendra Ghosh—Smt. Lila Roy. The Indian P. E. N. April, 1950
5. ৫. চরকাশেম—কাজী আবদুল ওদুদ। সংকল্প: বৈশাখ, ১৩৬১
6. ৬. ঐ
7. ৭. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ২০২—৩
8. ৮. বর্তমান লেখকের—শৈলজানন্দ: মন ও শিল্প। মাসিক বাঙলাদেশ: ৪র্থ বর্ষ-৯-১০ম সংখ্যা,
9. ৯. জবানবন্দী। পৃ: ২৫২
10. ১০. পদ্মদীঘির বেদেনী—আনন্দবাজার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৫০
11. ১১. ঐ —প্রবাসী: ফাল্গুন, ১৩৫৬
12. ১২. দেশ—৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪৯

১৩. Padma Dighir Bedini—Monindra Roy, Hindusthan Standard—30th April, 1950
১৪. ঐ
১৫. শ্রীমতী পংকজিনী ঘোষের সংগে সাক্ষাৎকার : ২রা জুন, ১৯৮৪
১৬. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ১০
১৭. ঐ —২১২
১৮. ঐ —২২০
১৯. বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুত গোস্বামী। পৃষ্ঠা-৩৯৭
২০ অমরেন্দ্র ঘোষ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমীপেষু : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৮
২১. Manindra Roy—Hindusthan Standard : 7 January, 1951
২২. দৈনিক বসুমতী—২৬ নভেম্বর, ১৯৫০
২৩. Manindra Roy—Hindusthan Standard :7 January, 1951
২৪. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা-৯
২৫. নারায়ণ চৌধুরী—পূর্বাশা : ভাদ্র, ১৩৫৮
২৬ অমরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাস—অচ্যুত গোস্বামী। নতুন সাহিত্য, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
২৭. ইয়েনান বক্তৃতা। ২রা মে, ১৯৪২
২৮. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা ৫৫ ৫৬
২৯. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।—সুপ্রকাশ রায়। পৃষ্ঠা ১০-১১ দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭২
৩০. রবিবারের যুগান্তর : ৮ই আগস্ট, ১৯৫৪
৩১. সরোজ দত্ত—স্বাধীনতা, ২৮শে কার্তিক, ১০৬১
৩২. দৈনিক বসুমতী : ১০ই শ্রাবণ, ১৩৬১
৩৩. দেশ—২২শে শ্রাবণ, ১৩৬১
৩৪. উপন্যাস সাহিত্যে অমরেন্দ্র ঘোষের নূতন সংযোজনা—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—মধ্যবিত্ত : পূজা সংখ্যা, ১৩৫৯
৩৫. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়।—৫ম সংস্করণ, ১৩৭২, পৃষ্ঠা-৭১০
৩৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের চিঠি—৬.৭.১৯৫১
৩৭. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা-২৫৫-৫৬
৩৮. ঐ ২৩৫
৩৯. নবেন্দু ঘোষের চিঠি

৪০. বাঙালীর সাহিত্য—ভবতোষ দত্ত। পৃষ্ঠা-২৬৫

৪১. রবিবারের যুগান্তর—৩১শে আগষ্ট, ১৯৫২

৪২. সত্যযুগ—রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৩৫৮

৪৩. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা-২২৯

৪৪. সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎ রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৪৪-৪৫

৪৫. জবানবন্দী। পৃষ্ঠা-২৩২

৪৬. অমরেন্দ্র ঘোষ…নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমীপেষু: ৬ষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৬৮

৪৭. উপন্যাসের কথা—দেবীপদ ভট্টাচার্য
পৃ.২৩২

৪৮. অমরেন্দ্র ঘোষ—অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় রমন: ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা মাঘ—চৈত্র, ১৩৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

কথাশেষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

"প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।"১

আরো পরিস্ফুট করে তিনি বলেছেন,

"খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিতটা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতায়। যতই খাপছাড়া উদ্ভট হোক উপন্যাসের চরিত্র—মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়েই তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে।"২

অমরেন্দ্র ঘোষেরও ঐ একই কথা। তবে সে কথা তিনি তাঁর নিজের মতন করেই বলেছেন।

"মহৎ সাহিত্যের জন্য মহৎ অভিজ্ঞতার উপকরণ চাই। সে উপকরণ হঠাৎ কখনো সংগ্রহ হয় না। না কোনো ডাইরি রেখে, না দুদিন মেলামেশা করে। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে শোক দুঃখ বেদনায় মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাকে আজ আসতে হয়েছে সাহিত্যে। জনসাধারণই তার বক্তব্য আমার কলমের ডগায় পেশ করছে। যদি কিছু মহৎ হয়ে থাকে তার সম্পূর্ণ মূল্য জনসাধারণেরই প্রাপ্য।"৩

মাটির পৃথিবীর মাটির মানুষ এই জনসাধারণের জীবন ও সমকালীন ঘটনাই অমরেন্দ্রর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই জনসাধারণ প্রসংগে তিনি আবার বলেছেন,

"পাঁকের পথে এদের জীবন বৈচিত্র্য ফোটাতে চাইনি, পূর্ণ আশাবাদের পথে আমার গতি। আমি জানি এই প্রগতি। জনসাধারণ হচ্ছে চিরন্তন মার্গ সঙ্গীত। বাকি যা কিছু গজল ঠুংরি।"৪

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের মত অমরেন্দ্র ঘোষকেও অভিজ্ঞতার মানুষ বলতে কোন আপত্তি হবার কথা হয়।

কিন্তু জগতে একজনের অভিজ্ঞতা আর একজনের অনুভূতির হুবহু নকল হতে পারে না। ১৩৬৬ সালে পুণঃ প্রকাশিত বনফুলের 'ভুবনসোম' বইখানিতে অনিলবাবু বা সখীচাঁদ বা ভুবনসোম, এঁরা কেউ-ই অবাস্তব নন, কিন্তু সেখানে

এঁরা এবং এঁরা ছাড়া ভুট্টা, ভাগিয়া, চতুর্ভুজ, গোপ, তার মেয়ে বিদিয়া ইত্যাদি সকলে মিলে যে ভ্রমণ কাহিনীটি সুরসাল করে তুলেছেন, সে কাহিনী কেমন করে স্বপ্নের মতন সুন্দর আর সুখ স্বপ্নের মতোই অবিশ্বাস্য মনে হয়। আবার ১৩৬২তে বনফুলের 'নিরঞ্জনা' প্রকাশিত হয়। সে কাহিনী আনাতোল ফ্রাঁসের Thais অবলম্বনে লেখা। এই বইয়ের 'নিবেদন' এর মধ্যে বনফুল লিখেছেন—"ইহা ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ নহে, দেশ কাল পাত্র পাত্রী আমাদের দেশের অনুরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।" সতরাং উপন্যাসে 'রিয়্যালিজম রক্ষা যে লেখকের একটি আবশ্যিক কর্তব্য সে কথা সমালোচক-সমাজে বহুশ্রুত ব্যাপার। এই রিয়্যালিজম-ই অমরেন্দ্রর সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ। কিন্তু মহৎ উপন্যাস সম্বন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'লেখকের কথায়' কোন উল্লেখ করেন নি। শুধু এই বলে তিনি আলোচনা শেষ করেছেন,

"উপন্যাসে বাস্তবের ক্ষেত্র হয় আরো ব্যাপক, আরো প্রসারিত। উপন্যাসে অনেক রকমের অনেক মানুষকে তাঁদের বাস্তব জীবন আর বিচিত্র পরিবেশ সমেত টেনে এনে কাহিনী ফাঁদতে হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই, কবিতার চেয়ে উপন্যাসে ভাববাদী কল্পনার স্থান বস্তুবাদী কল্পনা অনেক সহজে ও দৃঢ়ভাবে দখল করছে।"৫

সকলেই জানেন যে, আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং তার পরিণতির সংগে সংগেই উপন্যাসের ইতিহাস জড়িত। পাঠক সমাজে গল্পের চাহিদা চিরকালের ব্যাপার। তাহলে গল্পের সংগে উপন্যাসের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয়—গল্প হলো জীবনের মোটামুটি স্থিতিধর্মী রূপায়ণ, আর উপন্যাস নিঃসন্দেহে তার চলচ্চিত্র। কিন্তু শুধু চলৎ-লক্ষণই নয়, উপন্যাসে এই গতিধর্মের সংগে সংগে জীবনের সামগ্রিক ধারণাটাও থাকা দরকার। চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়ে তোলার মধ্যেই মানব-জীবনের যথার্থ গতিরূপের উপলব্ধি ফুটতে পরে। সময়ের ধারাবোধে এড়িয়ে কিংবা সেদিকে পূর্ণ অবহিত না থেকেও ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, কিন্তু কালস্রোতের নিত্য নতুন তরঙ্গের উদ্ভব আর বিলয় সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক কখনই উদাসীন থাকতে পারেন না। উপন্যাসের এই সব লক্ষণ বিচারের কথা থেকে উপন্যাসের সংগে মহাকাব্যের তুলনা এসে পড়ে। উপন্যাস আমাদের আধুনিক কালের মহাকাব্য তো বটেই—মহাকাব্যের মতনই ধীরে ধীরে এবং সমগ্রভাবে জীবন বীক্ষার প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসে। এই প্রসংগে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন,

"মহাকাব্য প্রধানতঃ কেবল বীরত্বের দিকেই সজাগ' বীরের সম্বন্ধেই আগ্রহী। অপরপক্ষে, উপন্যাসে আমাদের এই মনুষ্য জীবনের উত্থানভূমি এবং নিম্নতল—তার উচ্চশীর্ষ এর গম্ভীর গুহা-গহবর সব কিছুই গৃহীত হয়। কিছুই উপেক্ষিত হয় না,—কিছুই সরিয়ে রাখা হয় না। এদিক থেকে দেখলে মহাকাব্যের তুলনায় উপন্যাসের বিস্তার যে আরো বেশি, সে কথা বলতেই হয়।"৬

অমরেন্দ্রর ঘোষের 'দক্ষিণের বিল' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও 'দক্ষিণের বিল' এর বিশাল পটভূমিতে এপিক সুলভ মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন। এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসংগে পূর্বেই আমরা জানিয়েছি যে, 'দক্ষিণের বিল'কে কেবল একটি বিলের ইতিকথা হিসেবে মনে করলে ভুল করা হবে। এই বিলের সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত একটি মধ্যবিত্ত পরিবার আর গৌণভাবে জড়িত এমন একটি বঙ্গীয় অঞ্চল, যাকে গণ্ডীবদ্ধভাবে গোটা বঙ্গদেশ হিসাবেই গ্রহণ করা যায়।

কোন উপন্যাস সত্যিই মহৎ হলো কি হল না, তা বিচার করতে হলে পাঠক দেখেন লেখকের উদ্দেশ্যটা কি ছিল,—এবং তা কতদূরই বা ফুটেছে, অথবা যে মাল-মশলা তাঁর সেই বিশেষ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রকৃতিটা কি রকম। এই প্রসংগে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেছেন,

"The novelist imposes form and structure on the mass of experiences that come to him and where the form and the content fuse into a unity we have a great work of art. It reflects reality as refracted through the novelist's personality and this is what had led people to Judge the greatness of a novel either by reference to the inner purpose of the novelist purpose the novalist or the nature of the content on which he has worked "৭

অপরদিকে অধ্যাপক তারকনাথ সেন মহৎ উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

"Range, breadth and sweep, amplitude and spaciousness, totality of appeal-these, then, are easential to the making of a great novel. "৮

বলাবাহুল্য অমরেন্দ্র ঘোষের মধ্যে এই মহৎ উপন্যাস রচয়িতার গুণগুলি ছিল বলেই তিনি 'দক্ষিণের বিল' এবং' বে-আইনী জনতার মত মহৎ উপন্যাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অধ্যাপক তরকনাথ সেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে মহৎ উপন্যাসের কথা আলোচনা প্রসংগে ভারতবর্ষের দিকে চোখ ফিরিয়ে উনিশ'শ সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগষ্টের আগেকার শতকার্ধের কথা ভেবেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন,— আমাদের সেই অর্ধ-শতকের জাতীয় সংগ্রাম কি সত্যিই একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না ? তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' 'দক্ষিণের বিল' 'জোটের মহল' 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'—উপন্যাসগুলির কথা আবার মনে পড়ে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনজনের কলমেই মহত্বের সম্ভাবনা দেখা গেছে

সন্দেহ নেই। কিন্তু সিদ্ধির প্রশ্নে বাংলা সাহিত্যের এই তিন বিশাল ব্যক্তিত্বের সমকালীন হয়েও অমরেন্দ্র তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বাংলার প্রগতীশীল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির স্থান অধিকার অবশ্যই দাবী করতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যের ভূগোলে যে পৃথিবীর রূপ সংযোজনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পথিক সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানের নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজের এমন সামগ্রিক প্রতিরূপ মাণিক অথবা পরবর্তী অন্য কোন লেখক এমন কি কোন মুসলমান লেখকের লেখাতেও সে চিত্র বোধ হয় এতখানি উজ্জ্বলতা নিয়ে অনুপস্থিত—কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্যতার মর্মবেদনাই প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্প্রাণ এই সভ্যতার উন্মত্ততা ও উন্মাদনার মধ্যে মানুষ আজ মনে মনে সন্ধান করছে কোন এক স্থায়ী ঐশ্বর্যের—চিরন্তন সত্যের। মানুষ ছুটে চলেছে সে ঐশ্বর্যের পিছনেধরতে গিয়েও ধরতে পারছে না। তবু এই নিরাশ্বাস সভ্যতায়ও অবশিষ্ট আছে একটি আশ্বাস যা তাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সে আশ্বাস হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমই একদিন তাকে স্থায়ী ঐশ্বর্য—চিরন্তন সত্যের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। শেষ আশার এই সংবাদই দিয়ে গেছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে।

টীকা

১। লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২। ঐ
৩। জবানবন্দী।—পৃষ্ঠা-১২৮
৪। ঐ ১২৯
৫। লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। তারাশংকর—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। পৃঃ ২৭৫
৭। Culture Forum : No.3. March, 1959, Scientific Research & Cultural Dept. Govt. of India.
৮। -ঐ-

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

গ্রন্থ নির্দেশিকা

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—মুজফ্ফর আহমেদ।
উপন্যাসের স্বরূপ—ডঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ,
উপন্যাসের কথা—দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রথম প্রকাশ, মে
কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ষষ্ঠ প্রকাশ, আশ্বিন,
কল্লোলের কাল—জীবেন্দ্র বিনোদ সিংহ রায়। প্রথম সংস্করণ,

জনসাধারণের রুচি—বিষ্ণু দে। প্রথম সংস্করণ,
জবানবন্দী—অমরেন্দ্র ঘোষ। প্রথম প্রকাশ,
তারাশংকর—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। প্রথম সংস্করণ,
তিতাস একটি নদীর নাম—অদ্বৈত মল্লবর্মন।
দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য-ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ,
নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা—ফণিভূষণ ভট্টাচার্য। প্রথম সংস্করণ, কার্তিক, ১৩৮০
পরিচয়—কার্তিক, ১৩৩৯
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চম সং ১৩৭২
বাংলা উপন্যাসের ধারা—অচ্যুত গোস্বামী।
বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ডঃ ভূদেব চৌধুরী।

বাংলার অর্থনৈতিক জীবন—নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ।
বাংলা উপন্যাসের আধুনিক পর্যায়—রণেন্দ্রনাথ দেব।

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী,
ভুখা ভারত—বিমল চন্দ্র ঘোষ
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য—ডঃ সরোজ মোহন মিত্র। প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ,

যুগ পরিক্রমা (২য় খন্ড)—নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত।
লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বাধীনতার পূর্বাভাস—অন্নদাশংকর রায়। প্রথম সংস্করণ,
সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার, সপ্তম সংস্করণ,
A Challenging Decade-Smt. Lila Roy
Bengali Literature to-day, A Survey 1947-50
Census of India-Ed. by Asoke Mitra, Vol. VI, Part-IA. Report
Contemporary Indian Literature-Sahitya Academy, 1950
Economic History of Bengal-N. K. Sinha
Femines in Bengal-Kali Charan Ghosh
Growth of the Soil-Knut Hamsun
Hunger —do
India To-day-R. Palme Dutt. Rev. S. Enlarged Edn. in India 1947
India's Struggle for Freedom—Hiren Mukherjee,

পরিশিষ্ট—২

অমরেন্দ্র ঘোষের গ্রন্থপঞ্জী

১। চরকাশেম (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫৬। প্রকাশক—বুক ওয়ার্ল্ড লিমিটেড। ৫, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১। পৃ. ২০৪। দাম—৩.০০ টাকা। প্রচ্ছদ-খালেদ চৌধুরী। উৎসর্গ : চরকাশেম উপন্যাস হলেও আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। সেই চরের জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষগুলির উদ্দেশ্য।

২। পদ্মদীঘির বেদেনী (উপন্যাস'-প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৫৬। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বংকিম চ্যাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-১৭০। দাম-দুটাকা বারো আনা। প্রচ্ছদ-আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসর্গ—সজনীকান্ত দাস।

৩। দক্ষিণের বিল (১ম খণ্ড, উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৭। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-২৬৬। দাম-৪.০০ টাকা। উৎসর্গ : শ্রী প্রাণতোষ ঘটক প্রিয়বরেষু।

৪। ভাঙছে শুধু ভাঙছে (উপন্যাস)-প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮। প্রকাশক : কমলা বুক ডিপো। ১৫, বংকিম চ্যাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-২০৪। দাম-সাড়ে তিন টাকা। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা-মণি বাগচী। প্রচ্ছদ : ধীরেন বল। উৎসর্গ : জীবন সঙ্গিনী পংকজিনী ঘোষ।

৫। একটি সংগীতের জন্মকাহিনী (উপন্যাস)-প্রথমসংস্করণ : ১৯৫১। প্রকাশক : ডি.এম.লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-১৪১। দাম-২.৫০ টাকা। উৎসর্গ : লব্ধ প্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

৬। বে-আইনী জনতা (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৮। প্রকাশক : কমলা বুক ডিপো। ১৫, বংকিম চ্যাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-২২০। দাম-সাড়ে তিনটাকা। প্রচ্ছদ : ধীরেন বল। উৎসর্গ : বিজয় ব্যানার্জী, রমেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল রায়, রামমোহন ঘোষ, সত্যবন্ধু ভৌমিক, আবুল কালাম সামসুদ্দিন, প্রফুল্ল রায় সপ্ত সারথির উদ্দেশ্যে।

৭। কনকপুরের কবি (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬০। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা ৩৩৪+১। দাম-চার টাকা। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমান সত্যেন্দ্র নারায়ণ সরকার করকমলেষু।

৮। দক্ষিণের বিল (২য় খণ্ড, উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬০। প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-২৫২। দাম-চার টাকা। উৎসর্গ : মনীষী শ্রী অতুল চন্দ্রগুপ্ত করকমলেষু।

৯। জোটের মহল (উপন্যাস)·প্রথম সংস্করণ : ১৩৬১। প্রকাশক : ডি·এম.লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-১+২১২। দাম-সাড়ে তিন টাকা। উৎসর্গ : শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনিল কুমার চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র বিশ্বাস মুখোপাধ্যায় করকমলেষু।

১০। কুসুমের স্মৃতি (গল্পগ্রন্থ)—প্রথম সংস্করণ : ১৯৫০। প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ। ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-১৬০। দাম-২·৫০ টাকা। উৎসর্গ : দিলীপ কুমার গুপ্ত। (সূচীপত্র : কুসুমের স্মৃতি, বাঁদী, সারেঙ্গীর সুর, ভেজাল, একটুখানি নুন, ফেরারী, কসাই, বনলতা সোম, সূর্যমুখীর মৃত্যু, একটি স্মরণীয় রাত্রি, কল্যাণ স্বাক্ষর)।

১১] মন্থন (উপন্যাস —প্রথম সংস্করণ : আগষ্ট, ১৯৫৪। প্রকাশক : নবভারতী। ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-৪৩। দাম-৩·০০ টাকা। প্রচ্ছদ : সমীর সরকার। উৎসর্গ : দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।

১২। অহল্যা কন্যা (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬২। প্রকাশক : এস· ব্যানার্জী অ্যান্ড কোং। ৬নং, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১৩২, দাম আড়াই টাকা। প্রচ্ছদ : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসর্গ : কথাশিল্পের সংগে চিত্র শিল্পের সমন্বয় সাধনে যিনি অগ্রদূত সেই প্রথিতযশা শ্রীমুরলী ধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে।

১৩। স্ব-নির্বাচিত গল্প (ছোটদের জন্য গল্পগ্রন্থ)—প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৬। প্রকাশক শ্রীগদাই চাঁদ দে। ১৭ডি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা-৯৫। দাম—দেড় টাকা ? (সূচীপত্র : পোড়ো বাড়ির ছেলে, জন্মদিন, মা, কালশত্রু, মেনকামালিনী, দাঙ্গা, জবাব)

১৪। কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ: অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪। প্রকাশক: শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা-২১২। দাম—সাড়ে চার টাকা। প্রচ্ছদ: বীরেন বল। উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা শৈলজা চৌধুরী করকমলেষু।

১৫। ঠিকানা বদল (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৪। প্রকাশক: বাক সাহিত্য। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা-২১২। দাম—সাড়ে চার টাকা। প্রচ্ছদ: খালেদ চৌধুরী।

১৬। রোদন ভরা এ বসন্ত (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ: ১৯৫৮। প্রকাশক: ক্যালকাটা বুক ক্লাব। পৃষ্ঠা-১৯৭। দাম: উল্লেখ নেই। প্রচ্ছদ: পূর্ণেন্দু পত্রী।

১৭। নাগিনী মুদ্রা (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ: ভাদ্র, ১৩৬৬। প্রকাশক: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১+১২৪। দাম—তিন টাকা। প্রচ্ছদ: সত্য সেবক মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ: শ্রীমতী আরাধনা গুপ্তা, শ্রীইন্দু গুপ্ত ও নারয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় করকমলেষু।

১৮। মন দেয়া নেয়া (উপন্যাস)—প্রথম সংস্করণ:
প্রকাশক: সাহিত্য। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা-১৪৪। দাম—৩.০০ টাকা। প্রচ্ছদ: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। উৎসর্গ: শ্রীরথীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅনুপ কৃষ্ণ বসু প্রীতিভাজনেষু।

১৯। জবানবন্দী (স্মৃতিকথা)—প্রথম সংস্করণ: ভাদ্র,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—১+২+২৮৩। দাম—সাড়ে সাত টাকা। প্রচ্ছদ: সুধাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট—৩

নির্দেশিকা